স্বয়ংবৃতা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ ঃ পৌষ ১৩৫৯ ঃ ডিসেম্বর ১৯৫২

প্রকাশক ঃ প্রবীর মিত্র ঃ ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ঃ তাপস সরকার

মুদ্রাকর ঃ ভোলানাথ পাল ঃ তনুশ্রী প্রিণ্টার্স
৪/১ই, বিডন রো ঃ কলিকাতা-৬

শ্রীমদন দত্ত

ও

শ্রীমতী রেবা দত্ত

সুপ্রীতিভাজনেষু

● আমাদের প্রকাশিত লেখকের বই ●

সোনার কাঠি রুপোর কাঠি

রাধার চোখে আগুন

স্বনির্বাচিত গল্প

রক্ত আগুন প্রেম

তোমার জন্য

সাবরমতী

রাগশর

সংসার

এক

আলোর একটা নীতি আছে। সে অন্ধকার বরদাস্ত করে না। অন্ধকারেরও একটা রীতি আছে। সে আলো গ্রাস করে। তারা পাশাপাশি বাস করে না।

কাপড়ে মোড়া মস্ত সেতারটা পল্‌কা লাঠির মত কাঁধে ফেলে সুশান্ত—সুশান্ত সরকার বাড়ির পথে বাঁক নিয়েছে খেয়াল নেই। খেয়াল থাকলে এই সময় তার চোয়াল জোড়া আপনা থেকে শক্ত হয়, কাঁধের সেতার হাতের দুটো শক্ত থাবার মধ্যে নেমে আসে। বাড়িটা যত কাছে এগিয়ে আসে চলার গতি ততো শিথিল হয়। স্নায়ুতে স্নায়ুতে টান ধরে। কিন্তু সেগুলোকে অবাধ্য হতে দেয় না। মমতাশূন্য অভ্যাসের শাসনে বেঁধে রাখে।

মুখ দেখলে তখন নির্বোধ রকমের নির্লিপ্ত মনে হয় তাকে।

এত নির্লিপ্ত যে বাড়ির মানুষগুলোও নিশ্চিন্ত।

সেতারে আজ কোন অনুভূতির জট ছাড়িয়ে ভেতরটাকে ওপরের দিকে টেনে তোলার সুরে মগ্ন ছিল মনে নেই। তারই একটু রেশ কানে লেগে ছিল হয়তো। ট্রামে-বাসে কখন ওই আলো-অন্ধকারের তত্ত্বের মধ্যে পড়েছিল। ভাবতে ভাল লাগছিল। বাড়ির পথে পা বাড়ানোর পরেও ওই ভাল লাগার একটা কৌতুকরেখা ঠোঁটের ডগায় স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

সুশান্ত সরকার ভাবছিল।—মানুষের বুকের তলায় আগেও আলো বাস করত, অন্ধকার বাস করত। কিন্তু সেই হৃদয়-আকাশে একটার সঙ্গে আর একটার দেখা হত না। ঠিক দিন আর রাত্রির মত। একের পদার্পণে অপরে নিশ্চিহ্ন। ওই হৃদয়-আকাশে প্রসন্ন প্রভাত নামত যখন, তাকে চেনা যেত। অথবা, ভয়াল আঁধার ঘনাতো যখন, তাকেও চেনা যেত। সুসময় বুঝলে তুমি এগিয়ে এসো, দুঃসময় মনে হলে পালাও। এগোনো অথবা পালানো

দুইই তোমার হাতে। ইচ্ছে করলে তুমি আলোতে স্নান করতে পার, ইচ্ছে করলে তুমি অন্ধকারে ডুবে যেতেও পার।

…কিন্তু মানুষ, শুধু মানুষই আজ সেই প্রকৃতির রীতি জয় করেছে, তাকে নাকচ করেছে, বাতিল করেছে। বাতিল করে একটা মশাল হাতে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন শুধু মশাল মশাল মশাল। বুকের তলায় একটা জ্বলন্ত মশাল বয়ে বেড়াও। মশাল কি আলো দেয় না? খুব দেয়। তেমন করে জ্বালতে পারলে দিনের মত আলো দেবে। আবার দরকার মত ধ্বংসের অন্ধকারে টেনে নেবে।

ভারী একটা মজার কথা ভাবছে যেন সুশান্ত।…মানুষ প্রকৃতি জয় করেছে। তার বুকের তলায় আলো-অন্ধকার দুই-ই পাশাপাশি মুখোমুখি বাস করছে এখন। একে অপরকে দেখছে, হাসছে। পরম মিতালি। মনসিজ সহবাস। সে যখন উদার হাসির ছটায় তোমার ভেতরসুদ্ধ আলোয় আলোয় ভরে তুলছে তখন তুমি জানতেও পরবে না কোন্ সর্বগ্রাসী নৃশংস লোলুপ পিচ্ছিল লোভে নিজের আকাঙ্খার দশ হাত চাটতে চাটতে সে তোমার দিকে এগিয়ে আসছে…

অস্ফুট একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসার মুখে গলায় কুলুপ এঁটে এক ঝটকায় হাত দশেক সরে দাঁড়াল সুশান্ত সরকার। আচমকা ঝম্ ঝম্ শব্দে সিঁড়ির ওপর বড়সড় একটা বাঁধানো ফোটো পড়ে ভাঙল। মাথার ওপরে দোতলায় ওই জানালা দিয়ে পড়েছে। পড়েনি, তারই মাথা লক্ষ্য করে কেউ ফেলেছে। চার আঙুলের জন্য মাথাটা বেঁচেছে।

ভাঙা কাঁচের টুকরোয় বাঁধানো জায়গাটায় পা ফেলা দায়। তারই মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে সুশান্ত ওপরের দিকে তাকালো একবার। জানালাটা মাথা বরাবর বলে কাউকে দেখা গেল না। অদূরের ভাঙা ফোটোটার দিকে চেয়ে রইল একটু। শুধু কাঁচ নয়, কাঠের ফ্রেমটাও ভেঙে দুমড়ে গেছে।

পায়ে জুতো আছে, কাঁচ বেঁধার ভয় নেই। এগিয়ে এসে মাটি থেকে ফোটোটা তুলে নিল। ভাঙা কাঁচ আর ভাঙা ফ্রেমের মধ্যে

ভুবড়োনো ছবিটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য, ছবিতে অণিমার মুখটাই শুধু মুচড়ে দুমড়ে বিকৃত হয়ে গেছে, আর সুশান্তর নিজের মুখের ওপর শুধু রাশি রাশি কাঁচের কণা বি'ধে আছে।

মুখে রাশি রাশি কাচের কণা। নিজের অজ্ঞাতে শেভ-করা মুখখানায় একবার হাত বুলিয়ে নিল সুশান্ত সরকার।

···বিয়ের দশদিন পরে নামজাদা স্টুডিও থেকে তোলা এই ছবি। একেবারে রূপসী না হোক, অণিমাকে বেশ সুশ্রীই বলত সকলে। কিন্তু এই ছবির অণিমাকে দেখে ·কাকিমা রেগেই গিয়েছিল। আর কাজল দুষ্টু-দুষ্টু হেসেছিল।

কাজল ওই কাকিমার মেয়ে। তার খুড়তুতো বোন। ছবি দেখে কাকিমা কেন রেগে গিয়েছিল আর কাজল বাঁকা চোখে ছবি দেখে কেন মিটিমিটি হেসেছিল, সুশান্তর না বোঝবার কথা নয়। নতুন বিয়ে করা মেয়ের যৌবনের ধার বড় বেশি স্পষ্ট আর উদ্ধত ঠেকেছিল কাকিমার চোখে। কাজলের চপল হাসির কারণও তাই।

ঠিক এ-রকম হবে ছবি তোলার সময় সুশান্ত ভাবেনি। ছবি দেখার পর খুব যে খারাপ লেগেছিল তাও না। তবে সরাসরি তাকাতে সংকোচ, যৌবন-জাদুর এই গোছের স্পষ্টতা নিভৃতে দেখার বস্তু।

ফোটো হাতে পেয়ে অণিমা বেশ যত্ন করে শোবার ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছিল।

ভাঙা ফোটো হাতে কয়েক পা পিছিয়ে এসে সুশান্ত দোতলার জানালার দিকে তাকালো। এবারে যাকে দেখবে আশা করেছিল তাকেই দেখল। জানালা থেকে হাত দুই সরে অণিমা দাঁড়িয়ে আছে। দুদিকের খোলা চুলের খানিকটা মুখের ওপর এসে পড়েছে। চোখাচোখি হল। এতটা দূর থেকেও সুশান্তর মনে হল ওই দুই চোখের গভীর থেকে সাদা বিষ ঠিকরে পড়ছে। তার গায়ে। তার চোখে। তার মুখে।

সুশান্ত সরকারের মাথায় রক্ত ওঠার কথা। মুহূর্তের জন্য তাই উঠল বোধহয়। কিন্তু পরমুহূর্তে যা সে করল, তা শুধু সে-ই পারে। এতদিন ধরে একমাত্র সেই-ই পেরে এসেছে।

এক হাতে সেতার, অন্য হাতে ভাঙা ফোটো—অণিমার দিকে চেয়ে একগাল হাসল সুশান্ত সরকার।

ওপর থেকে কিছু পড়ার শব্দ আর কাঁচ ভাঙার শব্দ বাড়ির আর কারো কানে যায়নি এমন হতে পারে না। কিন্তু সকলেই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থায় এগোতে অভ্যস্ত। ঝি-চাকর দুটো আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি দিয়েছে, তারপর ভেতর বা বাইরে থেকে হাঁক শোনার আশায় আড়ালেই দাঁড়িয়ে আছে।

ওদিকে ওপরের অন্য জানালা দিয়ে কাজল ভাঙা ছবি আর সেতার হাতে সুশান্তদাকে নির্লজ্জ বোকার মত হাসতে দেখে তর-তর করে নেমে এলো।

—বউয়ের রূপে-গুণে আর মুগ্ধ না হয়ে ওপরে গিয়ে সামলাও-গে যাও, এ-পাশ ও-পাশের বাড়ি থেকে অন্য লোকেও যে রস গিলছে সে হুঁশ আছে?

সুশান্তর হাসিমুখ দোতলা থেকে একতলার বারান্দার দিকে ফিরল। কাজলের মুখে বিরক্তির ঝাঁজটা অকৃত্রিম নয় একেবারে। তবু খারাপ লাগছে না দেখতে। চেহারাপাতি মন্দ নয় কাজলের, তার ওপর একপিঠ চুলের বাহার আছে। চানের আগে বা বিকেলের দিকে নিজের ঘরের সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে চুলের জট ছাড়ায় যখন, নয়তো চিরুনি দিয়ে নির্লিপ্ত মুখে বিন্যাস করে, আর তাই করতে গিয়ে শরীর মাথা যখন এক-একবার ললিত ছাঁদে বেঁকেচুরে যায়—তখন আশপাশের কোন্ বাড়ির কত জোড়া চোখ রস গেলে, সে কথা ওকে কেউ কখনো জিজ্ঞাসা করেনি।

সুশান্তর মুখের হাসি গেল, কিন্তু চাউনিটা হাসিমাখা। যে-গোছের হাসি-বুলোনো চাউনি দেখলে কাজল ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করে আজকাল।

ঠিক তেমনি।

সুশান্তর হাসি-হাসি চাউনিটা আরো নির্বিকার অথচ আরো অবাধ্য হবার উপক্রম। সেদিকে চেয়ে ঝাঁজের মুখেই থমকে গেছে কাজল। দোরগোড়াতে দাঁড়িয়েছিল, নির্লিপ্ত মুখে তার পাশ কাটিয়ে সুশান্ত সিঁড়ির দিকে এগোল।

…তার বাবা কাকা বৈমাত্রেয় ভাই ছিল। ঠাকুমার বোকামিতে বৈমাত্রেয় যে, তারা নিজেরাই অনেকদিন পর্যন্ত জানত না। জানার পরেও দুজনের টানটা ঢিলে হবার বদলে আরো আঁট হয়েছিল। বোকা ছাড়া আর কি বলবে সুশান্ত?

দুজনেই স্বর্গত এখন। বাবার সে এক ছেলে। এখন ভাবে মাঝে মাঝে, এই একজনও, অর্থাৎ সে-ও দুনিয়ার মুখ না দেখলে এমন কি তফাত হত।

আবার ও-রকম ভাবে বলে হাসিও পায়। আর হাসির শেষে বেশ একটা হিংস্র আনন্দ অনুভব করে। সে না এলে বিশ্বসংসারের কণার কণা এই ছোট সংসারটা আবর্তশূন্য হত। সে-রকম আবর্তের সৃষ্টি এখনো হয়নি অবশ্য। হতে পারে। হবে।

কি করে হবে, কখন হবে, কবে হবে, সুশান্ত জানে না। কিন্তু হবে যে তার প্রমাণ হাতের এই সেতার, আর এই ছবি। যে ছবি ভেঙে দুমড়ে গেছে, আর সুশান্ত সরকারের সুন্দর মুখে অজস্র কাঁচের কণা বিঁধে আছে।

কাকার তিন মেয়ে। ছেলে নেই। বড় দুটোকে কাকাই পাত্রস্থ করে গেছে। কাজল ছোট।…বৈমাত্রেয় খুড়তুতো বোন। কিছুকাল আগেও শুধু খুড়তুতো বোন ভাবত। এখন বৈমাত্রেয় কথাটা মনে হয়। হয় বলেই এখন চার্টান বদলাচ্ছে।

কাকিমার ছেলে নেই। জামাইরা ছেলে হতে পারত। হয়নি। কিছুকাল আগেও সুশান্ত ভাবত তার অস্তিত্বের ফলেই জামাইরা জামাই হয়ে থাকল। ক্বচিৎ কখনো মেজাজপত্র ভাল থাকলে কাকিমা বলত, ছেলে নেই কেন, খোকাই তো আছে। অর্থাৎ খোকা সুশান্ত তার ছেলে। রাগলে কাকিমার মাথার ঠিক থাকে না, তখন তার গঞ্জনার হাত থেকে অব্যাহতি কারোরই বিশেষ নেই, তবু অনেকদিন পর্যন্ত কথাটা অবিশ্বাস করার মত বড় কারণ কিছু ঘটেনি।

কাকিমা নরম-সরম ভালমানুষ একমাত্র তার নিজের দিদির কাছে। দিদির মস্ত অবস্থা। কাকিমার থেকে অন্তত অনেক বড় অবস্থা। প্রায় নাগালের বাইরে। কিন্তু নাগাল পেয়ে কৃতার্থ। বড় অবস্থার কদর করতে কাকিমা ভালই জানে। নিজের দুই

জামাইয়ের মধ্যেও দিনযাপন যার একটু বেশি সচ্ছল, কাকিমার তার ওপর টান বেশি।

এই নিয়ে কাজল আর সুশান্ত কত সময় নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করেছে। কাজল বলত মা-র ওই এক রোগ। আর-জন্মে বোধহয় খুব গরীব ছিল।

এখন আর বলে না। সুশান্তর বিয়ের পর থেকে আর তো বলেই না।

সিঁড়ি ধরে ধীরে-সুস্থে ওপরে উঠছিল সুশান্ত। ওপরের বারান্দার মুখে কাকিমার সরোষ আবির্ভাব। গোল ধরনের খরখরে একজোড়া চোখ। এলো চুল, পরনে আধ-ময়লা কাপড়। বেশবাসেও নিজেকে শ্রীশূন্য করার বেশ ক্ষমতা আছে কাকিমার।

—বলি তোর বাদ্য-চর্চা সাঙ্গ হল এতক্ষণে? বাড়ি-ঘর ছেড়ে আমরা কি সব জঙ্গলে যাব এবার?

সুশান্তর ভেতরে যা হচ্ছে, ভিতরেই থাক। হাসল। বোকা মিষ্টি হাসি।

—কি হল?

—কি হল! তোর মত অপদার্থের হাতে পড়ে মেয়েটা তো গেছেই, এবার আমরাও যাব। চোখের আগুনে কাকিমা তার মুখখানা দগ্ধ করে নিল একপ্রস্থ।—কতদিন—কতদিন তোকে বলা হয়েছে ব্যবস্থা কি করবি কর, ও এইভাবে থাকলে তোর খুব সুবিধে, কেমন? বাজনাবাদ্যির রসবতীদের নিয়ে রস করতে বেশ সুবিধে হয়!

বাজনা-বাদ্যির রসবতীদের নিয়ে রস কি করে করা যায় তার হদিস কাকিমা অণিমার কাছ থেকেই পেয়েছে। আর, রস করার টান যে আছে সেই বিশ্বাসও কাকিমার বদ্ধমূল হয়েছে।···হুট করে অণিমা একদিন তাদের গান-বাজনার আসরে গিয়ে হাজির হয়েছিল। সেখানকার গুরু-সান্নিধানে শ্রোতাদের মধ্যে গোটা দুই মেয়েও হাজির ছিল। একেবারে কাঁচা বয়েসকালের মেয়ে নয় একটিও। বিয়ে হয়ে গেছে।

সুশান্ত দু'চোখ বুজে নিবিষ্ট মনে বাজাচ্ছিল। গুরু সহ

অন্য শ্রোতারা নিবিষ্ট মনে শুনছিল। চোখ বুজে থেকেই হঠাৎ সুশান্তর মনে হয়েছিল শ্রোতাদের মগ্নতায় একটু যেন ছেদ পড়েছে। গুরু যেন খুব চাপা গলায় কাউকে বসতে বলল।

চোখ মেলে সুশান্ত দেখে অদূরে অণিমা দাঁড়িয়ে। মারমুখী মূর্তি। শ্রোতারা বিস্মিত, বিড়ম্বিত।

দাঁড়ায়নি বেশিক্ষণ। সুশান্তর হাত থেমে যাওয়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এক ঝটকায় প্রস্থান করেছিল।

সঙ্গীতের আসরে সুশান্তর মাথা কাটা গেছল বটে, কিন্তু তেমনি হাসিমুখেই বাড়িতে পা দিয়েছিল। আর, সঙ্গে সঙ্গে কাকিমা যা মুখে আসে তাই বলে গালাগালি করেছিল তাকে। পারলে তক্ষুনি ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে দেয়। নানা কারণে তার উপায় নেই, কিন্তু মুখে সেই ভাব বা ভাষা প্রকাশ করতে কার্পণ্য করেনি।

আর সেই গালাগালের মুখে কাজল যে-ভাবে তাকাচ্ছিল তার দিকে, মনে হবে, বেশ একটা গর্হিত ব্যাপারেই বউয়েব কাছে হাতে-নাতে ধরা পড়েছে সুশান্তদা।

বাড়ি এসে অণিমা এদের কাছে কি বলেছিল সে-কথা আর জানার বাসনা ছিল না।

আজও, এই রসের খোঁচা খেয়েও সুশান্ত সেতার আর ভাঙা ছবি হাতে নির্বিকার হাসি-হাসি মুখেই নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। কাকিমার সব থেকে বড় শত্রু এখন সে-ই। বিষনজর দিনকে দিন খরতর হচ্ছে। সেটা যদি অণিমার দুরবস্থার কারণে হত তো বোঝা যেত। তা যে নয়, সুশান্তর থেকে ভাল আর কে জানে। হাসি সত্যি পাচ্ছে, না হেসে করবে কি। অণিমার ব্যবস্থা তো ক'বারই করেছিল, আরো কত বার করতে চেয়েছিল।

প্রত্যেকবার বাধা পড়েছে।

অদৃশ্য হলেও সূক্ষ্ম বাধা নয়। বরং বড় স্থূল বাধা। অণিমার বাবা বেঁচে থাকতে তার রোগের কোন বড় চিকিৎসকের পদার্পণ বাকি থাকেনি। বিয়ের কিছুদিন পর সেই চিকিৎসার ঘটার মধ্যেই আবার ঢুকতে হয়েছিল সুশান্তকে। টাকা খরচ

হয়েছে জলের মত। সুশান্তর টাকা নয়, কাকিমারও নয়। অণিমার বাবার টাকা।

এর পর অণিমাকে পাঠানো হয়েছে বড় নার্সিং হোমে। কাকিমার মতে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার অপব্যয়ই শুধু হয়েছে, আর কিছু হয়নি। মাঝখান থেকে মেয়েটাকে শুধু কষ্ট দেওয়া হয়েছে।

মেয়েটার সে-কষ্ট কাকিমার খুব বেশি দিন সহ্য হয়নি। কাকিমার কথায় নার্সিং হোমে টাকার যে হরির লুট হয়েছে তার প্রতিটি কপর্দকও এসেছে অণিমার মায়ের কাছ থেকে। কারণ সুশান্তর শ্বশুর ততদিনে চোখ বুজেছে। মেয়ের বিয়ের আগে থেকেই ভুগছিল, হঠাৎ একদিন অনাড়ম্বরেই বিদায় নিয়েছে। সেই বিদায়ে ও-সংসারে এমন কিছু ওলট-পালট ঘটেনি। ঘটেছে এই সংসারে। শোকের প্রাথমিক অনুষ্ঠান সব শেষ হতে ও-বাড়ির বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে কাকিমার মতামত দেবার বা কথা বলার অধিকার বেড়েছে।

কারণ, সুশান্তর শাশুড়ী কাকিমার সেই বড়লোক দিদি।

নার্সিং হোমের চিকিৎসা-পর্ব শেষ হবার পর প্রয়োজন মত বাড়িতে ছোটখাটো ডাক্তারের আনাগোনা চলেছে। এই বাড়িতে। তারপর ঝোঁকের মাথায় অণিমাকে সুশান্ত সেবারে রাঁচি পাঠিয়ে দিয়েছিল। গোড়ার দিকের এ চেষ্টায় কাকিমার সায় ছিল। প্রায়ই অনুযোগ করত, ধরা-পড়া করে সেখানে কত লোকই তো ফ্রী-বেড জোটায়, কাজের ছেলে হলে সুশান্তই বা পারবে না কেন?

কিন্তু সুশান্ত অতটা কাজের ছেলে নয়। কাকিমার ধারণা, ফ্রী-বেডের সে-রকম চেষ্টাও হয়নি। ধারণাটা মিথ্যে নয় খুব। ফ্রী-বেডের অবস্থা এবং ব্যবস্থা সুশান্ত আগে গিয়ে দেখে এসেছিল। আর তা পেতে হলে যে অনিশ্চিত প্রতীক্ষার প্রয়োজন, অত ধৈর্য সুশান্তর অন্তত নেই। সেখানকার সব থেকে সেরা ব্যবস্থা করেই ফিরেছিল সে। চড়া মাশুল গুনে রোগী রাখার ব্যবস্থা। এ-ব্যাপারে পরামর্শটা আর কাকিমার সঙ্গে না করে সরাসরি শাশুড়ীর সঙ্গেই করেছিল।

শাশুড়ী-জামাইয়ের বাক্যলাপের সংখ্যা সেই বোধহয় সব থেকে বেশি।

তার ফলে সেবারে প্রতি মাসে যে টাকা খরচ হয়েছে, কাকিমার দম বন্ধ হবার দাখিল। কিন্তু টাকার শোক তাকে বড় একটা করতে দেখা যায়নি। শোক যেন মেয়েটার জন্যেই। তার অদর্শনে ঘরে আর এক মুহূর্ত তিষ্ঠোতে পারে না কাকিমা, ছুটে ছুটে যায় দিদির কাছে। আর সামনে পেলে ভাসুরপোকে কারণে অকারণে নাস্তানাবুদ করে। বাক্যবাণে গায়ের চামড়া খুলে নিতে চায়। মেয়েটার ওই দুরবস্থা যে তারই জন্য, গলা ছেড়ে এ-কথাও অজস্রবার বলে।

সুশান্ত আগেও নির্বিকার, পরেও।

শাশুড়ীরও যাবার সময় হয়েছে বেশ আগে থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। ফলে কাকিমার ফুরসৎ আরো কমেছে। একটি মাত্র বড় বোন, নাড়ির টান। কিন্তু সেই টান তো আরো কারো কারো আছে। টাকা যখন আছে, থাকাই স্বাভাবিক। বোন মাত্র তারা দুটি, কিন্তু ছোট-বড় ভাইও আছে আরো তিনটি। তবে সুশান্তর ধারণা, নিজের ওই ভাইদের কাকিমা বেচে কিনে নিয়ে আসতে পারে। যাই হোক, নাড়ির টানে ভাইয়েরাও সুশান্তর শাশুড়ীকে অর্থাৎ তাদের বোনকে দেখতে আসে। কোথা দিয়ে কি বিপত্তি ঘটে যায় ঠিক কি।

কাকিমার বিপত্তি এড়াবার ক্ষমতা দেখে সুশান্ত সত্যিই অবাক হয়েছিল।

শাশুড়ী হতাশ করেনি, প্রত্যাশিত সময়ের কিছু আগেই গত হয়েছে। তারও কিছু আগে থেকে মেয়েটাকে রাঁচি থেকে নিয়ে আসার জন্য কাকিমা সুশান্তর পিছনে লেগেছিল। যাবার আগে তার দিদি মেয়েটাকে একবার চোখের দেখাও দেখে যেতে না পারলে সেটা যে কত বড় হৃদয়বিদারক ব্যাপার হবে, সে-কথা বলেও অণিমাকে নিয়ে আসার জন্য শাসিয়েছে। কিন্তু সুশান্তর কানে তুলো, পিঠে কুলো। সে পাশ কাটিয়েছে।

দিদি মারা যাবার পর কাকিমা গলা ছেড়ে আর্তনাদ করেছে।

কানে তালা লাগার দাখিল পড়শীদেরও। সেই আর্তনাদের মধ্যেই ভাসুরপোর উদ্দেশে অশ্রাব্য গালাগাল করেছে। মেয়েটাকে আনল না তো আনলই না, এই শোক তার জুড়োবে কেমন করে? এই সরব শোকের তাড়নায় তিনদিন পর্যন্ত কাকিমা ভূমিশয্যা ছাড়েনি।

তার বিপত্তি এড়াবার ক্ষমতাটা বেশ স্পষ্ট প্রকাশ হয়ে পড়ল শ্রাদ্ধ-শান্তির পরে। ভাইয়েরা কেউ পাত্তা পেল না। সেই একটা মাস কাকিমা দিদির বাড়িতেই ছিল। দিদির বাড়ি আর কি, সবই তো অণিমার। শাশুড়ী গত হবার পর সুশান্তকে কেউ আর সে-বাড়িতে ডাকেনি। আগেও ডাকত না। তবে কর্তব্যবোধে হোক বা যে কারণেই হোক, না-ডাকলেও শাশুড়ীকে মাঝে মাঝে দেখতে যেত। মারা যাবার পর কাকিমার গালিগালাজের ভয়ে আর যায়নি।

কিন্তু কাজের মধ্যে তো আর না গেলেই নয়। শ্রাদ্ধের আগের সন্ধ্যায় সুশান্ত সেখানে গিয়ে হতভম্ব। শাশুড়ীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াতেই পা দুটো স্থাণুর মত মাটির সঙ্গে আটকে গেল।

খাটের ওপর শোকার্ত মুখে অণিমা বসে আছে। পিঠের ওপর খোলা চুল ছড়ানো। আর চোখের জলে কাকিমার দু'গাল ভেসে যাচ্ছে। অনর্গল সান্ত্বনা দিয়ে চলেছে। আর, অণিমার গায়ে পিঠে হাত বুলোচ্ছে থেকে থেকে।

সুশান্ত নির্বাক বিমূঢ়। নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করবে কিনা জানে না। এই একটা মাস কাকিমা যে এ বাড়িতেই বসেছিল না বুঝতে পারছে।

কিন্তু অণিমাকে নিয়ে এল কি করে ভেবে পাচ্ছে না। সে নিজে গিয়ে রেখে এসেছে, নিয়ম-কানুনের কাগজপত্র সে-ই সই করেছে—অণিমার গার্জেন হিসেবে একমাত্র তারই নামস্বাক্ষর আছে সেখানে। এর মধ্যে অন্য কারো হাতে সেখান থেকে তারা এই রোগী ছেড়ে দিল কি করে। এ-রকম তো আইনে নেই।

...মুহূর্তের জন্য মাথায় বুঝি রক্ত উঠেছিল সুশান্তর। তক্ষুনি ঠিক করেছিল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কেস্ করবে। তাকে দেখে কাকিমা চোখ মুছতে মুছতে গম্ভীর মুখে বলল, আয়, তোর তো

আর দয়ামমা নেই, আমিই গিয়ে নিয়ে এলাম, তোর জন্যে শেষ দেখা তো দেখতে পেলই না, হতভাগী মায়ের কাজটুকু পর্যন্ত দেখবে না—নিজেই গিয়ে নিয়ে এলাম।

এই সুরে কাকিমা কথা বলতেই পারে, খুড়ি-শাশুড়ীর সম্পর্কটাই তো আর বড় নয়, নিজের বোন-ঝি। পায়ে পায়ে সুশান্ত ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে। শোকাচ্ছন্ন গম্ভীর মুখে অণিমা তার দিকে ফিরে তাকিয়েছে একবার। এ চাউনির মধ্যে ভাষা ছিল। নির্বোধ বা বিকৃত চাউনি নয়। প্রতি মাসে রোগীর সম্পর্কে রিপোর্ট আসত তার কাছে। তারা লিখত ইমপ্রুভিং। অণিমাকে দেখে মনে হয়েছে মিথ্যে লিখত না, উন্নতি কিছুটা হয়েছে।

আর সেই কারণেই ভিতরে ভিতরে রাগ আরো দ্বিগুণ চড়েছিল সুশান্তর। এ সময়ে নিয়ে আসা হল বলে। জানলে বাধা দিত, আনতে দিত না। এই জন্যেই তাকে জানানো হয়নি।

কিন্তু ভিতরের রাগ বাইরে প্রকাশ করা রীতি নয় সুশান্তর। এ এক অদ্ভুত কৃত্রিম সংযম তার।

তবু না জিজ্ঞাসা করে পারেনি—তারা ছেড়ে দিল ওকে?

—দিল কিনা দেখছিস না? আমি নিজে গেলাম। ছেড়ে দিতে বললাম, দেবে না কেন?

আরো একটু ঠাণ্ডা মুখ করে সুশান্ত বলেছে, ছেড়ে দেওয়া তো নিয়ম নয়—

শোকের মুখে মাসির মেজাজ চড়ার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট।—তোর মতলবখানা কি, আজও তুই এত চামাড়ের মত কথা বলবি। মেয়েটা ওখানে পড়ে থাকলেই ভাল হত?

অণিমা আরো একবার ফিরে তাকিয়েছে তার দিকে। এ চাউনিটা ঠিক আগের মত নয়। আগের থেকে খরখরে একটু।

সুশান্ত ঘর ছেড়ে সরে এসেছে।

রাঁচির প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কেস্ করার সংকল্পটা তার মাথায় আরো বেশি করে এঁটে বসেছে। সেই সঙ্গে অস্বস্তিকর বিস্ময় একটু।—এ-রকম একটা নিয়মের বাইরে কাজ তারা করল কি করে।

গার্জেনের বিনা অনুমতিতে অণিমাকে ছেড়ে দিল কি করে।

কেন ছেড়ে দিল দিনকতক বাদেই সেটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে গেছে।

না, রাঁচির প্রতিষ্ঠান অন্যায় বা অনিয়মের কিছু করেনি। অণিমা সরকারের গার্জেন আর সুশান্ত সরকার নয়, তার গার্জেন বর্তমানে বিমলা সরকার। অর্থাৎ কাকিমা, অণিমার নিজের মাসি এবং খুড়ি-শাশুড়ী। এ-রকম একটা সম্ভাবনার জন্য সুশান্ত প্রস্তুত ছিল না। নির্বাক বোবার মত সে যেন ভেল্কির খেলা দেখে উঠল একটা।

...শাশুড়ী একটা উইল করে গেছে। অ্যাটর্নি দিয়ে করা বেশ পাকাপোক্ত উইল। সে-উইল রেজিস্ট্রি পর্যন্ত করা হয়ে গেছে, পাছে হারায় বা চুরি যায়। উইলের সারমর্ম. তার অবর্তমানে বাড়ি-বিষয়-সম্পত্তি, ব্যাঙ্কের টাকা ইত্যাদি সব কিছু পাবে তার একমাত্র মেয়ে অণিমা সরকার। আর, যে-হেতু মেয়ের মাথা খুব সুস্থ নয়, সেই হেতু এই সম্পত্তির যাবতীয় ব্যাপার দেখাশুনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকবে অণিমা সরকারের মাসি অন্যথায় খুড়ি-শাশুড়ী একমাত্র বিমলা সরকারের ওপর। বিমলা সরকারের জীবদ্দশা পর্যন্ত আইনত সে-ই অণিমা সরকারের গার্জেন। তার চিকিৎসার জন্য যে টাকা প্রয়োজন হবে, অণিমা সরকারের বিষয় থেকে সেটা তোলার এবং খরচ করার দায়িত্ব বিমলা সরকারের। ইতিমধ্যে মেয়ে যদি সুস্থ এবং নীরোগ হয়ে ওঠে, যাবতীয় বিষয়-আশয় তার হাতে যাবে। অন্যথায় বিমলা সরকারের জীবদ্দশার পর সম্পত্তি দেখাশুনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বর্তাবে অণিমা সরকারের স্বামী সুশান্ত সরকারের ওপর।

...অণিমাদের বাড়ির অ্যাটর্নি ভদ্রলোকের সঙ্গে সুশান্তর দেখা হয়েছিল। আগেও পরিচয় ছিল। সুশান্তর সেতার বাজনা তার ভাল লাগত। এক-আধ সময় বাড়িতে ডেকে নিয়ে সেতার শুনেছে। এই ঘটনার পর সুশান্তই তার বাড়ি গেছল। তাকে দেখে ভদ্র-লোক মুচকি হেসেছিল। বলেছিল, চেষ্টা করলে ফাঁক বার করা যায়, ঝামেলাও বাধানো যায়, কিন্তু সেটা ঠিক হবে না। তার

থেকে অণিমাকে ভাল করে তোলার জন্যেই উঠে-পড়ে লাগো। পরে এদিকে যতটা পারি আমি দেখব'খন।

...উইলের ফাঁক বার করা বা ঝামেলা বাঁধানোর উদ্দেশ্য নিয়ে সুশান্ত তার সঙ্গে দেখা করেনি। ভদ্রলোক তার স্বার্থরক্ষা করবে সেই আশাতেও নয়। গেছল ব্যাপারটা বুঝতে। বুঝে নিয়ে চলে এসেছে। তার বিস্ময়ের অন্ত ছিল না।

...অণিমার বাপের ব্যবসা আগেই বিক্রি হয়ে গেছল। ব্যাঙ্কে লাখখানেক নগদ টাকা আছে, আর হাজার আশী টাকার ফিক্সড্ ডিপোজিট আছে। দক্ষিণে কাঠা ছয়েকের জমি আছে একটা, তারও দাম লাখখানেকের ওপর হবে। আর ওই মস্ত বসত বাড়ি-খানা। শাশুড়ী বেঁচে থাকতেই একতলা আর তিনতলা ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। একতলায় বে-সরকারী অফিস বসেছে একটা, মাস গেলে মোটা টাকা ভাড়া আসে। তিনতলা পার্টিশন করে দু'টি ভাড়াটে বসানো হয়েছিল। তিনতলার দুই ভাড়াটে চারশো আর অফিস ভাড়া পাঁচশো—মাসে ন'শো টাকার ব্যবস্থা শাশুড়ী বেঁচে থাকতেই হয়েছিল। সে চোখ বোজার একমাসের মধ্যে সমস্ত দোতলাটাও এক শাঁসালো মাদ্রাজী ভদ্রলোকের হাতে মাসে সাড়ে চারশো টাকায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে কাকিমার পাকা মাথা, পাকা কাজ।

না, অণিমাকে আবার রাঁচি পাঠানোর কথা তার মাসি মুখ ফুটে একবার উচ্চারণও করেনি। সে প্রস্তাব করতে গিয়ে কাকিমার কাছ থেকে সুশান্তর কিছু কটূক্তি লাভ হয়েছে। বলা বাহুল্য, সে কটূক্তি বোনঝিকে না শুনিয়ে নয়। মেয়েটাকে চোখের আড়াল করতে পারলে সে রক্ষা পায় এ প্রায় নৈমিত্তিক শুনতে হয়।

অণিমার অবস্থা আবার বেশ স্বাভাবিক ভাবেই খারাপের দিকে গড়িয়ে চলেছে। তার মাসি এখনো বলতে গেলে বুক দিয়েই আগলে রাখে তাকে। কোথাও পাঠাবার কথা শুনলে প্রথমে গালাগাল শুরু করে, তারপর চোখের জল ছেড়ে দেয়। তার বিশ্বাস, মেয়েটার অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না সুশান্তর জন্যেই, আর বিশ্বাস সুশান্ত সর্বদাই মুক্তির রাস্তা খুঁজছে। বলা বাহুল্য,

এ-সব বিশ্বাসের কথা কাকিমা কখনো গোপন করেনি।

···খুব বাড়াবাড়ি হলে এখনো ডাক্তার আসে। দিনকতক ঘটা করে চিকিৎসা হয়। কাকিমার হুকুমে ছোটাছুটি তখন সুশান্তকেই করতে হয়। মুখ বুজে হুকুম তামিল করে সে। কিছুদিন বাদেই আবার চিকিৎসার গতি শিথিল হয়। তখনো মুখ বুজেই থাকে সুশান্ত। ···চিকিৎসার খরচ যে কত, বোনঝির সব কিছু আলাদা ব্যবস্থারই বা যে কি খরচ সে শুধু কাকিমাই জানে। বাড়ির সকলের শুধু খরচের হা-হুতাশটুকু হামেশা শুনতে হয়।

···এর মধ্যে কাকিমা আজ আবার তিক্ত-বিরক্ত হয়ে কি ব্যবস্থার কথা বলছে সুশান্তর বোধগম্য হবে কেমন করে?

বুঝতেও চাইল না। কাকিমার রুক্ষ দৃষ্টির পাশ কাটিয়ে ভাঙা ফোটো আর সেতার হাতে সুশান্ত সরকার পায়ে পায়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

অণিমা ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তখনো। অস্বাভাবিক রাগে আর আক্রোশে মুখ লাল, দু'চোখ ঘৃণায় যেন দগদগ করছে। একরাশ ঝাঁকড়া চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। সামনের দিকেও এসে পড়েছে কয়েক গোছা।

এই মূর্তির দিকে তাকিয়েও সুশান্ত হাসল একটু। তারপর ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। সেতারটা জায়গামত রেখে ফোটোখানা নিয়ে দেয়ালের যেদিকে ছিল সেদিকে এগুলো। ঠিক যে হুকে ছিল সেই হুকেই টাঙালো সেটা।

···ছবির অণিমার বিকৃত দুমড়ানো মুখ, আর সুশান্তর মুখে বিঁধে আছে অগুণতি কাঁচের কণা।

সেদিকে তাকানো মাত্র অণিমার মুখখানা বীভৎস হয়ে উঠল। অস্ফুট হুঙ্কারে দু'পা এগিয়ে গিয়ে দু'হাতে সে সেতারটা তুলে নিল, তারপর মাথার ওপর সেটা তুলে দেয়ালের দিকে এগোল। অর্থাৎ ওই সেতারের ঘায়েই ফোটোটা ভেঙে গুঁড়োবে সে।

চোখের পলকে তার হাত থেকে সেতার কেড়ে নিল সুশান্ত। বিছানার ওপর সেটা ফেলেই আলমারির মাথা থেকে চামড়া-বাঁধানো

ছড়িটা টেনে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে তীব্র তীক্ষ্ন ভয়াল আর্তনাদ।

ছড়িটা হাতে নিয়েই সুশান্ত দরজা আগলেছে। বেরুবার জায়গা না পেয়ে অণিমা বিভীষিকাগ্রস্তের মত ঘরের মধ্যে ছোটাছুটি করছে আর আর্তনাদ করছে। যেন সত্যিই সপাং সপাং মার পড়ছে তার পায়ে-পিঠে। আশেপাশের বাড়িতে লোক দাঁড়িয়ে গেছে। আর ওদিক থেকে কাকিমা দৌড়ে এসেছে, কাজল ছুটে এসেছে।

চামড়া-বাঁধানো ছড়ি হাতে সুশান্ত দরজা আগলে স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

তাকে ঠেলে সরিয়ে বোনঝির সঙ্গে তাল মিলিয়ে গলা দিয়ে আর্তস্বর বার করে কাকিমা ঘরে ঢুকল।—কি সর্বনাশ করলি? মেয়েটাকে মেরে ফেলছিস, ফের ওর গায়ে চাবুক তুলেছিস তুই—একেবারে মেরে ফেলবার মতলব – অ্যাঁ?

ছুটে এসে মাসিকে দু'হাতে জাপটে ধরল অণিমা। জাপটে ধরে ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগল।

তাকে জড়িয়ে ধরে কাকিমা বিছানায় বসে পড়ল।—কশাইয়ের হাতে পড়েছিস মা তুই, আস্ত একটা জানোয়ারের হাতে পড়েছিস···দাঁড়া, ওকে আমি ঢিট করব, ঢিট করব, ঢিট করব? কোথায় মেরেছে, ক'ঘা মেরেছে তোকে বল্।

ভয়ে আর উত্তেজনায় অণিমা তখনো আঁকড়ে ধরে আছে মাসিকে, কাঁপছে। সেই অবস্থাতেই বুক-পিঠের কাপড় টেনে খুলে ফেলল। মারের দাগ দেখাচ্ছে—চাবুকে চাবুকে তার সর্বাঙ্গ জর্জরিত করে ফেলা হয়েছে, তাই দেখাচ্ছে।

এ-ভাবে বে-আব্রু হয়ে গায়ের শাড়ি টেনে সরাবে মাসি ভাবেনি। তবু তীক্ষ্ন দু'চোখ তার বুকে-পিঠে বুলিয়ে নিল একবার। বলা বাহুল্য, চাবুকের দাগ একটাও চোখে পড়ল না। নিজে আবার শাড়ির আঁচলটা তার বুকে-পিঠে জড়িয়ে দিল। সুশান্তর দিকে ফিরে দু'চোখে আগুন ছড়ালো তারপর।

—ফের তুই ওর গায়ে হাত তুলেছিস, ফের চাবুক হাতে নিয়েছিস?

সুশান্ত মৃদু জবাব দিল, হাত তুলেছি দেখলে ?

কাকিমা ঝলসে উঠল, ওর মাথার ঠিক নেই তাই দেখাতে পারছে না কোথায় মেরেছিস—না মারলে এবকম করবে কেন, তুই চাবুক হাতে নিবি কোন্ সাহসে ? এত বড় আস্পর্ধা তোর !

সুশান্ত জবাব দিল না। দিয়ে লাভ নেই। জবাব আগে অনেকদিন দিয়েছে। বলেছে, গায়ে হাত সে একদিনও দেয় না, চাবুকটাকে ভয় করে বলেই চাবুক দেখায়। কিন্তু কাকিমা সেটা বিশ্বাস করে না। একেবারে হাত তোলে না সে-বিশ্বাস হয়তো কাজলও করে না। কারণ আর্ত-ত্রাসে অনুদিকে এক-একদিন আর্তনাদ করতে করতে ঘর থেকে বেরুতে দেখে, তাদের যাকে সামনে পায় জড়িয়ে ধরে ডুকরে ওঠে, মেরে ফেলল ! আমাকে মেরে ফেলল !

অমনি ভয়ে দিশেহারা হয়ে একদিন বাড়ির চাকরটাকেই জড়িয়ে ধরেছিল। কাকিমার আক্রোশের কল্যাণে এখন পাড়ার অনেকেই জানে পাগল বউটাকে সুশান্ত সরকার এক-একসময় আধমরা করে ছাড়ে। সেতার বাজানোর দৌলতে পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের একসময়ে ভারী প্রিয়পাত্র ছিল সুশান্ত সরকার। তাদের কোপ থেকে এখনো সেই কারণেই রক্ষা পায়। পাড়ার বয়স্কজনেরা তবু রীতিমত ক্রুদ্ধ হয় এক-একসময়। তাকে শুনিয়েই বলে, এর একটা বিহিত হওয়া দরকার, এভাবে চলতে পারে না।

বিহিত করার মুখে আবার সাত-পাঁচ ভাবে। ঝামেলার মধ্যে সাধ করে কে গলা বাড়াতে যায় !

অণিমার কাঁপুনি থামেনি তখনো। কাঁপছে আর অফুরন্ত রাগে এক-একবার দরজার দিকে তাকাচ্ছে। চাবুক হাতে সুশান্ত দাঁড়িয়েই আছে। তার পিছনে কাজল।

—গেলি—গেলি তুই এখান থেকে—ভাল চাস তো দূর হ' বলছি—দূর হ'। কাকিমার গর্জন।

অণিমা তাকে আঁকড়ে ধরে আছে বলেই, নইলে নিজেই উঠে এসে ঘার ধরে দূর করত তাকে। সুশান্ত চলে গেল। পরক্ষণে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে অণিমা আঙুল দিয়ে ভাঙা তুবড়োনো ফোটোটা দেখাল মাসিকে।

আবারও রাগে ফেটে পড়ল মাসি—জেদ করে ওটা আবার ওখানে টাঙিয়েছে, অ্যাঁ? এই করেই তোর মাথাটা ও আরো বিগড়ে দিল, বুঝলি। দরজার দিকে অর্থাৎ মেয়ের দিকে ফিরল। হাঁ করে দেখছিস কি, ও জঞ্জাল দূর কর না চোখের সমুখ থেকে। ওর ভাল মুখই দেখতে চায় না মেয়েটা। শয়তানি করে এটা আবার ওর চোখের সামনে টাঙানো হয়েছে। দূর কর, রাস্তায় ফেলে দে!

কাজল এগিয়ে এসে ভাঙা ফোটো দেয়াল থেকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ফেলা আর হল না।

সুশান্ত কাছাকাছিই ছিল। কাজলের পথ আগলে মুখোমুখি দাঁড়াল। একেবারে হাতখানেকের মধ্যে।

--ওটা নিয়ে এলি যে?

- মা বলল ফেলে দিতে।

—ফেলে যা দেবার ঠিকই দেব, দে ওটা।

হাত বাড়িয়ে নিতে গেল। কাজল হাতসুদ্ধ পিছনে সরালো ফোটোটা।—বেশি বীরত্ব না দেখিয়ে সরো বলছি, ডাকব মাকে?

—ডাক। খপ করে ফোটোসুদ্ধু তার হাতটা ধরে সামনের দিকে নিয়ে এল। সেই টানে কাজলকে আরো আধ-হাত এগিয়ে আসতে হয়েছে।

এবারে আর চাইতে হল না, কাজল নিজে থেকেই ওটা দিয়ে ফেলল। তারপরেও তার হাতটা সুশান্ত তেমনি শক্ত মুঠোয় ধরে থাকল কয়েক নিমেষ। তারপর ঠোঁটের কোণে হাসির ভাঁজ পড়ল একটু।

নিজের হাতটা কাজল চট করে ছাড়িয়ে নিতে পারল না। ভীতত্রস্ত মুহূর্ত কয়েকটা। যে সুশান্তদার ওপর সে অনেকদিন অনেকভাবে হামলা করেছে, বৈমাত্রেয় খুড়তুতো বোনের অনেক দিনের অনেক প্রগল্‌ভতা যে মানুষ মাথায় চাঁটি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে, তার এই হাসি আর এই চাউনি কাজলের একটুও সরল প্রাঞ্জল ঠেকে না আজকাল। ওর আড়াল থেকে যেন কি এক অপমানের অভিলাষ উঁকিঝুঁকি দিতে দেখে।

মা-কে বলে দিলে তুমুল কাণ্ড হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাও

পারে না। ইদানীং এ মুখের দিকে তাকালে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে কি একটা ভয়ের অনুভূতি পেয়ে বসে থাকে।

হাত ছেড়ে দিয়ে সুশান্ত ভাঙা ফোটোটা নিয়ে আবার শোবার ঘরে ঢুকল—যে-ঘরে এখনো কাকিমা আর বউ বসে। নির্বাক কাজল বিমূঢ় মুখেই পায়ে পায়ে এগিয়ে এল সেদিকে।

ভাঙা ফোটোটা আবার ঠিক সেই একই জায়গায় টাঙাতে দেখে বিমলা সরকারের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল বুঝি। ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠল।--কি, এত বড় সাহস তোর, আবার তুই এটা এখানে টাঙাতে এসেছিস!

কাকিমা ঘরে আছে কি নেই তাই যেন শোনে না সুশান্ত সরকার। অণিমার ঝলসে ওঠা চোখে চোখ রেখে বেশ ঠাণ্ডা মোলায়েম সুরে বলল, ওটা ওখানেই থাকবে, নইলে পিঠের ছাল-চামড়া বলে কিছু থাকবে না।

নির্লিপ্ত বোকা-বোকা মুখেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সামনা-সামনি একটা বাজ পড়লেও বাকি সকলে এমন হতবাক হয়ে থাকত না বোধ করি। কিন্তু সে মাত্র কয়েক মুহূর্ত। ভাসুরপোর চলে যাওয়ার দিকটা ধরে বিমলা সরকারের দু-চোখ দিয়ে সাদা আগুন ঠিকরালো। তারপর ফুঁসে উঠল, এত আস্পর্ধা! মুখের ওপর এত বড় কথা! কার ছাল-চামড়া থাকে না দেখি—

জ্বলন্ত রোষে দেওয়াল থেকে ফোটোটা ছিঁড়ে আনতে গেল। পরক্ষণেই এক অস্বাভাবিক ব্যাপারে একেবারে নাস্তানাবুদ। বিকৃত ত্রাসে অণিমা ছুটে এসে দু'হাতে জাপটে ধরল তাকে। এমন আঁকড়ে ধরেছে যে নড়াচড়ার উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে ওর কাঁপুনির ধকল সামলাতে গলদঘর্ম। বলে উঠল, না না না—না মাসিমা, না! ওটা সরালে আমার সর্বনাশ হবে—ওটা থাক, ওটা থাক, ওটা থাক।

বিমলা সরকার বিমূঢ় একেবারে।

বাইরে কাজলও।

সুশান্তর ওই কথা শুনে আর অণিমার এই ত্রাস আর কাঁপুনি দেখে তাদের মনে হল এই বাড়ির জীবনযাত্রায় কি এক অজ্ঞাত পরিচ্ছেদ শুরু হল বুঝি।

ছেলেবেলা থেকে সুশান্ত সরকারকে একটু ভাবুক গোছের ভাবত সকলে। ভালও বাসত। মিষ্টি চেহারা, কোঁকড়ানো চুল, টানা ডাগর চোখ। গায়ের রঙ তেমন ফর্সা নয়, কিন্তু তাতেই যেন আরো বেশি কমনীয় দেখায়।

তার ভাবুক গোছের মুখের আড়ালে অনেক রকমের দুষ্টুমি ঢাকা পড়ত। স্কুল-কলেজে পড়তে তার অনেক অপরাধ অনায়াসে অন্যের ঘাড়ে চালান হয়ে যেত। তার দ্বারা কোনরকম নষ্টামি-দুষ্টুমি সম্ভব কেউ ভাবতে পারত না। তার ওপর পড়াশুনায় সর্বদা প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়র মধ্যে তার একটা জায়গা নির্দিষ্ট থাকতই যখন, নিছক ভাল ছেলে ছাড়া কে আর কি ভাবতে পারে তাকে।

স্কুলের ওপরের ক্লাসে পড়ার সময় থেকে গোটাকয়েক বছর আবার কবিতা লিখে মোটা মোটা কয়েকটা বাঁধানো খাতা ঠেসে ফেলেছিল। ছোট বড় কিছু মাসিক-সাপ্তাহিকে দু'পাঁচটা কবিতা ছাপাও হয়েছে। ফলে, কপালে কবি নামের ছাপ পড়তে ভাবালু ভালমানুষের আখ্যার মধ্যে কোনরকম ভেজাল আছে কেউ ভাবেনি।

কিন্তু আসলে ভিতরটা কোনদিনই খুব শান্ত নয় তার। সেখানে সম্ভব-অসম্ভব অনেক জটিলতার দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত।

ভেতরটা তার আবেগ-মুখর। আত্মাভিমানী। অল্প বয়সে বাবা-মাকে, বিশেষ করে খুব অল্প বয়সে মা-কে হারানোর ফলে এমনি হয়ে থাকতে পারে। কেউ কোনরকম আঘাত দিলে ভিতরে ভিতরে সেই আবেগের বিপর্যয় ঘটে যেত, অথচ বাইরে প্রকাশ পেত না। কল্পনায় তখন অনেক বড়, অনেক শক্তিমানের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে সেই আঘাতের নির্মম ফয়সালা করত, প্রতিশোধ নিত। সেই কাল্পনিক প্রত্যাঘাত প্রায় বাস্তবের মতই সত্য মনে হত তার। ফলে ওই কাল্পনিক আঘাত সুসম্পন্ন হবার পর শত্রুর প্রতি মায়া হত আবার। তখন তাকে ক্ষমা করতে পারত, নিজেও নিষ্ঠুর আবেগের কবল থেকে মুক্তি পেত।

বি. এ. পাস করার আগে কাব্য ছেড়ে আর এক প্রেরণা পেয়ে

গেল হঠাৎ। কোনো বন্ধু তাকে ধরে নিয়ে গেছল এক সঙ্গীতের আসরে। সমস্ত রাত ধরে গান-বাজনা হবে। পাস যারা সংগ্রহ করতে পেরেছে নিজেদের ভাগ্যবান ভেবেছে তারা। সেই ভাগ্য সুশান্তর কাছে সেধে এসেছিল যেন। কিন্তু কাকিমার এক-কথায় অমন ভাগ্য ধুলোয় গড়াবার দাখিল। তার সাফ কথা, সমস্ত রাত ধরে গান-বাজনার মজলিশে মাথা দেওয়া শুরু করলে পড়াশুনার এখানেই ইতি হোক। মিছিমিছি আর সে হাতির খরচ টানতে পারবে না। মা-বাপ মরা দুঃখী ছেলে, কোথায় মানুষ হবার চেষ্টায় দিন-রাত ডুবে থাকবে, না এই সব দিকে মতি। নেহাত মায়া পড়েছে বলেই খরচ টানছিল, এখন দেখা যাচ্ছে ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে।

কাকিমার ওই ধরনেরই কথা। নিজের মেয়েদেরও ওইরকম করে বলতে ছাড়ে না। অতএব ওরকম মোলায়েম কটূক্তি সুশান্তর কানে তোলার কথা নয়। তার ওপর এ পর্যন্ত পড়াশুনার আসল খরচটা স্কলারশিপের টাকার ওপর দিয়েই চলছে। গোল বাধালো বাপ-মা মরা দুঃখী ছেলের প্রসঙ্গটুকু।

হয়তো আসত না, ওই উক্তির ফলে কাকিমার অবাধ্য হয়েই গানের আসরে এসে জাঁকিয়ে বসল। মেজাজ খিঁচড়ে আছে। ভেতরটা তখনো কাকিমার ওই উক্তির প্রতিশোধ খুঁজছে। অবাধ্য হওয়ার থেকেও অনেক বড়দরের প্রতিশোধ।

কিন্তু গান যে এত বড় ক্লান্তি আর এমন বিরক্তির কারণ হতে পারে, ধারণা ছিল না। আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা ধরে গাইছে এক-একজন। কি যে গাইছে তারাই জানে। গান শেষ হলে হাত-তালির ধুম পড়ে যাচ্ছে। সেটা গানের তারিফে কি শেষ হল বলে, সুশান্তর সেই সংশয়। তার ঘুম পাচ্ছিল, ঘন ঘন হাই উঠছিল।

রাত প্রায় তিনটের সময় এক সেতারী এসে বসল আসরে। সুশান্ত এবারে চেয়ারের পিঠে মাথা রেখে ঘুমিয়েই নেবে ভাবছিল। আশপাশের যারা যা ভাবার ভাবুক গে।

…কিন্তু ঢিমে-তালের পরদা থেকে সেতারের তারে হঠাৎ অদ্ভুত রকমের একটা ঝঙ্কার বেজে উঠতে ভিতরটা কি-রকম করে উঠল

সুশান্তর। মনে হল, তার ভিতরেও ওমনি একটা তার আছে, আচমকা সেটা ধরেই যেন টান দিল কেউ।

তারপর গা-ছাড়া অবস্থা থেকে চেয়ারে কখন সোজা হয়ে বসেছে খেয়াল নেই।

…কখন ভোর হয়েছে, তাও না।

কোন শিল্পানুষ্ঠান শেষ হল কি কিছু একটা কাণ্ড সমাধা হল সুশান্ত তাও জানে না। তার কেবলই মনে হল অনেকক্ষণ ধরে কিছু একটা প্রতিকূল অনুভূতি আধিপত্য বিস্তার করে ছিল। শেষে নানা ভাবে নানা ছন্দে নামা ঝঙ্কারের মূর্ছনায় অবিরাম তাকে আঘাত দিয়ে দিয়ে, আঘাতের পর আঘাত হেনে হেনে একেবারে তাকে বিলম্বিতর নিস্তরঙ্গ তটে এনে ফেলা হয়েছে। তারপর তাকে চির-ঘুমের রাজ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

বন্ধুর দ্বিতীয় দফা নাড়া না খেলে সুশান্ত আসন ছেড়ে উঠত কিনা সন্দেহ।

বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে কাকিমার আবার সেই তিক্ত বচন। সামনে যতক্ষণ থাকবে বর্ষণ থামবে না। ঘরে এসে আশ্রয় নিল। সেতারের ঝঙ্কারগুলো তখনো মাথায় ঠাসা।

নিজের ঘরে বসে সুশান্তর হঠাৎ একসময় মনে হল, ভিতরের তারে বাইরের যে-সব আঘাত এসে বাজে, সেতারের তারেই যেন তার সব থেকে ভাল জবাব দেওয়া চলে। শুধু জবাব দেওয়া নয়, একেবারে শায়েস্তা করে দেওয়া যায়। এমন শায়েস্তা করা যায় যে শত্রুর চোখে বিলম্বিতর ঘুম নেমে আসে। আর নিজের চোখে শান্তির।

দিনে-দুপুরে নিজের ঘরের শয্যায় গা ছেড়ে দিয়ে কল্পনায় ভারী একটা মনোরম দৃশ্য দেখে উঠল সেদিন সুশান্ত সরকার।… গুণী সেতারের তারে ঘা দিয়ে চলেছে। ছন্দোবদ্ধ, নির্মম, নিষ্ঠুর। অশান্ত আঙুলগুলো যেন ঝড়ের বেগে বিলম্বিতর ফাঁদ রচনায় মগ্ন। অমোঘ, দ্রুত। সামনে দাঁড়িয়ে কাকিমা। অসহায় বোবা মুখে গুণীর দিকে চেয়ে আছে। তাদের আঘাতগুলো তারই

বুকে বাজছে। কাকিমা কাঁপছে থরথর করে। সুরের জালে ফেলে এক ক্ষমাশূন্য ব্যাধ যেন কোন অব্যর্থের সীমানার দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। কাঁপতে কাঁপতে কাকিমা বসে পড়ল, তারপর সমর্পণে ঢলে পড়ল মাটির ওপর। গুণী থামল।

দু'চোখ টান করে গুণীকে দেখছে সুশান্ত।···সেতার হাতে নিজেকেই দেখছে।

কাকিমা উপলক্ষ মাত্র। নইলে এমনি একটা শক্তির আশ্রয় সে যেন জন্ম থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এতকাল তার হদিস মেলেনি। এখন মিলেছে। নইলে সেতারের তারের ঝঙ্কার তার ভেতরের অদৃশ্য তারগুলোকে এভাবে নাড়া দিল কেমন করে? তার আবেগে এভাবে একাত্ম হল কি করে?

সেই বিকেলের মধ্যেই ভদ্রলোকের নাম সংগ্রহ হল, ধাম সংগ্রহ হল। বিগত আসরের সেই শিল্পীর। তারপর সন্ধ্যার মুখে পায়ে পায়ে হাজির তার বাড়ি। এক অদৃশ্য অদম্য তাগিদ বুঝি এক-মাত্র মুক্তির পথে ঠেলে নিয়ে গেল তাকে।

সুশান্ত সরকার সেদিন জয়যাত্রায় বেরিয়েছিল। আর জয় করেই ফিরেছিল।

প্রথম দর্শনে সুন্দর কমনীয় মুখের প্রভাব কিছু আছেই। তাছাড়া সিদ্ধিলাভ হবে বলেই বোধহয় মাহেন্দ্রক্ষণে আবির্ভাব তার। একেবারে একলা বসে বেশ খোশমেজাজে সেতার বাজাচ্ছিল ভদ্রলোক। চাকরের নির্দেশে বিনম্র পায়ে সেখানে এসে দাঁড়াল। মুখ তুলে ভদ্রলোক তাকে দেখল একবার, তারপর ইঙ্গিতে বসতে বলল।

এ বাজনায় তন্ময়তা ছিল না কিছু। একটু বাদে তার হাত থেমে গেল। সেতার পাশে রেখে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল।

জবাবে সুশান্ত উঠে এসে পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল।

ভদ্রলোক অবাক একটু।—কি ব্যাপার?

সুশান্ত সবিনয়ে জবাব দিল, কাল আসরে আপনার বাজনা শুনেছি, আজ প্রণাম করতে এলাম।

এর পরেও খুশি না হলে সে শিল্পী নয়।—তুমি সেতার খুব ভালবাস বুঝি?

সুশান্ত জবাব দিল না। চুপচাপ চেয়ে রইল।

জবাব না দেবার এই ভঙ্গীটুকুও শিল্পীর ভাল লাগল। একটু হেসেই বলল, কাল কিন্তু খুব শুদ্ধ রাগ বাজাইনি আমি, কিছু ভেজাল ছিল—ধরতে পেরেছ?

ঠাণ্ডা মুখে তার দিকে চেয়ে সুশান্ত মাথা নাড়ল, পারেনি।

এতেও প্রীত হয়ে ভদ্রলোক স্বাভাবিক সৌজন্যবশে তার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করল। কি পড়ছে তাও জেনে নিল। যথাযথ জবাব দিয়ে সুশান্ত ফস করে বলে বসল, সকাল থেকে সমস্ত দিন ছটফট করে শেষে চলে এলাম···সেতারের গুরু খুঁজছি।

বলার ধরনে শিল্পী একটু কৌতুক বোধ করলেও আমল না দিয়ে বলল, আমি গুরুগিরি করব তোমাকে কে বলল?

দৈবানুগ্রহে মূকও বাচাল হয়। তাছাড়া কমনীয় মুখের সুতৎপর সুবচন আর যাই হোক বিরক্তির উদ্রেক করে না। অবশ্য এই বচন-পটুতার খবর সুশান্ত নিজেও রাখত না। তেমনি নম্র বিনয়ে বলে বসল, না করলে তো একলব্যের দশা হবে আমার।

কলেজে-পড়া অন্য ছেলের মুখে যে কথা শুনে পাকামো মনে হত, এই মুখে সে-কথাগুলোই কৌতূহলের উদ্রেক করল। কোন্ দরের প্রতিভার আধার ছেলেটা সেটুকু বুঝে নেবার আগ্রহ হল। খানিক তার দিকে চেয়ে থেকে শিল্পী সেতারটা তার দিকে ঠেলে দিল, আচ্ছা, বাজাও দেখি একটু শুনি—

সুশান্ত জবাব দিল, ওতে এখন হাত দিলে তারগুলো ছিঁড়বে, এ পর্যন্ত আমি সেতার কখনো স্পর্শ করিনি।

এবারে সত্যিকারের বিস্ময়ের পালা। ছেলেটা বাচালতা করতে এসেছে কিনা তাই বুঝে নিতে চেষ্টা করল ভদ্রলোক। কিন্তু সে-রকমও মনে হল না।

—তাহলে?

—আপনি আদেশ করলে আমি সেতার সংগ্রহ করি।

এ-রকম ঝামেলা কে নিতে চায়, শিল্পী সদয় মুখ করেই

পরামর্শ দিল, গোড়াতেই আমার কাছে এসে কিছু হবে না, একজন মাস্টার রেখে আগে শেখো কিছুদিন, কিছুটা হাত পাকুক, তারপর দেখা যাবে—এ শিখতে অনুশীলন দরকার, ভাব দরকার—

—ভাব আছে আর এ পর্যন্ত কয়েকশ' কবিতা লেখা হয়ে গেছে। আর ভাব আছে বলেই এ-ভাবে আপনার কাছে ছুটে আসা।...মাস্টারের কাছে শেখা হবে না, পনেরো-বিশ টাকা মাইনেও দিতে পারব না, কাকিমার ভাত খাই, শুনলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু আপনি আমাকে ছ'টা মাস মাত্র সময় দিন না, কিছু হবে না বুঝলে না-হয় গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবেন।

গুরু লাভ হবে বলেই বোধ করি ভদ্রলোক ক্রমে আকৃষ্ট হচ্ছিল তার দিকে। হেসেই জিজ্ঞাসা করল, এ-রকম অবস্থা তো সেতার কিনবে কি করে, আজকাল তাতেও খুব কম টাকা লাগবে না—

এইবারের জবাবটাই সুশান্তর রং-তুরুপ।—স্কলারশিপ পাই বলে কলেজে ফ্রী পড়তে দেয়, কিন্তু যাতায়াত বই-খাতা-পত্র কিনে যা বাঁচে সব কাকিমা নিয়ে নেয়।—ম্যাট্রিক আর ইণ্টারমিডিয়েটের দুটো সোনার মেডেল আছে, ও-দুটো বিক্রি করে হবে না?

গুরু লাভ হয়েছে। আর মাস কতকের মধ্যে শিল্পীর মনে হয়েছে, এই ছেলের যদি সেতার শেখা না হয়, আর কারো হবে না।

কিন্তু গুরু লাভ যে হয়েছে সেটা অনেক দিন পর্যন্ত এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ভিন্ন আর কেউ জানতেও পারেনি। সোনার মেডেল দুটোর একটা বিক্রি করেই সেতার এসেছে। খুব সঙ্গোপনে। সেটার আশ্রয় মিলেছে সেই বন্ধুর বাড়িতেই। বছরখানেক পর্যন্ত অনুশীলন সেখানেই সমাধা হয়েছে।

—সুশান্ত তখন এম. এ. পড়ে। দিনকতক জ্বরে পড়ে গেল। একদিন সেতার কাঁধে বাড়িতে সেই বন্ধুর আর্বিভাব। বাড়ির লোকে ভাবল তারই সেতার। খানিক বাদে বাজনা কানে আসতেও সে-ই বাজাচ্ছে ধরে নিল। বাড়িতে গান-বাজনার আসর বসানো হয়েছে বলে বিমলা সরকার নিজের ঘরে বসে মেয়েদের সামনে খনখন করে উঠল। তখন শুধু বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, আর

মেজ মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা চলছে। কাজল হায়ার-সেকেণ্ডারি দেবে, সুশান্তদার ব্যাপারে তারই কৌতূহল আর ছটফটানি বেশি।

মায়ের অগোচরে চুপি চুপি সে একতলায় নেমে জানালা দিয়ে সুশান্তদা'র ঘরে উঁকি দিয়েই হাঁ। সংবিত ফিরতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ওপরে ছুটল আবার। আর একটু বাদেই শুধু ছোড়দি নয়, মা সুদ্ধু একতলার জানালার পাশে এসে দাঁড়াল।

—বন্ধু নয়, চোখ বুজে নিবিষ্ট মনে সেতার সুশান্ত বাজাচ্ছে।

মুগ্ধ বলতে গেলে একমাত্র কাজলই হয়েছিল, আর কিছুটা তার ছোড়দি। কিন্তু তাদের মায়ের পিত্তি জ্বলে গেছে। নানারকম সন্দেহ মাথায় গিসগিস করেছে। বছরখানেক ধরে ছেলের পড়ার এত ঝোঁক যে য়ুনিভার্সিটি থেকে ফিরে নাকে-মুখে কিছু গুঁজেই আবার ছুট। ফিরতে রাত্রি। একটা বছরের মধ্যে বিকেলের দিকে অন্তত বাড়ির দরকারি কাজেও তার টিকির দেখা মেলেনি।

—এখন বোঝা যাচ্ছে কোন্ পড়ার এত তাগিদ।

বন্ধুর বাড়ির চৌকাঠ পার হতে না হতে তার তিক্ত জেরা শুরু হয়েছে। সেতার কার, কতকাল ধরে এই চোখে ধুলো দেওয়া শুরু হয়েছে, কার কাছে শেখা হচ্ছে, তাকে টাকা দিতে হয় কিনা, ইত্যাদি। তার সন্দেহ ঘোরালো হয়েছে আরো।—বাড়ি-ভাড়ার টাকা সে-ই আদায় করে। এটা পৈতৃক বাড়ি, এর অর্ধেক মালিক সুশান্ত। চোখ বোজার আগে বিমলা সরকারের স্বামী আর একটা ছোট বাড়ি কিনে রেখে গেছল। খাওয়া-পরার সংস্থান এখন সেটার থেকেই চলছে। মাসে সাড়ে চারশো টাকা ভাড়া আসে। ব্যাঙ্কে যা সামান্য টাকা আছে তাতে বা তার সুদে শত প্রয়োজনেও হাত পড়ে না।

···বিমলা সরকারের প্রথম সন্দেহ বাড়ি-ভাড়া আদায়ের মধ্যে কোন কারচুপি হয়ে গেল কিনা। না, সেটা সম্ভব নয়। প্রতি মাসের সাত তারিখের মধ্যে রিসিট কেটে টাকা বুঝে নেয়। অতএব পরের সন্দেহ আরো বদ্ধমূল। বাড়ির মাসকাবারি বড় খরচপত্র সব ভাসুরপোর হাত দিয়ে হয়। যদিও হিসেবপত্র সব কড়া-ক্রান্তিতে বুঝিয়ে দেয়, তবু এর মধ্যেই অনেক ফাঁক থাকতে পারে।

অতএব জেরার পর জেরার ফলে সেতার কোন্ টাকায় কেনা হয়েছিল সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ল। সোনার মেডেল বিক্রি করে সেতার কেনাটা চুরির সামিলই অপরাধ তার চোখে। সে যখন পড়াচ্ছে ভাসুরপোকে, ওই সোনার মেডেলের ওপরে তো তারই অধিকার। আর এমন সেয়ানা পাজী ওই ছেলে যে সোনার মেডেল এনে হাতে দেওয়া দূরে থাক, তাকে জানায়নি পর্যন্ত।

বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় সোনার মেডেলটা কাকিমার হস্তগত হয়েছে আর তার পরেও রাগ পড়তে সময় লেগেছে। নির্ভেজাল স্পষ্ট কথায় শাসিয়েছে, এ-সব গান-বাজনায় মেতে যদি পড়াশুনা পণ্ড হয় তো এ বাড়ির ভাত এখানেই শেষ।

একমাত্র সম্বল দ্বিতীয় সোনার মেডেলটা খোয়া গেল বলে সুশান্তর একটুও খেদ ছিল না। কাকিমার সন্দেহ বা গঞ্জনার জন্যও না। সেতার শেখার ব্যাপারে গোপনতার পর্বটা শেষ হল বলেই খুশি। আর খুশি তার বাজনার কৃতিত্বে কাজলের পুলক-মিশ্রিত বিস্ময় দেখে।

বস্তুত কাকিমার কথাবার্তায় আচরণে সুশান্তর তখন অনেক সময়েই রাগ হত বটে, কিন্তু মহিলাটিকে খুব খারাপ লোক ভাবত না সে। আত্মাভিমানে আঘাত লাগলে হঠাৎ দুর্জয় রাগ তার সকলের ওপরেই হত। এটা সুশান্তর একটা রোগের মত ব্যাপার। তাছাড়া কাকিমার গঞ্জনার উপলক্ষ এ-বাড়িতে সে একা নয়। তার নিজের মেয়েরাও অব্যাহতি পেত না।

বাইরে যেমনই হোক, কাকিমাটির ভিতরে ভিতরে ছিটেফোঁটা স্নেহ আর কর্তব্যজ্ঞান আছেই ভাবত। এই তো গত পরশু রাতে সাড়ে তিন জ্বর উঠেছিল তার। একসময় চোখ মেলে দেখে কাকিমা শিয়রে বসে কপালে জলপটি দিচ্ছে আর মাথায় বাতাস করছে। চোখাচোখি হওয়া মাত্র অবশ্য মুখ ছুটেছে, ঠাণ্ডা লাগাবার সময় মনে থাকে না, ভোগার বেলায় বাড়িসুদ্ধ লোক ভোগো—সব ঝামেলা নিয়ে তার হয়েছে মরণদশা, ইত্যাদি।

কিন্তু এই ঝামেলা পোহানোর জন্যে কেউ তাকে ডাকেনি,

নিজের থেকেই এসেছে, এও সত্যি।

···মহিলার একটাই রোগ, আর এই রোগ নিয়ে সুশান্তর সঙ্গে খুড়তুতো বোনেরাও কম হাসাহাসি করে না। টাকার রোগ। কাজল তো কত সময়ে বলে, মা-কে টাকার ভূতে পেয়েছে?

টাকার ব্যাপারে কাকিমা কত সময়ে কত হাস্যকর ছেলেমানুষি কাণ্ড করেছে, ঠিক নেই। তার দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ে আটকে আছে বলতে গেলে এই টাকার জন্যেই। সুশান্তর ধারণা, কাকা মেয়েদের বিয়ের টাকা মোটামুটি রেখেই গেছে, কিন্তু কাকিমার সে-টাকা হাত ছাড়া করতে প্রাণ-ছাড়ার অবস্থা। কাজল অল্প বয়েস থেকে কথায় পাকা, হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করার পর আরও পাকা হয়েছে। মায়ের আড়ালে সে ঠোঁট উল্টে বলেছিল, বড়দির বিয়েটা বাবা ছিল তাই সহজে হয়েছে, মেজদির বিয়ের তো এই অবস্থা—সেটা যদি কোনরকম করে হয়েও যায়, আমার আর কোন আশাই নেই।···হয়ও যদি, এক পয়সাও খরচ নেই এমন কোন বৈরাগী-টৈরাগীর হাতে পড়ব।

সুশান্তর ধারণা, খুব মিথ্যে বলেনি। তবু ঠাট্টার ছলেই আশ্বাস দিয়েছে, ততদিনে আমি একটা বড় চাকরি-টাকরি করব নিশ্চয়, তোর বিয়ের ভার না হয় আমিই নেব। এখন বিয়ের চিন্তা ছেড়ে বি. এ. পড়ার বইপত্র গোছাগে বসে।

এ-সব কথায় কাজলের বেহায়াপনা দিনকে-দিন বাড়ছে। হায়ার সেকেণ্ডারির বেড়া টপকাবার পর থেকে চোখের কোণ দিয়ে তাকানো আর ঠোঁটের কোণে হাসি ফোটানোটা আরো ভাল করে রপ্ত করেছে। এই বিন্যাসের সঙ্গে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করেছে, আমার বিয়ের ভার তুমি নেবে কি রকম?

কি রকম বোঝাবার জন্যে ওর মাথায় একটা কষে গাঁট্টা বসাতে ইচ্ছে করেছে সুশান্তর। মুখে বলেছে, পারলে দশ-বিশ হাজার টাকা খরচা করব।

--তাই বলো। ব্যাখ্যা পেয়ে চপল গাম্ভীর্যে নিশ্চিন্ত যেন।

কাকিমার শাসানি একেবারে সফল না হলেও নিষ্ফলও হয়নি। সুশান্ত মোটামুটি ভালই এম. এ. পাস করেছে, কিন্তু আশাপ্রদ

হয়নি। এই শেষ পরীক্ষাটাই সব থেকে ভাল হওয়া দরকার ছিল —সেটাই খারাপ হয়ে গেল। ফার্স্ট ক্লাস পেল না।

দুষ্টুমি করে কাজল মা-কে বোঝাল, শিল্পী হবার ফল দেখো, যে-পাস করেছে এখন স্কুলমাস্টারি জুটলে হয়।

নিজে ও একবারে বি. এ পাস করবে কিনা সে সম্বন্ধে সুশান্তর যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কাকিমা শুধু এটুকুই বুঝেছে, ভাসুরপোর মাথায় গান-বাজনার দুষ্টু সরস্বতী চাপার ফলটা ভাল হয়নি। হবে না সে তো আগেই জানত। পাসের খবর বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে চাকরির জন্যেও উঠে-পড়ে লাগছে না বলে আরো রাগ। আর, সুশান্ত লক্ষ্য করছে, তার সামনেই কাজল মায়ের এই রাগে দিব্যি ইন্ধন যোগায়। পরে মায়ের অনুপস্থিতিতে তার সামনে এসে হাসতে থাকে।

ওর হাব-ভাব দেখে সুশান্তর মনে হত মাথাটা ভাল করেই বিগড়োচ্ছে। ট্রামে-বাসে যেতে আসতে অনেক সময় অনেক কিছু চোখে পড়ে তার। কলেজের ছেলে-বন্ধুদের সঙ্গে হাসতে হাসতে চলেছে কোথাও, নয়তো ওদের সঙ্গে রেস্টুরেণ্টে বসে চপ-কাটলেট গিলছে। সিনেমা হল থেকেও বেরুতে দেখে মাঝে মাঝে। বাড়ির ছোট মেয়ে, তার ওপর বলতে গেলে জন্ম থেকে একসঙ্গে মানুষ, খুড়তুতো বোনেদের মধ্যে ওর ওপরেই একটু বেশি মায়া। তাই বাড়াবাড়ি মনে হলে ডাক না দিয়ে পারে না।

কাজল পাল্টা চোখ পাকায় তক্ষুনি।—বেশ করি, তোমার তাতে কি ?

—আমার কি দেখবি, কাকিমাকে বলব ?

কাজল হাসে। জবাব দেয়, বলে দেখো না একবার—আমিও হাটে হাঁড়ি ভাঙতে জানি।

সুশান্ত অবাক।—তুই আবার কি হাটে হাঁড়ি ভাঙবি!

কাজলের চোখের কোণে তাকানো আর ঠোঁটের কোণের দুর্বোধ্য হাসি দেখলে গা জ্বলে। কিন্তু কথা শুনলে আরো অবাক লাগে। হাসি চেপে মুখ মচকে সেদিন জবাব দিল, মা-কে যা বলব তাই বিশ্বাস করবে, তুমি সৎ ভাসুরের ছেলে, তার কাছে তুমি বেশি

আপনার, না আমি ?

আত্মীয়তার এই পলকা যোগসূত্রটার ওপর প্রায়ই আজকাল জোর দিতে দেখে ওকে। তাদের বাবারা সৎ ভাই ছিল এটা যেন মস্ত দূরের ব্যাপার। আর তাদের ছেলেমেয়েদের যা সম্পর্ক, তাতে দাদাগিরি ফলাতে আসাটা যেন হাস্যকর গোছের ব্যাপার।

সুশান্ত নির্বোধ নয়, চেষ্টা করলে এই বিকৃতির মূলে পৌঁছতে পারে। বুঝতেও পারে। কিন্তু বুঝতে চেষ্টা করলে কান গরম হয়—চিন্তাটা তাই সমূলে ঝেঁটিয়ে দূর করে। ভাবে যেমন ফাজিল তেমনি ছেলেমানুষ বলেই ওই রকম করে।

…আবার মনে হয় মেয়েটা বড় বেশি বাঁকা রাস্তায় চলেছে।

বই-পত্র নিয়ে সুবোধ মেয়ের মত কাজল মাঝে মাঝে পড়তে আসে তার কাছে। সুশান্ত পড়ায়। সেদিনও পড়াচ্ছিল। কাজল হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে আছে।

—বুঝছিস না ?

কাজল মাথা নাড়ল, বুঝছে না।

আবার গোড়া থেকে বোঝাল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, হয়েছে ?

কাজল এবারও মাথা নাড়ল, হয়নি।

সুশান্ত রেগেই গেল হঠাৎ। বলে উঠল, কোথায় কোন্ ছেলের নাকে দড়ি পরানো যায় মাথায় কেবল এই চিন্তা—হবে কি করে ?

কাজল চেয়ে আছে, তার চোখের কোণে হাসি ঝিলিক দিল, ঠোঁটের কোণেও। তারপর জবাব দিল, না তো কি, তুমি বিয়ের ভার নেবে বলেছিলে সেই আশায় থাকব ?…দেড় বছর এম. এ. পাস করেছ এ পর্যন্ত দেড় টাকাও তো রোজগার করতে পারোনি।

পাছে এরপর হাত ওঠে এই ভয়ে কাজল সরে বসেছে একটু। না, সুশান্তর হাত ওঠেনি, হাতের বইটাই শুধু ওর গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। বলেছে, সে চেষ্টাই কর্ গে তাহলে, তোর আর বি. এ. পাস করা হবে না।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে সুশান্তর বেশ একটা অস্বস্তিকর দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে ওকে নিয়ে। মনে হয়েছে মেয়েটা গণ্ড-গোলের রাস্তায় হাঁটছে।

এর ওপর পড়তে এসে অন্যান্য দেশের সমাজ-ব্যবস্থার ভাল-মন্দ জানার ব্যাপারে ঝোঁক দেখা যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। একটা ইংরেজি উপন্যাসের আলোচনা টেনে সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, বিলেতের ছেলেমেয়েদের ফার্স্ট কাজিনের সঙ্গে বিয়েটা নাকি ভাল বিয়ে—এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারাও নাকি ফার্স্ট কাজিন—ওরা এ-রকম বিয়ে এত সহজ ভাবে নেয় কি করে? আর একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, কোন কোন লোকের মতে রামের সঙ্গে সীতার ভাই-বোনের মত কি একটা সম্পর্ক ছিল সেটা ঠিক কিনা। শুধু তাই নয়, লাইব্রেরি থেকে বেছে বেছে এদেশের প্রায়-সভ্য অথচ প্রায়-অজ্ঞাত সমাজের সম্পর্কে দুই একটা বই এনে বেশ মন দিয়ে পড়তে দেখেছে ওকে—যে সমাজের মধ্যে ভাই-বোনের বিয়ে এখনো চালু। সে বই আবার ভুল করে এক-আধ সময় সুশান্তর নাগালের মধ্যে ফেলে গেছে।

মোট কথা, ওর মতিগতি সুশান্তর একটুও ভাল লাগছিল না।

হঠাৎ একদিন এ-বাড়ির হাবভাবই একেবারে বদলে গেল যেন। এ বাড়ির বলতে বিশেষ করে কাকিমার। আর খানিকটা কাজলেরও। ও হঠাৎ পড়তে আসা একেবারে ছেড়েই দিল। দূর থেকে গম্ভীর মুখে তার দিকে চেয়ে থাকতে দেখেছে ক'দিন। আর তারও দিনকতক বাদে হাসি-হাসি মুখ।

এম. এ পাস করার পর আদা-জল খেয়ে দেড় বছরের মধ্যে একটা চাকরি জোটাতে পারল না বলে যে কাকিমার নৈমিত্তিক গঞ্জনা ডাল-ভাতের মতই সহজ হয়ে এসেছিল, তাকে হঠাৎ যেন অতিরিক্ত সদয় মনে হতে লাগল সুশান্তর। এর ওপর যে মহিলা সেতারের শব্দ কানে গেলে সেতার ছাপিয়ে ঝঙ্কার তুলতে চাইত, তার হঠাৎ এই শিল্পকলার প্রতি আগ্রহ দেখেও হতভম্ব সে।

ব্যাপার কিছুই নয়, রেডিওতে সেই প্রথম সেতার বাজাবার প্রোগ্রাম পেয়েছিল সুশান্ত। বিশ মিনিটের প্রোগ্রাম, পাবে মাত্র পঁচিশ টাকা। এই প্রোগ্রামের কথা কেবল কাজলই জানত। সেই বাজনা কাকিমা ধৈর্য ধরে শুনেছে এমন কথা কেউ হলপ করে

বললেও বিশ্বাস হবার নয়। তার প্রথম দিনের বাজনা শুনে রেডিও অফিসের অনেকেই খুব প্রশংসা করেছিল অবশ্য, পরদিন তার গুরুও আনন্দে পিঠ চাপড়ে ছিল- কিন্তু কাকিমা যদি ভুলক্রমে শুনেও থাকে সে-বাজনা, একটুও মুগ্ধ হয়েছিল এমন অলীক কল্পনার কোন কারণ নেই। প্রোগ্রাম সেরে রেডিও অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে একটু রাত হয়েছিল বলে ওই রাতেও তার গঞ্জনার হাত থেকে অব্যাহতি মেলেনি।

· অথচ ঠিক তার পরদিন থেকেই ভোজবাজীর ব্যাপার যেন। পরের সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে সেতারটা সবে দেয়ালে টাঙিয়েছে, ফিরে দেখে হাসি-হাসি মুখে পিছনে কাকিমা দাঁড়িয়ে। আর দরজার ওধারে কাজল।

কাকিমার এই পেলব মুখখানাই বিস্ময়ের কারণ, তার ওপর কথা যা শুনল, দু'চোখ ঠিকরোবার দাখিল।

—কাল তুই রেডিওতে খুব ভাল বাজিয়েছিস যে রে, সকলেই বলছে।···তা অমনি বাজালি, না টাকা-পয়সাও দিল কিছু?

তখনো ধারণা এর পরেই কাকিমা ফেটে পড়বে—টাকা ক'টা সমর্পণ করে তাকে শান্ত করার তাগিদে পকেট থেকে চেকটা বার করে বলল, এটা ভাঙাবার ব্যবস্থা করে তোমাকে দেব ভেবেছিলাম—

—থাক, ও তোব কাছেই রেখে দে। কিন্তু একবার জানালেও তো পারতিস, আমাকে শত্রু ভাবিস নাকি?

কানে যা শুনছে আর চোখে যা দেখছে ঠিক কিনা সুশান্ত জানে না। সে বাকশক্তিরহিত।

তেমনি সস্নেহ হাসিমাখা মুখে কাকিমা আর একটু এগিয়ে এসে তার বিছানায় বসল।—তা হ্যাঁরে, এই সব বাজনা-টাজনা শেখার নাকি ভাল মাস্টারও মেলে, তুই দেখেশুনে একজনকে ঠিক কর: না —শখ যখন আছে, টাকা যা লাগে ব্যবস্থা হবে'খন।

নিজের মাথাটাই জোরে একবার ঝাঁকিয়ে নিতে ইচ্ছে করছিল সুশান্তর। স্বপ্নের ঘোরে শুনছে কিনা কে জানে। আত্মস্থ হয়ে এগিয়ে এসে কাকিমার পায়ের ধুলোই নিয়ে ফেলল সে। বলল, তার দরকার নেই কাকিমা, আমি যে গুরু পেয়েছি পয়সা দিয়ে মেলে না।

কাকিমা চলে যাবার পরেও সুশান্ত বিমূঢ় খানিকক্ষণ পর্যন্ত। দরজার দিকে ফিরে দেখে কাজল নিবিষ্ট মনে তাকেই নিরীক্ষণ করছে। চোখাচোখি হতে ও প্রস্থানের উদ্যোগ করল।

সুশান্ত ডাকল, এই মেয়ে, শোন্ তো—

কাজলের শোনার আগ্রহ নেই, চলে যাচ্ছে। সুশান্ত বাইরে থেকে হাত ধরে হিড়হিড় করে ওকে ঘরে টেনে নিয়ে এল। কাজল রেগে গেল, থাক্, আর অত আদিখ্যেতা করতে হবে না, ছাড় বলছি।

—দেব এক থাপ্পড়! কি হয়েছে বল্ তো?

ঠোঁট উল্টে কাজল জবাব দিল, তোমার সুদিন আসছে।

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু ব্যাপারখানা কি?

—পরে বুঝবে। ভয়ের কিছু নেই, জেগে বরং স্বপ্ন-টপ্ন দেখতে পারো। চলে গেল। সুশান্ত বিমূঢ় তেমনি।

এর পর সুদিনের আভাস যেন একটু দ্রুতই পেতে লাগল। দিন দুই-তিন মাত্র একটু গম্ভীর হয়েছিল কাজল। তারপর তার মুখেও হাসির ঝিলিক দেখা গেছে। কাকিমা কোন ব্যাপারে পরামর্শ বড় একটা কারো সঙ্গে করে না। নিজের একটা মাথাই একশো ভাবে। কিন্তু কিছুদিন ধরে মা-মেয়ের বেশ সম্ভাব দেখা যাচ্ছে। দিনের মধ্যে অনেকবার দুজনে একান্তে বসে আলাপ-আলোচনা করে কি। সুশান্তকে সেদিকে দেখলে তাদের আলাপ থেমে যায়। কাজল সকৌতুকে তাকায় তার দিকে, আর, কাকিমা হাসিমুখে আপ্যায়ন জানায়, আয়, তোর তো কোনদিনই দু'দন্ড ঘরে এসে বসতে ইচ্ছে করে না।

দিন কয়েকের মধ্যেই বাড়ির এই হাওয়া বদলের কারণ বোঝা গেল।

সেদিন সন্ধ্যার আগে সেতার কাঁধে সুশান্ত বাড়ি ফিরছিল। দোরগোড়ায় একটা পুরনো গোছের গাড়ি দাঁড়ানো দেখল। গাড়ি চেপে ক্বচিৎ কখনো কাকিমার বড়লোক দিদি এসে থাকে। খুব কমই আসে। কাকিমাই হামেশা তার কাছে গিয়ে ছোট বোনের কর্তব্য পালন করে।

এটা সেই মহিমার গাড়িই হবে।

—ও সুশান্তদা, একবার ওপরের দিকে তাকাও না, সেতারের ভারে নুয়ে পড়লে যে একেবারে।

কাজল। সুশান্ত মুখ তুলে দেখে দোতলার বারান্দায় রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে কাজলের পাশে দাঁড়িয়ে আর একটি মেয়ে। কাজলের বয়সীই হবে, তবে ওর থেকে আর একটু চকচকে মনে হল মেয়েটিকে।

ঠিক চিনল না কে। কাজল ফাজিলের মত হাসছে দাঁত বার করে। পরক্ষণে ওদের পাশে কাকিমার হাসিমুখ দেখা গেল। বেশ হৃষ্টকণ্ঠে ডাক দিল, ওপরে চলে আয়, বাজনাটা নিয়ে আয়—

কোন কিছুর আভাসমাত্র না পেয়েও সুশান্তর মাথায় দ্রুত একটা চিন্তা খেলে গেল। কাকিমার হঠাৎ এই পরিবর্তন রীতিমত অস্বস্তিকর।

সেতার হাতে করেই ওপরে উঠতে হল। আদেশ অমান্য করলে হঠাৎ আবার কার সামনে স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে কাকিমার, ঠিক নেই।

দোতলার ঘরে ঢুকতে হাসিমুখে কাকিমাই আবার আপ্যায়ন করল।—আয়। এখানে প্রণাম কর, আমার দিদি।

মাদুর-বিছানো মেঝেতে কাকিমার দিদি বসে। কম হলেও সুশান্ত তাকে আগে দেখেছে। কিন্তু আলাপ হবার মত মর্যাদা কখনো লাভ হয়নি। দিদিটি মস্ত বড়লোক জানে, কিন্তু চেহারায় বড়লোকের ছাপ নেই। এত শীর্ণ যে হাড়ে-চামড়ায় একাকার।

সেতার সামলে সুশান্ত কোনরকমে প্রণাম সারল। মহিলা বেশ মনোযোগ সহকারেই নিরীক্ষণ করছে তাকে।

কাকিমা আবার বলল, তুই আর চিনবি কি করে, সমস্ত দিন তো বাউণ্ডুলেগিরি করে বেড়াস, দিদি এলেও তোর সঙ্গে দেখা হয় না। আজ দিদি তোর সঙ্গে দেখা করবে বলেই বসে আছে। সেদিন রেডিওতে তোর বাজনা শুনে দিদি আর অনু খুব প্রশংসা করছিল।

কাকিমার বাজনা-প্রীতির আসল কারণ বোঝা গেল। সুশান্ত চেষ্টা করে হাসল একটু। কিন্তু দিদির শীর্ণ মুখে তেমন কোন উচ্ছ্বাস দেখা গেল না। সে তেমনি নিরীক্ষণমগ্ন।

—বোসো। এবারে মহিলার অস্ফুট কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ছোট মাদুরে তারা দুজনে বসে। সুশান্ত কোথায় যে বসবে ভেবে পেল না।

—দাঁড়িয়ে রইলি কেন, ওই বিছানাতেই বোস্ না। কাকিমার গলায় স্নেহ ঝরল।

সেতার খাটে শুইয়ে সুশান্ত বসল। কাকিমার বিছানায় বসার স্মৃতি স্মরণীয় কালের মধ্যে অনুপস্থিত। কি রকম যেন ঘাবড়ে যাচ্ছে সুশান্ত।

বারান্দার দিক থেকে কাজল আর তার পিছনে সেই মেয়েটি এগিয়ে এল। মেয়েটি কে এবারে সুশান্ত সহজেই অনুমান করতে পারছে। কাকিমার বড়লোক বোনের একমাত্র মেয়ে। বছর তিনেক আগে একবার দেখেছিলও মনে পড়ে। তবে এই মেয়ের প্রসঙ্গে কাজলের অনেক রকম টিপ্পনী শুনেছে। মাসতুতো বোনটিকে কাজল খুব সুনজরে দেখত না। মায়ের অসাক্ষাতে সেটা প্রকাশ পেত। বলত, কত বড়লোকের মেয়ে, অনুদি সেই দেমাকে অস্থির —গরিবের বাড়িতে আসবে কেন—মা যে কেন ঘন ঘন এত যায় সেখানে! তাছাড়া অনুদির সময় কোথায়, তার কত বন্ধু-বান্ধব, সর্বদা কত আমোদ-আহ্লাদের ব্যাপার সেখানে। মায়ের কাছে অনুদি হায়ার-সেকেন্ডারিতে ফেল করে ওর সহপাঠিনী হয়েছে শুনেও খুশি হয়েছিল। কাকিমাকেই বলেছিল, তোমার অত বড়লোক বোনের মেয়ে এ পর্যন্ত মাত্র তো দু'বার ফেল করল, সেটাই ক্রেডিট বলতে হবে।

হায়ার-সেকেন্ডারির বেড়া টপকে এখন কাজলের সঙ্গে বি. এ. পড়ছে কি তার পিছনে পড়ে গেছে, সুশান্ত জানে না।

খুশি মুখে মাসিই বোনঝির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল তার।— অনু, দিদির মেয়ে—এই একটাই মেয়ে। আর ও হল আমার ভাসুরপো সুশান্ত, যার বাজনা শুনে সেদিন তোর অত ভাল লেগে-ছিল।...সেই ম্যাট্রিক থেকে জলপানি পেয়ে পেয়ে এম. এ পাস করেছে, মুখের কথা সরলেই বড় বড় চাকরি সেধে আসে—কিন্তু ছেলের কি সেদিকে মন আছে— দিন-রাত ওই সেতারেই ধ্যান-জ্ঞান।

সুশান্তর ঘেমে ওঠার দাখিল। মাসির মেয়েও প্রায় তার মায়ের

মতই ঠাণ্ডা চোখে দেখে নিল তাকে, তারপর হাত তুলে নমস্কার জানাল।

এর পর মাসি বোনঝিকে কাছে টেনে নিয়ে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে। আর তাদের পাশে মাটিতে বসেই কাজল মিটি-মিটি হাসছে আর তাদের অগোচরে সুশান্তর দিকে চেয়ে চেয়ে এক-একটা ভ্রূকুটি করছে।

না, মাসির প্রশংসার জন্যে নয়, মেয়েটি সুশ্রীই বটে, আর বেশ-বাসে বেশ এক ধরনের সাদাসিধে পারিপাট্য আছে। আড়চোখে দু'একবার দেখতে ইচ্ছে করে বটে। আড়চোখে কারণ, সোজা তাকা-বার উপায় নেই। কারণ ওই মেয়েটিই তেমনি ঠাণ্ডা চোখ মেলে সোজাসুজি চেয়ে আছে তার দিকে।

কাকিমা প্রস্তাব করল, একটু বাজিয়ে শোনা ওদের—

তার দিদির দ্বিতীয় দফা মৃদু গলা শোনা গেল এবার।—এক-বার পরিশ্রম করে এসেছে, এখন থাক্।···তোমার চাকরি করতে ভাল লাগে না বুঝি?

সুশান্তর উভয়-সংকট। কি জবাব দেবে? কিছুদিন আগেও চাকরির চেষ্টা নেই বলে কাকিমার গঞ্জনা কর্ণবিদ্ধ হয়েছে। আবার আজ তারই মান রক্ষার দায়।

জবাব না দিয়ে সুশান্ত শুধু হাসল একটু।

কিন্তু কাকিমার এই বড়লোক বোনটিকে কাকিমার থেকে কম বুদ্ধিমতী মনে হল না সুশান্তর। আবার একটু চেয়ে থেকে বলল, যে বাজার, চাকরিবাকরি সুবিধেমত পাওয়াও দায়।···তা গান-বাজনা নিয়ে আছ তাই বা খারাপ কি। আমি তো সেদিন বিমলাকে বলছিলাম, ভাল ওস্তাদ-টোস্তাদ রেখে শেখে না কেন—টাকা যা লাগে ব্যবস্থা করা যাবে।

কাকিমার সেদিনের প্রস্তাবের তাৎপর্য স্পষ্ট হল। হল বলেই সুশান্তর মুখখানা প্রায় অসহায়, আর নির্বোধ দৃষ্টি প্রায় বিস্ফারিত।

কাকিমা তাড়াতাড়ি সামলে দিল, ও দিদি, তুমি জান না বুঝি, ও তো মস্ত একজনের কাছেই শিখছে—কি নাম যেন রে ভদ্রলোকের?

চিঁচিঁ শব্দে সুশান্ত গুরু-নাম স্মরণ করল।

আরো দু-পাঁচ কথার পর বিদায় মিলল। সেতার হাতে বিনম্র চরণে সুশান্ত ঘর ছেড়ে বাঁচল। আসার সময়েও মনে হল কাজলের মাসি আর মাসতুতো বোনের ঠাণ্ডা দু'জোড়া চোখ তার পিঠে বিঁধে আছে।

বাইরে গাড়িটা চলে যাওয়ার শব্দ ভাল করে মিলোবার আগেই কাজল এসে হাসিমুখে তার ঘরে হানা দিল।

—কি গো, স্বপ্নে সৌধ নির্মাণম্ ?

সুশান্ত গম্ভীর।—কি ব্যাপার বল্ তো ?

—আ-হা, শুধু দুধ-ভাত খাওয়া মানুষ।—ভুরু কুঁচকালো। ব্যাপার কিছু বুঝছে না, কেমন ?

একটু অপেক্ষা করেই সুশান্ত রেগেই উঠল যেন, বলবি তো বল্, নইলে বেরো ঘর থেকে।

— ও ব্বা-বা, এখনই এই মেজাজ! পরে হাসি চেপে মুখখানা নির্লিপ্ত করে জবাব দিল, তারা ছেলে দেখে গেল, আর তুমি মেয়ে দেখলে এই ব্যাপার, বুঝলে ?

কাজল হাসতে লাগল। হাসিটা খুব যে খোলামেলা প্রাঞ্জল এমনও মনে হল না। হাসি থামিয়ে কাজল সরাসরি কাজের কথায় এল। তা কি রকম দেখলে বল, অনুদিকে পছন্দ হল ?

ওই মেয়েকে নাকচ করে দেবার মত সুশান্তব পছন্দের মান অত উর্ধ্বে ওঠেনি। কিন্তু আপাতত যে অনুভূতি তার ভিতরটা জুড়ে আছে তার সাদা নাম ভয় আর অস্বস্তি। জবাব দিতে হল না, প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে কাজলের আবার হাসি। ঈষৎ ঠেসের সুরে নিজেই আবার বলল, অবশ্য তোমার পছন্দে অপছন্দে কিছু যায় আসে না —অনুদির তোমাকে পছন্দ হবে কি হবে না সেটাই আসল সমস্যা ছিল। তা সে সমস্যা মিটেছে ধরে নিতে পার।

ভয় বা অস্বস্তি সত্ত্বেও রক্তমাংসের মানুষের একটু কৌতূহল স্বাভাবিক। সুশান্ত জিজ্ঞাসা করল, কি রকম ?

—তার পছন্দ হয়েছে। নিশ্চিন্ত ?

—তোকে বলেছে ?

কাজল ফোঁস করে উঠল, বসে সারাক্ষণ তোমার রূপ গিলছিল দেখনি? গাড়িতে বসেও এখন এই রূপ ধ্যান করছে বোধহয়।

কাজল যে সুরেই বলুক, সুশান্তর শুনতে খুব খারাপ লাগেনি। বাইরের কোন মেয়ের চোখ দিয়ে নিজেকে যাচাই করার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। কাকিমার যে গদ্যাকারের সংসারে বাস তার, তাতে এই চিন্তায় গা ভাসাবার ফুরসৎ মেলেনি। য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে দু'চারটে মেয়ের চোখ যে তার দিকে ছিল না এমন নয়। কিন্তু বেশি হৃদ্যতা হলে পাছে বাড়িতে এসে কেউ কাকিমার সামনে পড়ে যায়, এই ভয়ে সমস্ত সম্ভাবনা অঙ্কুরে বিনাশ করেছে।

কিন্তু কিছু শুনে ভাল লাগা আর সেই ভাল লাগার বাস্তবে ঝাঁপ দেওয়ার মধ্যে অনেক ফারাক। সুশান্তর ভিতর থেকে ভয় আর অস্বস্তির অনুভূতিটাই প্রবল আপাতত।

রসিয়ে রসিয়ে কাজল আরো জানাল, মাসিরও তোমাকে বেশ পছন্দ হয়েছে মনে হল। তোমাকে একবার তাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে বলে গেল—মেসোমশাই দেখবে।

সুশান্ত গম্ভীর।—কাকিমাকে এ-সব পাগলামি করতে বারণ করে দে।

কাজল ঠিক এই উক্তি আশা করেনি হয়তো। এটা তার মনের কথা বলে বিশ্বাসও হয়তো করল না। যাচাইয়ের চেষ্টা।—সত্যি? গিয়ে বলি?

--হ্যাঁ।

কাজল তির্যক চোখে চুপচাপ একটু লক্ষ্য করেছে তাকে।—কেন, অনুদিকে তোমার পছন্দ নয়?

—আমার পছন্দ-অপছন্দর কোন কথা ওঠে না, তারা এখানে মেয়ে দেবে কেন?

কাজল চিবিয়ে চিবিয়ে জবাব দিল, তোমার চেহারাপত্র ভাল, এম. এ. পাস, সংসারের ঝামেলা নেই—বিয়ের বাজারে তুমি মন্দ পাত্র কি! আর রোজগারপত্রের কথা যদি বল, সে ভাবনা তাদের—টাকা তাদের অনেক আছে, সে-সবই অনুদির হবে।

...অনেক টাকা আছে, বাড়ি আছে, জমি আছে, আর সে-সবই

অণিমার হবে অর্থাৎ সে ঐশ্বর্য কালে-দিনে এই বাড়িতে আসবে। এ বিয়েতে কাকিমার এত আগ্রহের কারণ শুধু এই। সেটা বুঝতে সুশান্তর একটুও সময় লাগেনি। আর কাজলের আগ্রহও যে দিনকে-দিন বাড়ছে, তারও বোধহয় এই একই কারণ। মা-মেয়েতে পরামর্শ চলে। সাক্ষাৎ কমলার পদার্পণ ঘটলে সকলেরই লাভ, এই ভাবে হয়তো।

সেদিন কাজল হাসিমুখে ঠাট্টা করছিল, মাসিমা তোমার হাতে মেয়ে গছাতে চাইবে না কেন, মা তোমার সম্পর্কে নিত্য-নতুন যেসব গুণের ফিরিস্তি দিয়ে চলেছে তাতে যে কোন মেয়ের মায়ের মনে হবে তুমি জ্বলজ্বলে হীরের টুকরো একখানা—অতএব তোমাকে ছোঁ মেরে তুলে নিল বলে।

সেই লক্ষণ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিল সুশান্ত। কাকিমা যে বেগে এগিয়ে চলেছে তাতে তার অস্বস্তি আর দ্বিধা ভেসে যাবার দাখিল। মেয়ের মুখে তার আপত্তির কথা শুনে রাগে জ্বলতে জ্বলতে কাকিমা এসে তাকে শাসিয়েছে, এ ব্যাপারে একটি কথা বলবি তো এ জীবনে আর কোন সম্পর্ক থাকবে না বলে দিলাম—এ বিয়ে হয় যদি তোর অনেক জন্মের পুণ্য জানিস।

কাকিমা শাসাতে এসেছিল, তার আপত্তির কারণ জানতে নয়। তার মতামত শোনার জন্য আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করেনি।

ওদিকে কাজলের মাসিমার সকন্যা এ-বাড়ি আসা বেড়েছে। এলে সর্বদাই ওপরে ডাক পড়ে না সুশান্তর। অণিমাকে সঙ্গে করে কাজল তার ঘরে হানা দেয়। ভাবী সম্পর্কটা যে নিশ্চিত এক-রকম, স্থূল ঠাট্টা-ঠিশারায় তাই বোঝাতে চেষ্টা করে। সুশান্ত কখনো বিরক্ত হয়, কখনো হাসে। কিন্তু অণিমাকে ঠিক আর পাঁচটা মেয়ের মত মনে হয় না তার। একটু বেশি চাপা, বেশি গম্ভীর। সেই গোড়ার দিনের মতই মুখের দিকে চেয়ে থাকে, পর্যবেক্ষণ করে। সুশান্তর ধারণা, তার মত সাদামাটা একজনের সঙ্গে জীবনের এত বড় একটা যোগ সম্পন্ন করে ফেলাটা আশাপ্রদ হবে কিনা তাই বুঝতে চেষ্টা করে হয়তো। মেয়েটা লেখাপড়ায় ভাল না সুশান্ত আগেই শুনেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটুও নির্বোধ

মনে হয়নি তাকে।

…সুশান্তর অস্বস্তি বেড়েই চলেছে। কারণ, ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক—তার ভিতরে রমণীর ছায়া একটা পড়েইছে। আর সে ছায়াটা সঙ্গোপনে নড়াচড়া করে যখন, খুব খারাপও লাগে না। তবু অজ্ঞাত আশঙ্কার মত কি যেন অস্বস্তি একটা।

কাকিমা সেদিন জোর করেই তাকে বোনের বাড়ি ধরে নিয়ে গেল। আশ্চর্য, অণিমা সেদিন একবারও ধারে-কাছে এল না। এমন কি কাজল চেণ্টা করেও তাকে ধরে আনতে পারল না। শুনল, অনুদির শরীরটা ভাল না, মাথা ধরেছে। ওদিকে বাড়ির রুগ্ন কর্তাটি অর্থাৎ অণিমার বাবা তাকে ডেকে সাদরে এবং সাগ্রহে কথা-বার্তা কইল। কবে পাস করেছে, কি নিয়ে পাস করেছে, কি করছে, কি করার ইচ্ছে, ইত্যাদি। সে-সব কথার জবাব বেশির ভাগ কাকিমাই দিয়েছে। তার সব জবাবের সারমর্ম, এই যুগের ছেলে হলেও ভাসুরপোটি তার এমনই রাজ্যছাড়া ভাল যে সর্ব ব্যাপারে তার কাকিমার ওপর ভরসা। অত ভাল যে পাসটাসগুলো করেছে তাও কাকিমার জন্যেই হয়েছে ভাবে ছেলেটা, আর ভবিষ্যতে কি করবে না করবে সে ব্যাপারেও কাকিমার ওপরেই নির্ভর করে বসে আছে।

সুশান্ত হাঁ করে ছাব্বিশ বছরের দেখা কাকিমাটিকে নতুন করে দেখেছে। কোন্ দেখাটা যে ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারছে না। ভদ্রলোককে প্রীত এবং নিশ্চিন্ত মনে হয়েছে। তার মেয়ের ভাগ্য ভেবে মনে মনে হয়তো আশীর্বাদই করেছে কাকিমাকে।

সেদিন ভাবী শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার সেরে বাড়ি ফিরেই সুশান্ত কাজলকে জিজ্ঞাসা করল, তোর অনুদি এখনো হায়ার-সেকেণ্ডারিই পড়ছে, না সে-পাট চুকিয়ে দিয়েছে?

কাজল সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাকালো—তোমার সাহস তো কম নয়! পরে হেসেই জবাব দিল, হায়ার-সেকেণ্ডারি তো আমার সঙ্গেই পাস করেছিল, এবার বি· এ দেবার কথা—হঠাৎ অসুখে পড়ে গিয়ে বছরখানেক হল পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

—কি অসুখ হল যে পড়া একেবারে ছেড়েই দিতে হল?

মুহূর্তের জন্য কাজল থমকালো, সুশান্তর মনে হল বে-ফাঁস কিছু বলে ফেলতেও পারত। না বলে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে জবাব দিল, বড়লোকের মেয়ে, পড়া ছাড়ার মত অসুখ একটা হলেই হল—বি.এ. পাস করে হবে কি, তোমার বউ চাকরি করতে যাবে ?

অবিশ্বাসের কিছু নেই, কারণ বয়সে অণিমা কাজলের থেকেও দু'বছরের বড় শুনেছে, পড়াশুনা ভাল না লাগতেও পারে, বা বি. এ পাস করতে না পারার ভাবনাটাও অসুখ বলে পরিগণিত হয়ে থাকতে পারে।

একটু থেমে সুশান্ত আবার জিজ্ঞাসা করল, আজ একবারও এল না কেন, সত্যি শরীর খারাপ ?

খানিক চুপ করে থেকে কাজল ফিক করে হেসে উঠল। বলল, সামান্য খারাপ হতেও পারে, মাসি বলছিল সকাল থেকেই অনুদির মাথা ধরে আছে—কিন্তু তুমি একেবারে নীরেট, বিয়ে করার শখ ষোল আনা, অথচ একটু বুদ্ধি যদি থাকত। অনুদি নিশ্চয় আশা করেছিল শরীর খারাপ শুনলে তুমি নিরিবিলিতে নিজে গিয়ে একটু খোঁজখবর নেবে—মাথা ধরা সারাবার ব্যবস্থা করবে।

—আমি খবর নিতে গেলে মাথা ধরা সারত না বাড়ত ? দু'বাড়ির অবস্থার তারতম্যজনিত অস্বস্তিতে সুশান্ত নিজেই ভুগছে তখনো। জিজ্ঞাসা করল, আমি যাব সেই ভয়েই মাথা ধরেছিল কিনা সেই খবর নিয়েছিস, নাকি নিজেদের আনন্দেই লাফাচ্ছিস সব ?

– হ্যাঁ ?

কাজলের চোখের কোণে খুশির মাত্রা বেশি কি চাপা ক্ষোভের, সঠিক বোঝা গেল না। ঠোঁটের ডগায় তির্যক হাসি। জবাবও বক্রাকারের শোনাল।—পছন্দ তোমাকে দেখার আগেই শুরু হয়েছিল, এখন পছন্দের বন্যায় অনুদি হাবুডুবু খাচ্ছে। আমারই মাঝখান থেকে কাহিল অবস্থা, আমাকে নেবার জন্যে রোজ একদফা করে গাড়ি পাঠাচ্ছে। আর নানা কায়দায় তোমার সম্পর্কে নাড়ী-নক্ষত্র খবর নিচ্ছে। আর তোমার সেতারের প্রশংসা তো মুখে লেগেই আছে। এর ওপর সেদিন বলছিল, তোদের টেলিফোন থাকলে ভাল হত—বেশ গল্প করা যেত। কাজল মুখ টিপে হাসছে

তার দিকে চেয়ে।—এবারে নিশ্চিন্ত?

কাজলের কোন্ কথাটা সত্যি কোন্‌টা নয়, তাতেও সংশয়। কারণ ও হাসছে বটে, কিন্তু ওই হাসির আড়ালে যেন ধারালো কিছু আছে। একটু থেমে সুশান্ত আবার জিজ্ঞাসা করল, রেডিওতে একদিন বাজনা শুনেই এত পছন্দ হয়ে গেল?

কাজল বিরক্ত যেন।—কি বুদ্ধি, কি বুদ্ধি! নিজেকে একজন মস্ত বাজিয়ে ভাব নাকি তুমি? অনুদি আর মাসি ওই বাজনা শোনার অনেক আগে থেকেই তোমাকে নিয়ে মায়ের বাজনা শুরু হয়েছিল। অনুদির কান-মন আগে থাকতে জুড়িয়ে ছিল বলেই রেডিওর এক-দিনের বাজনাই বিষম ভাল লেগেছে, বুঝলে?

বুঝেও কেন যেন তেমন পরিতুষ্ট হতে পারল না সুশান্ত। কাকিমা এমন প্রবলভাবে কলকাঠি নেড়ে চলেছে যার জন্যে তলায়-তলায় কি যেন অগোচরের ভয়। অথচ সম্ভাবনাটা এখন আর উড়িয়ে দিতেও পারে না। কাকিমা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। না এগোলেও তাকে ঠেকাতে পারত কিনা সন্দেহ। নিরিবিলি অবকাশে বা সেতারে সুর বিস্তারের তন্ময়তার ফাঁকে অণিমার মুখখানা উঁকি ঝুঁকি দেয় যখন, ভাল লাগে। এই ভাল-লাগাটুকুই আবার কোন শিরা-উপশিরা ধরে যেন অস্তিত্বের আনাচকানাচে ছড়িয়ে পড়ে।

সেদিন বিকেলে বাড়ির দোরে সেই চেনা গাড়ি দেখে কিছু একটা চিন্তা খেলে গেল সুশান্তর মাথায়। নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় সেতার রেখে পায়চারি করল বারকয়েক। তারপর বসে সেতারটা তুলে নিয়ে টুং-টাং শব্দ করতে লাগল। দ্রুত অথচ মৃদু ঝঙ্কারও তুলল এক-একবার।

একটু বাদেই দোরগোড়ায় কাজলের প্রত্যাশিত কপট-গম্ভীর মুখ দেখা গেল।—অত ডাকাডাকির কি আছে, ওপরে উঠে এলেই তো পার! তোমাকে কে আর আটকাচ্ছে?

ডাকাডাকি যে সুশান্ত অস্বীকার করল না। জবাব দিল, ওপরে উঠে কাজ নেই, নিচে ডাক।

এ-রকম সরাসরি আহ্বান এই প্রথম। কাজল ঘটা করে নিরীক্ষণ করল একটু। প্রেমে-পড়া মানুষের ডানা গজানো দেখছে যেন।—

মায়ের কাছে বসে আছে, কি বলব, তুমি ডাকছ?

সুশান্ত নির্লিপ্ত।—তাই বল্‌!

কাজল চলে গেল আর সত্যিই একটু বাদে অণিমাকে নিয়ে ফিরল। সেতারটা একপাশে সরিয়ে রেখে সুশান্ত হাসিমুখে তাকাল। কিন্তু জবাবে অণিমার মুখে প্রত্যাশিত সরম বা সংকোচ দেখল না। সেই প্রথম দিনের মতই যেন। সরাসরি মুখের দিকে চেয়ে আছে, দেখছে, কিছু যেন বুঝতে চাইছে।

কাজল তাকে সামনের দিকে ঠেলে দিল, বোস্‌ না কাছে গিয়ে, অত লজ্জা কিসের! সুশান্তর দিকে তাকাল। চোখে-মুখে কপট বিনয়।—আমি যাব না থাকব?

ফাজলামোই করতে গেছল, কিন্তু জবাব যা পেল তাতে থমকে দাঁড়াতে হল। সুশান্ত বলল, গেলেই ভাল হয়, পাঁচ-সাত মিনিট বাদে আসিস, এঁর সঙ্গে একটু কথা আছে আমার।

কাজল অবাক হবে জানা কথাই, কিন্তু সেই সঙ্গে অণিমাও হঠাৎ সচকিত কেন বোঝা গেল না। মুহূর্তের জন্য তার চোখে-মুখে উদ্বেগের ছায়ার মত দেখল কিনা সুশান্তর ঠাওর হল না। বড়-লোক মাসতুতো বোনটিব সম্পর্কে আগে কখনো-সখনো কাজল যা বলত, তাতে তাকে এই গোছেব সংকোচ-বিনম্র কখনো মনে হয়নি।

ওদিকে যেতে বলে কাজলকেও যেন একটু দ্বিধার মধ্যে ফেলা হল। তারপরেই সুশান্তর দিকে চোখ পাকালো।—বেহায়া তো কম নও দেখি!

আচ্ছা ঠিক পাঁচ মিনিট, পাঁচ মিনিটের থেকে পাঁচ সেকেণ্ডও বেশি নয়।

চলে গেল। অণিমা দাঁড়িয়ে। সুশান্তর দিকেই চেয়ে আছে।

খাট ছেড়ে সুশান্ত উঠে দাঁড়াল।—বোসো।

অণিমা বসল। বসে তেমনি চেয়ে রইল।

সুশান্ত হাসতে চেষ্টা করল একটু।—তুমি বললাম···আপত্তি হবে না তো?

অণিমা মাথা নাড়াল। হবে না।

রমণীর দৃষ্টি এভাবে সোজাসুজি তার মুখের ওপর পড়ে না

থাকলে হয়তো এই নীরব অনুভূতি সরমানুরাগে সিক্ত বলে ধরে নেওয়া যেত। কিন্তু ঠিক সে-রকমও লাগছে না সুশান্তর।

দ্বিধা ঝেড়ে ফেলেই জিজ্ঞাসা করল, আমাদের মধ্যে কাকিমা একটা বড় কিছু সম্পর্ক ঘটাবার তোড়জোড় করছেন, জান বোধহয়?

অণিমা আবার মাথা নাড়ল, জানে।

সুশান্ত বলল, এই জন্যেই দুটো কথা কয়ে নেবার ইচ্ছে।··· এরা বেশি গণ্ডগোল পাকাবার আগে তোমার নিজের মতামত কি জানা দরকার।

অণিমা চুপ একটু। চোখের দুটো তারা তার মুখের ওপর যেন আরো একটু স্থির।—আমার অমত নেই, আপনার আপত্তি আছে শুনেছিলাম।

সুশান্ত কি নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস করবে? অবাক হবে কি খুশি হবে জানে না।—আমার আপত্তি! কে বলল?

— মাসিমা। কাজল—

ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ বুঝে নিতে একটুও বেগ পেতে হয়নি। এ-বাড়ির ছেলের যোগ্য মর্যাদা রক্ষার্থেই কাকিমা আর কাজল ঢাক পিটিয়েছে হয়তো যে সে বিয়ের কথায় কান পাততে চায় না। তারাই ধরে-পড়ে রাজী করাচ্ছে—

···কিন্তু এই মেয়ে কি কারণেই তাকে অমন চুপচাপ পর্যবেক্ষণ করে! সত্যিই ভাল লাগছে সুশান্তর, মৃদু হেসে জবাব দিল, আপত্তি ঠিক নয়, আমি কিছু করি না···রোজগারপাতিও নেই কিছু ···এ খবর জান?

—জানি। আপত্তির আর কোন কারণ নেই তো?

এবারে সুশান্তই হতচকিত একটু। এ-রকম স্পষ্ট প্রশ্ন অপ্রত্যাশিত। অণিমা হাসছে না, তার চোখে-মুখে লজ্জা-নম্র পেলবতাও দেখছে না কিছু। বরং ধার-ধার যেন একটু। তবু এই মুখখানাই হঠাৎ ভারী ভাল লাগল তার। বিয়েতে আপত্তি জেনে কোন মেয়ের যদি এই অভিব্যক্তি হয়, পুরুষমাত্রেরই সেটা খুশির কারণ। হেসেই জবাব দিল, না, আপত্তির আর কোন কারণ নেই।

কিন্তু এর পরেও অণিমার খুব বিশ্বাস হল না যেন। তেমনি চেয়ে রইল।

তিন

খুব ঘটা করেই বিয়ে হয়ে গেল।

সুশান্ত নিজের মাথার চুল নিজে ছেঁড়ে। নিজেকে নির্বোধ বলে গালাগাল দেয়। লোভী বলে অভিপাশ দেয়। তার মত গরীব বেকার ছেলের সঙ্গে বড়লোকের একটিমাত্র মেয়ের এত ঘটা করে বিয়ে হয় কেন– সেটা বোঝার পর নিষ্ফল আক্রোশে বুকের ভেতরটা কেবল জ্বলে জ্বলে জ্বলে।

...বিয়ের প্রায় মাস দুই পর থেকে অণিমার আচরণে নানারকম অসংগতি ধরা পড়তে লাগল। সুশান্তর চোখ থাকলে আগেও ধরা পড়তে পারত। আগেও অসংগতি অনেক সময়েই চোখে পড়েছে। কিন্তু দুটি জীবনের অতনু-নিভৃতের মাদকতার ঘোর লেগেছিল তার একার চোখে। যে আকর্ষণে অণিমা প্রথম-প্রথম সর্বদা টেনে রাখত তাকে, আগলে রাখতে চাইত, সেটা প্রেমের খরস্রোত বলেই মনে হত তার। এক বাসনা-তপ্ত নারী যেন তার প্রিয় দয়িতকে ভোগের আরতি দিয়ে ঘিরে রেখেছে, বেঁধে রেখেছে। বিয়ের ঠিক আগে আগে খুব সংগোপনে বিবাহ-তত্ত্বের দুই-একটা বই নাড়াচাড়া করেছিল সুশান্ত। রমণী-বিশেষে বাসনার দুরন্ত আবেগের অনেক রকম নজির দেখেছে তাতে। অতএব নব-বধূর আচরণ অস্বাভাবিক খুব মনে হয়নি। এর ওপর সুশান্ত নিজেই তো অনেকখানি আচ্ছন্ন হয়েছিল।

অতটা আচ্ছন্ন না হলে হয়তো অণিমার চালচলন, কথাবার্তা, বিশেষ করে তার বেশবাসের পরিমিতি-প্রীতির মধ্যেও কিছুটা অসংগতি লক্ষ্য করতে পারত। কিন্তু তখন তার নিজের মধ্যে যে লোলুপ পশুটা ভোগের স্বাদ জেনেছে, এইসব ছোটখাটো অসংগতি উল্টে তাকে উত্তেজনার খোরাক জুগিয়েছে আরো।

আচমকা হোঁচট খেতে হল একদিন।

মাস দুই বাদে অণিমার হাসিখুশি চাউনি কথাবার্তা বড় দ্রুত বদলে যেতে লাগল। কাছে গেলে বিরক্ত হয়, গায়ে হাত ছোঁয়ালে ফোঁস করে ওঠে। সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে তার দিকে। তাকে এড়াতে চায়। দূরে সরে থাকতে চায়। কিসের যেন ভয় তার, কি এক অজ্ঞাত ত্রাস। ভয় আর ত্রাস থেকে ক্রোধ। রাগে অণিমার চোখ-মুখ সাদা হয়ে যায় এক একসময়।

সুশান্ত হতভম্ব, বিমূঢ়।

ক'দিন বাদেই জানা গেল অণিমা অন্তঃসত্ত্বা।

সুশান্ত দ্বিতীয় দফা ধাক্কা খেল যেন। এইজন্যেই অণিমার রাগ ভয় ঘৃণা? ভোগ চায়, সন্তান চায় না?

বুকের তলায় তখনো সন্দেহের ছায়া পড়েনি সুশান্তর, তখনো উদারতার অভাব ঘটেনি। ভেবেছে, হঠাৎ কোন কারণে ভয় পাওয়ার ফলে মনের ওপরে অস্বাভাবিক কিছু একটা চাপ পড়েছে। কাকিমার সঙ্গে পরামর্শ করে অণিমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল। আর, তারপর সেখানে বিচক্ষণ চিকিৎসকের আনাগোনা শুরু হতে যে ক্রূর বাস্তব মুখব্যাদান করে সামনে এগিয়ে এল, সুশান্তর বুকের ভিতরটা হিম একেবারে।

···না, অণিমার মাথার বিকৃতি এই প্রথম নয়। এর আগেও একটানা দেড় বছর এক অস্বাভাবিক মানসিক রাজ্যে বিচরণ করেছে সে। বাপের অঢেল পয়সা, চিকিৎসার ত্রুটি হয়নি। হ্যাঁ, সুশান্তর মনে পড়েছে বটে, মাঝে অনেকদিন কাকিমার মুখে তার বড়লোক বোনের প্রসঙ্গ বা কাজলের মুখে তার চালিয়াত মাসতুতো বোনের কথা শোনেনি। শোনেনি কারণ, এই অঘটনের খবর তারা জানত। আর জানত বলেই গোপন।

···বিয়ের মাত্র বছরখানেক আগে অণিমা সুস্থ হয়ে উঠেছিল। তাও মোটামুটি। তার হাব-ভাব-আচরণ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়েছিল এ কেউ হলফ করে বললেও সুশান্ত বিশ্বাস করবে না। সে তো নিজের চোখেই দেখেছিল স্বাভাবিক হয়নি। তখন বোঝেনি। তখন একবারও মনে হয়নি মুখের ওপর দু'চোখ ফেলে রেখে অমনি

সরাসরি চেয়ে থাকাটা কোন অস্বাভাবিক লক্ষণ। সুশান্ত ভাবত, বড়লোকের মেয়ে যাচাই করে দেখে নিচ্ছে তাকে।···দেখেই নিত বটে, নিজের দ্বন্দ্বের ফয়সালা করার তাগিদে দেখে নিত।

···অণিমা সুস্থ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়-পরিজন-শুভার্থীরা পরামর্শ দিয়েছে, মেয়ের ভাল একটা বিয়ে হয়ে গেলেই রোগ একেবারে নির্মূল হয়ে যাবে, আবার চাগিয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকবে না। এক-আধজন চিকিৎসকও এতে সায় দিয়েছে মনে হয়।

রোগ নির্মূল না হয়ে উল্টে যদি বেড়ে যায় তার ফল কি হবে এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামানো খুব দরকার মনে করেনি। অণিমার বিয়েটা এক্সপেরিমেন্ট—সুশান্ত সরকার তার বলি।

···সুশান্ত সরকার গিনিপিগ।

মাথায় সেই দিন থেকে আগুন জ্বলেছে সুশান্ত সরকারের। তার আভাস একমাত্র কাজলই খানিকটা পেয়েছে, আর কেউ না। কাজলকে একদিন ঘরে ডেকে দরজা বন্ধ করেছিল সুশান্ত। তার দিকে চেয়ে কাজল সেদিন সত্যিই ঘাবড়েছিল। ওকে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে সুশান্ত সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল।—অণিমার এই অসুখ ছিল কাকিমা তো জানতই, তুই জানতিস না ?

কাজল মিনমিন করে জবাব দিয়েছে, ইয়ে···সেরেই তো গেছল, আবার এ-রকম হয়ে পড়বে কে ভেবেছে···ডাক্তারও বলেছিল বিয়ে হলে···

চাপা গলায় সুশান্ত বাধা দিল, ডাক্তার বলেছিল বলে তোরা আমাকেই বেছে নিলি, কেমন ?

কাজল তার মুখের দিকে চেয়ে জবাব দিতে পারেনি। দরজা বন্ধ দেখে অস্বস্তি বোধ করেছে। নিজেই উঠে দরজা খুলে দিয়ে তেমনি শুকনো গলায় সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছে।—অত ঘাবড়াচ্ছ কেন, চিকিৎসা তো হচ্ছে, দেখো না, আবারও সেরে যাবে।

এ বিয়েতে কাকিমার কেন এত আগ্রহ ছিল সেটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট। অনেক টাকা আর বাড়ি-গাড়ি-জমির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ঘরে আসবে। বোনঝির আসা মানেই সমস্ত ঐশ্বর্য একদিন তার হাতের মুঠোয় আসা। এ বিয়ে ঘটানোর জন্য কাকিমার মত

মানুষের উঠে পড়ে লাগাই স্বাভাবিক।

কিন্তু কাজলের কি আশা? তার কি লাভ?

,...আশা আছে বইকি। মায়ের হাতে এত ঐশ্বর্য এলে মেয়েই বা বঞ্চিত হবে কেন? এ বাড়িতে সুখের বাতাস লাগবে। আর এই টাকার জোরে তার সুখের ঘরে যাবার রাস্তাও সুগম হবে।...এ ছাড়া, ওর আগ্রহের পিছনে একটুখানি ঈর্ষা থাকাও বিচিত্র নয়। ওর চপলতার সঙ্গে সুশান্তর মতিগতি অন্যরকম হলে বৈমাত্রেয় খুড়তুতো বোনের সম্পর্কটা তেমন অটুট না-ও থাকতে পারত। কাজলের দিক থেকে প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ের অভাব ছিল না। কিন্তু সে-রকম যে কিছু হবার নয়, তাও এই মেয়ে ভালই বুঝত। তাই ঐশ্বর্যের লোভের সঙ্গে খানিকটা ঈর্ষার যোগও এখন আর অসম্ভব ভাবে না সুশান্ত।

...কাকিমাকে কাজল কিছু বলে থাকবে। কারণ, পরদিন থেকে কাকিমার আচরণে কোনরকম অনুশোচনার আভাস মেলা দূরে থাক, ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে উল্টে এখন এটা-সেটা বলা শুরু হয়েছে। যথা, ভালই তো হয়ে গেছল মেয়েটা, আপনজনেরা বিয়েও দিতে বলেছিল সকলে—সে-রকম হাতে পড়লে আবার এই উপসর্গ এসে জুটবে কেন—ভালই তো থাকার কথা।

অর্থাৎ অযোগ্য হাতে পড়ে মেয়েটার এই দুর্গতি।

কিন্তু তখনো সুশান্তর ভেতরটা সর্ব দিক থেকে মমতাশূন্য হয়ে ওঠেনি একেবারে। বরং রোগটাকে রোগ হিসেবেই মেনে নিতে চেষ্টা করেছে সে। এমন তো কত ঘরেই হয়। নিজের সব কাজ ফেলে, এমন কি বাজনা ফেলে ডাক্তারের কাছে ছোটাছুটি করেছে সে। আর, আশা করেছে, অণিমা আবারও ভাল হয়ে যাবে। অণিমা ভাল না হলে জীবনের সব থেকে মর্মান্তিক অভিশাপ যে এখনো বাকি। ওর অস্তিত্বের সঙ্গে যে অনাগত শিশুর অবস্থান মিশে আছে, তার কি হবে, সে কেমন হবে?

সুশান্ত এক-একদিন পাগলের মতই ডাক্তারকে জেরা করেছে, কি হবে, কেমন হতে পারে। এমন কি দৈব অনুগ্রহের আশায় ঠাকুর-দেবতার পায়ে পর্যন্ত কত ধরনা দিয়েছে, ঠিক নেই।

কিন্তু তারপর…

তারপর ওর মাথার আগুন শুধু নিজেকে গ্রাস করেনি, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই আগুনে পোড়াতে চেয়েছে সুশান্ত সরকার।

…অণিমা কেন এমন এক বিকৃতির মধ্যে বন্দী, তাও গোপন থাকেনি। প্রকাশ অণিমা নিজেই করেছে।

তার আগে প্রতি দিনের থেকে প্রতি দিন সুশান্তর প্রতি ওর রাগ আর অসহিষ্ণুতা বেড়েই চলেছিল। দুনিয়ায় ওর সব থেকে বড় শত্রু যেন সে-ই। তাকে দেখামাত্র পাগলামি পাঁচগুণ বেড়ে যেত। চিৎকার চেঁচামেচি করত, অকথ্য গালাগাল করে ঘর থেকে বার করে দিতে চাইত। এমন কি হাতের কাছে কিছু পেলে তাই নিয়ে তেড়ে আসত। আবার কোন সময় পালাতে চেষ্টা করে ঘরের একেবারে কোণে দাঁড়িয়ে দুটো জ্বলন্ত চোখে তাকে ভস্ম করতে চাইত। সত্তা-নিংড়োনো ঘৃণা আর বিদ্বেষ উপছে পড়ত ওই চোখে।

…সেদিনও অমনি ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠেছিল, যাও, যাও এখান থেকে, বেরিয়ে যাও বলছি। তুমি কেন আস এখানে, কি চাও, আমি বুঝি না—কেমন?

সুশান্ত হাসিমুখেই বোঝাতে চেষ্টা করেছিল, বলেছিল, তোমার ভাল ছাড়া আমি আর কি চাইতে পারি বল?

—ভাল! ভাল চাও তুমি! আমার ভাল চাও! আরো হিংস্র আরো বীভৎস বিকৃত হয়ে উঠল অণিমার মুখ।—প্রকাশ দত্তও অমনি সুন্দর করে হাসত, হেসে হেসে বলত ভাল চায়, ভাল হবে—হেসে হেসে বলত কিচ্ছু ভয় নেই, সামান্য ব্যাপার। ভুলিয়ে-ভালিয়ে পেটে যেটা এসেছিল সেটাকে নষ্ট করে ছাড়ল—আর আমাকে একেবারে আধমরা করে তবে মুক্তি দিল—উঃ, কি যন্ত্রণা! কি যন্ত্রণা! সেই অব্যক্ত যন্ত্রণার স্মৃতি সামলে অণিমা আবার ফুঁসে উঠল।—ফের এই মতলব নিয়ে তুমি এসেছ—এবার এটাকেও নষ্ট করবে, আমাকেও একেবারে মারবে, কেমন? নির্লজ্জ পশু কোথাকারের, ভাল চাও তুমি! বেরোও বেরোও বেরোও বেরোও বলছি এক্ষুনি!

সুশান্তর পায়ের নিচের মাটি কি বড় বেশি কেঁপেছিল সেদিন?

ভূমিকম্প হয়ে গেল ? প্রলয় শুরু হয়েছিল কোথাও ?

সেদিন সুশান্ত সরকারের সব আশা মরেছিল। সব আকাঙ্ক্ষা ভস্ম হয়ে গেছল।

নাকি সেই মৃত্যুর গহ্বর থেকে, আকাঙ্ক্ষার ভস্ম থেকে, আর কোন সংকল্প ভূমিষ্ঠ হয়েছিল ? সুশান্ত জানে না।

...তবে সেই রাতেই কাজলকে আর একবার ঘরে আটকেছিল সুশান্ত সরকার। জিজ্ঞাসা করেছিল, অণিমা আগেরবারে কেন পাগল হয়েছিল তাও তোদের জানা। কেমন ?

কাজলের সেই রাতের বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখ সুশান্ত ভোলেনি। মুখের ওপর আচমকা কেউ যেন শপাং করে চাবুক মেরেছিল একটা। হাঁস-ফাঁস করে কাজল বলে উঠেছিল, আমি তার কি জানি বারে ! আমরা কি করে জানব !

ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি প্রস্থানের উদ্যোগ করেছেল। কিন্তু সুশান্ত তক্ষুনি যেতে দেয়নি তাকে। বজ্রমুষ্টিতে ওর হাতটা ধরে ফেলে আবার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল তাকে। আর, দু'চোখের অতল থেকে দেখছিল ওকেই। আর বিড়বিড় করে বলেছিল, কেন পাগল হয়েছিল, শুনবি ?

—আমি শুনে কি করব, কি মুশকিল, হাত ছাড়ো না ! কাজল তেজ দেখাতে চেষ্টা করেছে কিন্তু তেজ ফোটেনি।

কোনরকমে হাত ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘর থেকে পালিয়েছে।

সুশান্তর চোখে কাজল কি দেখে এত ভয় পেয়েছিল সেদিন ? যে অপমানের আঘাতকে যে কোন হীন-পর্যায়ের মেয়েও ডরায় প্রথম, পুরুষের চোখে সেই অপমানের অভিলাষ দেখেছিল কাজল ? সুশান্ত জানে না। নিজের চোখ সে আয়নায় দেখেনি।

সেই রাতে কাজল তার মা-কে কি বলেছিল বা কতটা বলেছিল সুশান্ত তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। কাকিমার ব্যবহার তারপর থেকে আরো রুক্ষ আরো কঠিন হয়ে উঠেছিল। সুশান্ত তাতেও নির্লিপ্ত। যখন-তখন কাকিমাকে বলতে শোনা গেছে, নিতান্ত দুরদৃষ্ট বলেই মেয়েটা এ-রকম বেইমানের হাতে পড়েছে, নইলে তার রাণীর হালে থাকার কথা। পাগল মেয়ে, রোগের যাতনায় আর পাগলামির

ঝোঁকে কি বলেছে না বলেছে—সেটা যে বিশ্বাস করে তার মত হীন-নীচ চরিত্রের মানুষ ভূ-ভারতে নেই।

সুশান্তর স্থৈর্যে ফাটল ধরেনি তখনো।

তারপর দিন গেছে, মাস গেছে।

সময়ের অনেক আগেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে অণিমার। মৃত সন্তান। সেই সন্তানের শোকে অণিমা ডাক ছেড়ে আর্তনাদ করেছে। তার ধারণা, এই সন্তানকেও আগেরটার মতই হত্যা করা হয়েছে। ঠিক আগের বছরের মতই তাকে অশেষ ক্লেশ দিয়ে সব শেষ করে দেওয়া হয়েছে। এই কাল্পনিক ক্লেশের যাতনায় অণিমা ডুকরে ডুকরে উঠেছে, তার চোখে প্রকাশ দত্ত আর সুশান্ত সরকার এক হয়ে গেছে।

আবার দিন গেছে, মাস গেছে, বছর ঘুরেছে। একে একে অণিমার বাবা মা দুজনেই চোখ বুজেছে। বিষয়-আশয় কত সহজে কাকিমার হাতের মুঠোয় এসেছে সুশান্ত নিঃশব্দে দেখে গেছে। চোখের ইঙ্গিতেও কোনরকম অভিযোগ প্রকাশ পায়নি কখনো। বরং তার বিরুদ্ধেই কত অভিযোগ পল্লবিত হয়ে উঠেছে ঠিক নেই। পাড়ার মানুষেরাও জানে তার কত দোষ, কত ত্রুটি।

বোবার শত্রু নেই নাকি। কিন্তু কাকিমার ব্যবহারিক অভিধানে সে-কথার অস্তিত্ব নেই।

কাজল বি. এ. পাস করেছে অনেকদিন। কিন্তু বিয়ে এখনো হয়নি। ছেলেমেয়ের বিয়ের পাত্র সম্পর্কে কাকিমার এখন ধারণা বদলেছে। কোনরকম ঝামেলা নেই এমন বড় ঘর চাই। কিন্তু বড় ঘরের দাবির অঙ্ক শুনলে তার মাথা বিগড়ে যায়। সে-বেলায় তার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। মেয়েকে বোঝায় এত যাদের চাই-চাই হাঁক, তেমন ঘরে মেয়ে সুখী হবে না।

অতএব কাজলের হাতে নিশ্চিন্ত অবকাশ। নাটক নভেল মাসিকপত্র উল্টে সকালটা কাটায়। দুপুরে ঘুমোয়। বিকেলে সিনেমা দেখে, থিয়েটার দেখে, নয়তো লোক বেড়াতে যায়। নিঃসঙ্গ অবকাশ-বিনোদনে খুব রুচি নেই তা বলে। বাড়ি থেকে একলাই

বেরোয়। নির্দিষ্ট কোন জায়গা থেকে সঙ্গী জোটে। তার এই সঙ্গীদের মধ্যে ইদানীং একজনকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করছিল সুশান্ত। ছেলেটাকে বেশ ভালই চেনে সে। এ বাড়িতে সেতার বাজনা উপলক্ষ করে সুশান্তর কাছেই তার প্রথম পদার্পণ।

নাম শেখর। বামুনের ছেলে। চ্যাটার্জী। বাড়ির অবস্থা কেমন সুশান্ত সঠিক জানে না। তবু চোখ বুজেই ভাল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ঝকঝকে চেহারা, নিজেই একটা ছোট গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়ায়।

গুরুর বাজনার আসরে সুশান্তর প্রথম আলাপ তার সঙ্গে। না এত বড় বিপর্যয় সত্ত্বেও সুশান্ত বাজনা ছাড়েনি। উল্টে এই এক আশ্রয়ের মধ্যেই নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছে। গুরু আজকাল আগের থেকেও তার বাজনার বেশি তারিফ করছে। দিনকতক ঘোরা-ঘুরি করে বেশ একটা সুশ্রী মেয়েকে গুরুর কাছে সমর্পণ করে গেছে শেখর চ্যাটার্জী। মেয়েটার নাম নন্দিতা। বাজনা শেখার জন্য পাগল নাকি। মোটামুটি যেটুকু শিখেছে, হাত মিষ্টি বলে মনে হয়েছিল সুশান্তর।

শেখর চাটুজ্যেকে চৌখস ছেলেই বলতে হবে। সেতারের গুরুটির সঙ্গে সুশান্তর আত্মীয়-সুলভ সম্পর্ক দেখে বাড়ি বয়ে তাকেই এসে ধরেছিল, ব্যবস্থা করে দিতে হবে—টাকা যা লাগবে সে-ই দেবে। বলেছে, নন্দিতা দূর সম্পর্কের আত্মীয়া তার, কিন্তু একেবারে নিজের ছোট বোনের মত।···ভারী দুঃখের জীবন মেয়েটার, বিয়ের এক বছরের মধ্যেই তার মিলিটারী স্বামী নিখোঁজ। কাশ্মীর বর্ডারের দিকে ছিল, শত্রুরা মেরেটেরে দিয়ে বডি লোপাট করে ফেলেছে হয়তো। ডেথ্-এর অফিসিয়াল কন্‌ফারমেশন আসেনি —তারা লিখেছে 'মিসিং, বাট্ সাসপেকটেড্ ডেড্।' এ খবর এসেছে মাত্র এক বছর, শাস্ত্রমতে আরো এগারোটি বছর কাটলে সিঁদুর মুছে বিধবা হবে।

সুশান্ত গোড়ায় পাত্তা দেয়নি তাকে। কিন্তু এ খবর শোনার পর কথা দিয়েছিল চেষ্টা করবে। গুরু অনুরোধ রক্ষা করেছে বটে, কিন্তু উল্টে ফ্যাসাদে ফেলেছে সুশান্তকেই। শেখর চাটুজ্যেকে

বলেছে, ঠিক আছে, আপাতত ওই সুশান্তই শেখাক, পরে দেখা যাবে।

শেখর চাটুজ্যে আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল। গুরুর ওখানে বসেই নন্দিতার সেতার শেখার ব্যবস্থা হয়েছে। সুশান্ত ওর বাড়ি গিয়ে শেখাতেও রাজী হয়নি, নিজের বাড়িতেও না।

কিন্তু সেতারের ওপর সত্যিকারের টান নন্দিতার বেশি কি শেখর চাটুজ্যের, সেটা গোড়ায় গোড়ায় বোঝা যায়নি। শেখর বাড়ি এসে হানা দিত প্রায়ই। বলত, কিছু ভাল লাগছিল না দাদা, একটু কিছু শোনার লোভে চলে এলাম।

সুশান্ত কখনো-সখনো বাজাত। সে তন্ময় হয়ে শুনত। ওদিকে আলাপীও বটে। নিজেই কাজলের সঙ্গে এমন কি কাকিমার সঙ্গেও আলাপ করে নিয়েছে। গাড়িওলা চকচকে ছেলে দেখে কাকিমার নিজেরও একটু আগ্রহ দেখা গেছল। বামুন শুনে আবার কিছুটা নির্লিপ্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শেখর কাকিমা বলে হাঁক দিয়ে আর চেঁচামেচি করে চা খেতে চেয়ে সেটুকু কাটিয়েছে।

এতে বরং কাকিমার আরো বেশি বিরূপ হবার কথা, কারণ যখন-তখন চা খেতে চাওয়া মানেই খরচ। কিন্তু শেখর চাটুজ্যেও শুধু হাতে কমই আসত। চায়ের খরচের লোকসান সে দ্বিগুণ পুষিয়ে দিত। কলকাতার বাইরে তার বাগানের তরি-তরকারি বোঝাই গাড়ি বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালে খুশি না হয়ে পারা যায় কি করে? আবার থিয়েটারের পাসও যে এত সহজে মেলে সেটা শেখরের সঙ্গে আলাপ হবার আগে কাকিমার ধারণাও ছিল না। তাছাড়া, আপনার জনের মত কারো গাড়ি একটা হাতে থাকলে তাও অনেক সময়েই কাজে লাগে। অণিমার মা চোখ বোজার কিছুদিনের মধ্যেই তাদের পুরনো গাড়িটা বেচে দিয়ে এবং সে টাকা ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে তবে কাকিমা নিশ্চিন্ত হয়েছে। কিন্তু তা বলে কি গাড়ি একটা মাঝে-সাঝে দরকার হয় না?

গত ন'দশমাসের মধ্যে সপ্তাহে অন্তত দু'তিনদিন বাড়ি ফিরে শেখরকে তার প্রতীক্ষায় বসে থাকতে দেখেছে সুশান্ত। প্রতীক্ষার ক্লান্তি কিছু চোখে পড়েনি, কারণ কাজলকে খুশিমুখে বসে আড্ডা

দিতে দেখা গেছে তার সঙ্গে। চা-ও কাজলের অনুগ্রহে একাধিকবারই জুটেছে।

তারপর হঠাৎই একদিন শেখর চলে যাবার পর কাকিমার চাপা গজরানি সুশান্তর কানে এসেছে। অসন্তোষের কারণ ঠিক না জানলেও কিছুটা অনুমান করা গেছে। এরপর থেকেই কাজলও গম্ভীর দিনকতক। এতটা মেলামেশা ভাল নয় সেটা কাকিমাই ওকে বুঝিয়ে থাকবে। আর, তারপর থেকে শেখরের বাড়িতে আনাগোনা কমেছে। ইদানীং একেবারেই আসে না।

কিন্তু শেখরের গাড়িতে কাজলকে দু'দিনদিন নিজের চোখেই দেখেছে সুশান্ত। শেখর গাড়ি চালাচ্ছে, পাশে হাসি মুখে কাজল। বাড়ির পিছনে মিনিট পাঁচেকের হাঁটা-পথে ছোট একটা পার্কের মত আছে। সেখানেও মাঝে-সাঝে শেখরের গাড়িটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। বলা বাহুল্য, তার লক্ষ্যের আড়ালে সুশান্ত দাঁড়িয়েই গেছে। দু'পাঁচ মিনিটের বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। কাজল এসে সোজা গাড়িতে উঠেছে, তার পরেই ধোঁয়া ছেড়ে গাড়ি হাওয়া।

·· বিলিতি সিনেমা-হল থেকে বেরিয়ে একবার সুশান্তর সামনে পড়ে গেছল দুজনে। সেবারেও সিনেমা-হলএর পাশে শেখরের গাড়ি দেখেই দাঁড়িয়ে গেছল সে। শো ভাঙতে মুখোমুখি। শেখরের হাসিখুশির ব্যতিক্রম হয়নি, কিন্তু কাজলের মুখখানা বিরস।

বাড়ি ফিরে সুশান্ত তাকে জিজ্ঞাসা করেছে, কেমন দেখলি?

কাজলের চোখে ঈষৎ উদ্বেগের ছায়া। ভাল। তুমিও দেখতেই গেছলে নাকি?

--ইচ্ছে ছিল, টিকিট পেলাম না। তোরা গেছলি কাকিমা জানে?

—না, তোমারও জানিয়ে কাজ নেই। মা যেন দিনকে-দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে।

মায়ের সম্পর্কে একটু নিন্দা করলে সুশান্তদা খুশি হবে আশা। হেসেছে তারপর - তলায় তলায় তাহলে তোমারও এসব ছবি দেখার লোভ!

কি ছবি সুশান্তর ধারণা নেই। লোভের সমর্থনে তার ঠোঁটের

ডগায় অপ্রস্তুত হাসির রেখা দেখেছে কাজল। তাতেই খুশি এবং নিশ্চিন্ত।—তোমার বন্ধু লোকখানা সুবিধে নয়, ধরে না নিয়ে গিয়ে ছাড়লই না—

সুশান্তর মুখখানা যেমন নির্লিপ্ত তেমনি স্বাভাবিক।—ধরল কোথায়, বাড়ির পিছনের ওই পার্কের ধার থেকে?

কাজল সচকিত। সুশান্তদাকে খুব চতুর ভাবে না সে, তার ওপর মায়ের পাল্লায় পড়ে যেটুকু চালাক-চতুর ছিল তাও ভোঁতা হয়ে গেছে। কিন্তু চোখে চোখ রেখে এইভাবে চেয়ে থাকে যখন, আর এই গোছের কথা বলে, তখনই রীতিমত অস্বস্তি তার।

তবু নিজের গরজেই খুশি রাখতে চায় তাকে। পার্কের ধারে গাড়িতে উঠতে দেখেছে কখন তাও বুঝতে দেরি হয়নি। হেসেই জবাব দিয়েছে, কি করি বল, মা-কে তো চেনই। তাছাড়া তোমার বন্ধুও এভাবে লেগে থাকলে কাঁহাতক দুঃখু দেওয়া যায়। কত সময় তো বকেঝকে বিদেয় করি।···আচ্ছা সুশান্তদা, লোকটা যে ভারি ভাল স্বীকার করবে তো?

ভিতরের একটা হিংস্র তাড়না নির্মূল করে কপট গাম্ভীর্যে সুশান্ত মাথা নেড়েছে। স্বীকার করেছে। ভাল। খুব ভাল। বলেছে, নন্দিতা তার খুব প্রশংসা করে। বলে, খুব ভাল লোক।

না, নন্দিতা কখনো একথা বলেনি সুশান্তকে। নন্দিতা কোন কথাই বলে না। সুশান্তও কখনো জিজ্ঞাসা করে না। সুশান্ত জানেও না শেখর যথার্থ লোকটা কেমন। কিন্তু বলতে বাধা কি··· কাজলকে খুশি করতেই বা বাধা কি!

কিন্তু তারপরেই এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছিল সুশান্ত। আর সেই থেকেই ভিতরে ভিতরে ভয়ানক অস্বস্তির চোখে দেখে তাকে কাজল।

···হঠাৎ কাছে এগিয়ে গিয়ে তার দুই কাঁধে হাত রেখেছিল। চোখের কালো তারা দুটো ওর চোখের ওপর স্থির হওয়ার আগে কোন কথা বলেনি।

—কি হল? কাজল ব্যবধান রচনা করতে চেষ্টা করেছে।

—ও ভাল হোক, মন্দ হোক, তোর তাতে কি?

ঠোঁটের ডগায় আবারও হাসির আভাস একটু। হাসিটা হঠাৎ বিচ্ছিরি লেগেছে কাজলের। রাগ দেখাতে চেষ্টা করেছে।—আমার যাই হোক, তোমারই বা তাতে কি, ছাড়।

ছাড়া পেয়ে রাগ দেখিয়ে দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে একবার। তারপর তাড়াতাড়ি চলে গেছে।

সুশান্তর চোখ দুটো খোলা দরজা দিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত অনুসরণ করেছে তাকে।···বাড়িতে বসে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে আর ফুর্তি করে গতরখানা মোটার দিকেই ঘেঁষছে একটু। আরো মোটা হলে ভাল দেখাবে না। কিন্তু এখন পর্যন্ত মন্দ দেখাচ্ছে না। এটুকু যেন নতুন আবিষ্কার সুশান্তর।

বৈশাখের শেষাশেষি এটা। গরম বাড়ছে। প্রতি গরমেই অণিমার ব্যাধির প্রকোপ বাড়ে, এবারে একটু বেশিই বাড়ছে। ফলে তাকে নিয়ে ঝামেলাও বাড়ছিল। স্বাভাবিক কারণেই কাকিমার মেজাজ বিগড়ে আছে।

এর মধ্যে তার সব থেকে অসহ্য ভাসুরপোর এই নির্লিপ্ত মূর্তি। অতএব উঠতে বসতে তারও গঞ্জনা বেড়েই চলেছিল। কিছু করতে গেলে বিড়বিড় করে ওঠে, থাক্, অত দরদ দেখাতে হবে না। আবার চুপচাপ বসে থাকতে দেখলেও দ্বিগুণ রাগ। চেঁচিয়ে পাড়াসুদ্ধ লোকের কানে তার নির্মমতার খবর পেঁছে দিতে চায় কাকিমা, বলে, তোর মতলব আমি ভালই বুঝি, মেয়েটা একেবারে সাবাড় হয়ে গেলে তোর হাড় জুড়োয়—হাড়ে বাতাস লাগাচ্ছি তোর আমি, দাঁড়া।

এ-সব কথাও যে ছেলে মুখ বুজে হজম করে, হঠাৎ আজ তার এই মূর্তি দেখে বিমলা সরকার হতভম্ব।

···ভাঙা তোবড়ানো ফোটোটা দেয়ালের গায়ে আবার টাঙিয়ে রেখে তার সামনেই কিনা শাসিয়ে গেল মেয়েটাকে, ওখান থেকে ওটা সরালে পিঠের ছাল-চামড়া বলে কিছু থাকবে না। আর সেই শাসানির ফলে পাগল মেয়েটার পর্যন্ত এমন ত্রাস যে কিছুতেই ওই ভাঙা ফোটো দেয়াল থেকে নামাতে দিলে না। আর চাবুকের ভয়ে

এখন পর্যন্ত থর-থর করে কাঁপছে।

ফলে এখানকার জীবনযাত্রায় অনাগত দুর্যোগের একটা অপ্রত্যাশিত ছায়া যে দেখে উঠল বিমলা সরকার আর তার মেয়ে কাজল সরকার, সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

চার

ছায়াটা বড় দ্রুত জমাট বেঁধে উঠতে লাগল।

এবারের গরমে অণিমার বিকৃতি দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। সেই সঙ্গে কাকিমার গঞ্জনাও। দিনের মধ্যে কাকিমা বারদশেক গলা ছেড়ে ঘোষণা করে, চণ্ডাল পাষণ্ডের হাতে পড়ে মেয়েটার হাল দিনকে-দিন আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। পাড়াপড়শীরাও জেনেছে চাবুকের ঘায়ে পিঠের চামড়া আর আস্ত নেই পাগল বউটার। একটুখানি দরদ দূরে থাক, উঠতে বসতে তাকে ভয় দেখানো। এই করলে ভাল মানুষই তো পাগল হয়ে যেতে পারে।

সুশান্তর চাবুক দেখানো বেড়েছে সেটা মিথ্যে নয়। সেই চাবুকের ঘা পিঠে সত্যিই পড়ে কিনা দুই একটা স্বচক্ষে কেউ দেখেনি। কিন্তু সকলেই, এমন কি কাজলও বিশ্বাস করে এখন, পড়ে। বিমলা সরকার সম্ভব হলে হাতের চাবুক কেড়ে নিয়ে তারই ছাল-চামড়া তুলে দেয়। হাতে না পারুক, মুখে দেয়। চাবুক হাতে সুশান্ত তখন সেই আগের মতই বোকা মুখ করে কাকিমার দিকে চেয়ে থাকে। কখনো বা হাসে। একটা কথারও জবাব দেয় না।

সমস্যা বিমলা সরকারেরও কম নয়। এই পাগল সামলায় কে। ত্রাসে আর ভয়ে বোনঝি দিবারাত্র তার সঙ্গে লেপটে থাকতে চায়। বলে, সুবিধে পেলেই ও তাকে খুন করে ফেলবে। একেবারে মেরে ফেলবে। ছেলেটাকে মেরেছে, এবার তাকেও শেষ করবে। বাঁচার তাগিদেই ছুটে ছুটে আসে মেয়েটা। কিন্তু দিনের পর দিন এ ধকল বিমলা সরকারই বা কাঁহাতক সামলাতে পারে?

ডাক্তার তাকে পরামর্শ দেয়, স্বামীর সম্পর্কে এরকম ত্রাস যখন, কিছুদিন তাকে সরিয়ে রেখে দেখা যেতে পারে কি হয়। কিন্তু বিমলা সরকারের তাতেও বিষম আপত্তি। তাহলে তো সব দায় তার একার ঘাড়েই পড়ল। আসলে পাগল বউয়ের সব ঝামেলা যে ওই লোকটাই সামলায় এখনো ডাক্তারের কাছে এই সত্যটা মুখ ফুটে স্বীকার করতে পারে না।

এর মধ্যে সুশান্ত একদিন কাকিমার ঘরে ঢুকল সোজা। না ডাকলে কয়েক বছরের মধ্যে ঘরে এসেছে কিনা স্মরণ করতে পারে না। তাই কাকিমার চোখে বিস্ময়ের থেকে সংশয় বেশি। কিন্তু মাকাল ফলের মত ওই বোকা মুখ দেখলে রাগ হতেও সময় লাগে না।

—অণিমাকে আর একবার বাইরে রেখে আসা দরকার।

কাকিমা জ্বলে উঠল তক্ষুনি, দরকার কেন, তোর ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে ?

সুশান্তর ঠোঁটের ডগায় সেই হাসি যা দেখলে তার পিত্তি জ্বলে যায়। জবাব দিল, শুধু আমার কেন, তোমারও হচ্ছে।

—আমার ওপর কত দরদ তোর পাজী নেমকহারাম বেইমান। ডাক্তার তো তোকেই ওর সমুখ থেকে দূর করে দিতে বলে।

—শুনেছি। তোমার তাতেও আপত্তি।···অণিমাকে আর একবার রাঁচিতে রেখে আসার চেষ্টা করা যেতে পারে, আমি দুই-একজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি। খরচ এবারে আরো কিছু বেশি পড়বে···তা টাকা তো আছেই।

—কি ? কি শোনালি তুই আমাকে ? ঘরে এসে টাকার খোঁচা দিতে এসেছিস! আমি টাকা খরচ করি না ওর জন্যে! তোর ওই জিভ আমি সাঁড়াশি দিয়ে টেনে ছিঁড়ব একদিন, বুঝলি ?

—টাকার খোঁচা দিইনি। ওর আর আমাদের সকলেরই ভালর জন্যে বলছি।

—ভাল! ভালর জন্যে বলছিস। ভাল চাস তুই ? লজ্জা করে না তোর মুখ নাড়তে—সর্বদা ভয়ে-ত্রাসে অস্থির হয়ে আছে মেয়েটা কখন একেবারে শেষ করে দিস ওকে—আর তুই ওর ভাল চাস ?

সুশান্ত জবাব দিল, ওর সে-ভয়টাও খুব মিথ্যে নয়—সেই জন্যেও যা বলছিলাম ভেবে দেখো।

ঘর ছেড়ে চলে গেল। শেষের কথা কটা বোধগম্য হল না হঠাৎ, তাই বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই রাগে সাদা একেবারে। মুখের ওপর বলে গেল কিনা, পাগল মেয়েটাকে একেবারে শেষ করে দিতে পারে সে-ভয়টাও মিথ্যে নয়!

না, বিমলা সরকার ভেবে কিছু দেখেনি। ভাসুরপোর শাসানিটাই শুধু প্রচারলাভ করেছে। এ-রকম পাষণ্ডকে এক্ষুনি জেলে নিয়ে পোরা দরকার রাগের মুখে পাড়াপড়শী সকলকে শুনিয়ে সেই ঘোষণাও অনেকবার করেছে।

এর কোন জবাব আসেনি বা অন্য তরফের নির্লিপ্ত মূর্তির এতটুকু ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। তবু ভিতরে ভিতরে বেশ অস্বস্তিই বোধ করছে বিমলা সরকার।...এই প্রথম খরচের কথা তুলল। বিমলা সরকারের বিচারে এটা অমার্জনীয় তো বটেই, অভাবিতও। বোকা-মুখ করে বসে থাকে বটে, কিন্তু খরচপত্র নিয়েও ভাবে বোঝা গেল। এই বোকা-মুখের আবরণ ঠেলে দুঃসাহসের আরো অনেক নজির বেরিয়ে আসতে লাগল।...এত বকেঝকে গালাগাল করেও হাতে চাবুক নিয়ে বউকে ভয় দেখানোটা পর্যন্ত বন্ধ করতে পারেনি। সেই চাবুক এখনো হাতে ওঠে ওর, আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে-ত্রাসে মেয়েটা একেবারে সিঁটিয়ে যায়, কখনো বা দিগ্‌বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকে।...আবার আজ তার ওপর এই কথা বলে গেল, একেবারে শেষ করে দিতে পারে সেই ভয়ও আছে।

...ওদিকে নিজের মেয়েটাও কয়েকদিনই বলছে তাকে, সুশান্তদার হাবভাব কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে আজকাল, ওরও নাকি ভয়-ভয় করে।

সবই ঠাণ্ডা মাথায় ভাবা যেত যদি অণিমার মাথা আর একটু ঠাণ্ডা থাকত। কিন্তু এই গণ্ডগোলও উতলা হবার মতই বেড়ে চলেছে। সামলে দেওয়া যায়। জিনিসপত্র আগলে রাখা দায়। ভেঙেচুরে সব তছনছ করে ফেলছে। এক-একদিন ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে দাপাদাপি শুরু করে। বাইরের তালা খুলে দেখা যায় ভেতর থেকে বন্ধ। সব সাধ্য-সাধনা নিষ্ফল।

বিনা স্নানে অনাহারে অনিদ্রায় চব্বিশ ঘণ্টা, ছত্রিশ ঘণ্টাও কেটে যায়। তখন আবার ভাসুরপোকেই চোখ রাঙাতে হয়।—কিছু করবি নাকি এইভাবেই শেষ হতে দেখবি?

সুশান্ত যেভাবে তখন মুখের দিকে চেয়ে থাকে, একটা গরম শলা এনে চোখ দুটোই গেলে দিতে ইচ্ছে করে তার। একটু বাদে দেখা যায় সে চাবুক নিয়ে এসেছে। কোন্ ঘরে কটা চাবুক রেখেছে সে-ই জানে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে স্থির ক্রূর চোখে সেই চাবুক নাড়ে, দোলায়।

তার পরেই ম্যাজিক যেন। সাপের মাথায় ধুলো পড়ে। অণিমার লাফানো-ঝাঁপানো জিনিসপত্র ভাঙচুর করা—সব থেমে যায়। মুখের রক্ত সরে গিয়ে ফ্যাকাশে সাদা হয়ে যায়। কাঁপতে কাঁপতে এসে ভিতরের ছিটকিনি খুলে দেয়। আগে ছিটকিনি খুলে প্রাণভয়ে মাসিকে জড়িয়ে ধরত। এখন সে ভরসাও গেছে। দরজা খুলেই দৌড়ে দেয়ালের কোণে চলে যায়। দেয়ালের দিকে মুখ করে আর দুই হাতে সেই মুখ ঢেকে কাঠের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

বিমলা সরকার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তখনকার মত। কিন্তু পরে ভিতরে ভিতরে দুশ্চিন্তা বাড়ে তার। যার হাতে ছড়ি দেখলে পাগলের পাগলামি পর্যন্ত থেমে যায়—তার প্রতি সন্দেহ ঘোরালো হতে থাকে। দরজা খোলাবার জন্য বেগতিক দেখে ছড়ি হাতে নিয়ে বোনঝিকে ভয় তো এক-আধদিন সে-ও দেখাতে চেষ্টা করেছে। তার ফল বিপরীত হয়েছে। পাগলামি চতুর্গুণ বেড়েছে। হিংস্র আক্রোশে জানালা দিয়েই তার হাত থেকে ছড়ি কেড়ে নিতে চেষ্টা করেছে। নিতে পারলে কি করবে তাও জানে।

অথচ ওই ছোঁড়ার হাতে ছড়ি দেখলে মেয়ে হিম একেবারে। বিমলা সরকারের সন্দেহ, নির্মম অত্যাচার ভিন্ন এ-রকম হতে পারে না। ভাল মুখ দেখিয়ে তাদের ঠকায়, আর ফাঁক পেলেই অত্যাচার করে। কিন্তু অত্যাচারটা কখন কিভাবে করে অনেক মাথা ঘামিয়েও বিমলা সরকার সেটাই শুধু ঠাওর করতে পারে না।

হঠাৎই আবার একদিন একেবারে বিপরীত মূর্তি অণিমার। একেবারে ঠাণ্ডা, নিশ্চুপ। থমথমে মুখ। দেয়ালে ঠেস দিয়ে

মেঝেতে বসে থাকে। ঘরে কেউ এলে ঘোরালো চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে। কিন্তু বোবা একেবারে, একটা শব্দ করে না। ভাতের থালা এনে সামনে রাখলেও চেয়ে দেখেই শুধু। এই আকস্মিক নীরবতাও কম ভয়াবহ নয়।

আগেও এ-রকমটা হয়েছে এক-আধবার। ক্ষিপ্ততা চরমে ওঠার পর ধীরে ধীরে একসময় ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। কিন্তু এবারের ব্যাপারটা যেন অন্যরকম। হঠাৎই বড় বেশি স্থির। ঘরের মধ্যে আচমকা কবরের স্তব্ধতা নেমে এসেছে যেন।

...তারপর একদিন।

আগের গভীর রাত পর্যন্ত সুশান্ত নিচের ঘরে বসে সেতার বাজিয়েছে। সেই ঝমঝমানি শুনে বিমলা সরকার কটূক্তি করতে করতে নিদ্রামগ্ন হয়েছিল।

আর, সেই বাজনা কানে আসতে অনেক রাত পর্যন্ত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করেছে কাজল সরকার। সুরে তালে লয়ে নিচে যেন তারের তাণ্ডব চলেছে একটা। কোন্ রাগ বা রাগিনী সেটা কাজলের ধারণা নেই। বাজনাটা শুধু নতুন রকমের, নতুন ধরনের মনে হয়েছে। আর মনে হয়েছে, দুর্বার অথচ চাপা আক্রোশে কেউ যেন সুরের সহস্র আঘাত হেনে আর আবর্ত তুলে কোন অশরীরী বিঘ্নের প্রাচীর ভেঙে গুঁড়িয়ে রসাতলে পাঠানোর সঙ্কল্পের দিকে এগিয়ে চলেছে। শেখর চাটুজ্যেকে নিয়ে ওর সেদিনের ভাবনা-চিন্তায় বার বার ছেদ পড়েছে। ওই বাজনা শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না।

খুব সকালে বন্ধ দরজায় ঠক ঠক শব্দ হতে ঘুম ভেঙে কাজল ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। তারপর বসন সামলে উঠে এসে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল।

সুশান্তদা দাঁড়িয়ে। ঠাণ্ডা একখানা পাথরের মূর্তি যেন।

—অনু আর নেই। কাকিমাকে খবর দে।

কাজল অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল একটা। পরক্ষণে বিস্ফারিত দু'চোখ টান করে দেখে সুশান্ত তার ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে। কাজল ঠিক শুনেছে কিনা সেই সংশয়। হুঁশ ফিরতে দৌড়ে সে-ও

অণিমার ঘরের দিকেই গেল প্রথম।

দরজার কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে পা-দুটো পাথর হয়ে গেল যেন। কয়েক মুহূর্ত। তারপর সবেগে মায়ের ঘরের দিকে ছুটল আবার।

তার পাঁচ মিনিটের মধ্যে এ বাড়িতে চিৎকার-চেঁচামেচি-কান্না-কাটিতে পাড়ার লোক সচকিত। ঘুমের চোখ রগড়াতে রগড়াতে তারা উঠে এসে যে যার বাড়ি থেকে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। বিমলা সরকারের আর্তস্বর কানে বিঁধছে তাদের।—এ কি হল! এ কি হয়ে গেল রে মা তোর! ওরে এ তুই কি করলি? মেয়েটাকে মেরে ফেললি শেষ পর্যন্ত? মেরেই ফেললি নাকি?

বাড়ি ছেড়ে বেশি পরিচিতরা পায়ে পায়ে এ বাড়ির দোতলায় উঠে আসতে লাগল।

…শয্যায় অণিমা সরকার শুয়ে আছে। মুখে কোনরকম বিকৃতির আর একটুকু চিহ্ন পর্যন্ত নেই। শান্ত পরিতৃপ্ত ঘুমের কোলে নিজেকে সঁপে দিয়েছে যেন। এই চিৎকার-চেঁচামেচিতে এক্ষুনি চোখ মেলে তাকানোও অসম্ভব নয় বুঝি।

কাজল সরকার মুখে আঁচল গুঁজে কাঁদছে। আবার সত্রাসে এক-একবার শয্যার ওধারে তাকাচ্ছে। সেখানে সুশান্ত সরকার বসে। ভাবলেশশূন্য মূর্তি। তার হাত দুয়েকের মধ্যে ওই শয্যারই একপাশে ছোট-বড় ছ'সাতটা ট্যাবলেটের শিশি। সব কটাই শূন্য! একটাতেও ওষুধ নেই।

বিমলা সরকার এক-একবার অণিমার নিস্পন্দ দেহটার ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদছে—তার বিলাপ-বিন্যাস নানা তালে উঠছে নামছে। আবার হঠাৎ হঠাৎ থেমে থেমে অব্যক্ত আক্রোশে ভাসুর-পোর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছে।—তুই, তুই ওকে মেরেছিস—ওই সব ওষুধ তো তোর কাছে থাকত—সব একসঙ্গে খাইয়ে দিয়ে তুই-ই ওকে শেষ করেছিস—কি করেছিস বল্ শিগগীর—নইলে তোকে আমি ছাড়ব না, আমি তোকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাব—কি করেছিস বল্!

সুশান্ত সরকার তেমনি নির্বাক। তেমনি পাথরের মত ঠাণ্ডা।

পুলিস এসেছে। আত্মহত্যা হোক আর হত্যা হোক, পুলিশ

আসবেই। পাড়াপড়শীর উত্তেজনার মধ্য দিয়েই তারা মৃতদেহ তুলে নিয়ে গেছে। তারপর বাড়ির জনে-জনের কাছ থেকে জবানবন্দী লিখে নিয়েছে। তাদের সন্দেহের রসদ সেই শোকের মুখে বিমলা সরকারই জুগিয়েছে, পাড়ারও কেউ কেউ জুগিয়েছে।

পোস্ট-মর্টেমের রিপোর্ট অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। একসঙ্গে অনেক রকমের স্নায়ু-প্রশমক আর ঘুমের ওষুধ সেবনের ফলে মৃত্যু। এখন প্রশ্ন সেই সব ওষুধ প্রয়োগ করা হয়েছে, কি বিকৃতমস্তিষ্ক রোগিণী নিজেই খেয়েছে সেগুলো। ওই সব ওষুধ থাকত অণিমা সরকারের স্বামী সুশান্ত সরকারের কাছে। তার স্যুটকেসে। স্যুটকেসের চাবিও থাকত সুশান্ত সরকারের কাছেই। চিকিৎসকের নির্দেশমত রোগিণীকে ওষুধও সে-ই খাওয়াত।

পুলিসের সন্দেহ ঘোরালো হবার মত অনেক ইন্ধন মিলেছে। ...এ বাড়ির দীর্ঘদিনের জীবনযাত্রা কখনো সুস্থ ছিল না। সুশান্ত সরকারের আচরণে অনেক রকমের গলদের হদিস পেয়েছে তারা। লোকটা গঙ্গাজলে ধোয়া মানুষ হলে অণিমা সরকারের চিকিৎসা এবং বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বিমলা সরকারের ওপর বর্তায় কি করে? পাড়ার লোকের রিপোর্ট, স্ত্রীকে হত্যা করার অভিসন্ধির কথা অনেক সময়েই কানে এসেছে তাদের। কানে এসেছে বিমলা সরকারের চেঁচামিচি থেকে।

সুশান্ত সরকারের স্যুটকেসের তালা দুটোই ভাঙা দেখা গেছে। তা সে তো ইচ্ছে করলে চোখে ধুলো দেবার জন্য যে কেউ ভেঙে রাখতে পারে। ওষুধের শিশিগুলো সব অণিমার বিছানায় পাওয়া গেছে। বিষ যদি কেউ প্রয়োগই করে থাকে, তাহলেও ওগুলো ওখানেই থাকবে। নইলে আত্মহত্যা মনে হবে না।

সুশান্ত সরকারকে সেই দিনই হাজতে টেনে আনা হয়েছে। তাকে জামিনে খালাস করে আনার জন্য গোড়ায় অন্তত কেউ চেষ্টা করেনি। সুশান্ত নিজেও না। সেখানে জেরায় জেরায় অস্থির করে তোলা হয়েছে তাকে। কোর্টে অনুসন্ধানের সময় চেয়ে দিনের পর দিন তাকে থানায় আটকে রাখা হয়েছে।

সেখানকার মানুষদের সহিষ্ণুতার নজির কম। জোরাল কেস

গড়ে তুলতে না পারলেই মেজাজ ঠিক থাকে না তাদের। ফলে কথা আদায়ের চেষ্টায় তাদের ভ্রূকুটি ঘোরালো হয়েছে, জেরা অত্যাচারের দিক ঘেঁষতে চেয়েছে। কিন্তু সুশান্ত সরকার স্থির, নির্লিপ্ত।

এভাবে সুবিধে করতে না পেরে থানা-অফিসার কৌশলের রাস্তা ধরেছে। সদয় ব্যবহার শুরু করেছে সুশান্ত সরকারের সঙ্গে। শিক্ষিত শিল্পী মানুষের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। বলেছে, একদিকে বিমলা সরকারের মত অত্যাচারী মহিলা অন্যদিকে ওই পাগল বউ—যা-সব রিপোর্ট পেলাম, খুন তো যে কোন ভাল মানুষও করতে পারে মশাই। আপনি তো তবু অনেক দিন সহ্য করেছেন।

এর পর অন্তরঙ্গ আশ্বাস মিলেছে তার কাছ থেকে, সত্যি কথা কবুল করলে বরং সাহায্যের রাস্তা খুঁজে পেতে বার করা যাবেই। সবই নির্ভর করছে কেস সাজানোর ওপর। কিন্তু সত্যি কথা না বললে সাহায্য করা যাবে কেমন করে। শুধু সাহায্য নয়, এখানে তার মত ভদ্রসন্তানের থাকার পক্ষে কতই তো অসুবিধা হচ্ছে—তারও সুবন্দোবস্ত করা যাবে।

সুবন্দোবস্তের নামে সুশান্ত সরকারের ভেতরটা উসখুস করে উঠতে দেখা গেছে।—অন্য কিছু চাই না, বাড়ি থেকে আমাকে একটা জিনিস এনে দেবেন?

—নিশ্চয় নিশ্চয়, কি চাই বলুন?

—আমার সেতারটা। এনে দেবেন?

শুনে অফিসারের পিত্তি জ্বলেছিল কিনা বোঝা যায়নি। তক্ষুনি তার লোক সেতার আনতে ছুটেছে। হাসিমুখে অফিসার নিজের হাতে সেই সেতার তুলে দিয়েছে।—এই জন্যে কষ্ট পাচ্ছিলেন এতদিন বলেন নি কেন!…কিন্তু এবারে আপনি কথা রাখবেন আশা করি, সত্যি কথা বলবেন, কথা দিচ্ছি তাতে আপনারই ভাল হবে মশাই। লোকের ধারণা আমরা কেবল ফাঁসিতে ঝোলাতে চাই, ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচাতে যে কত চেষ্টা করি সে খবর কেউ রাখে না।

সেতারটা হাতে নিয়ে গভীর মমতায় ময়লা কাপড়ের খুঁট দিয়েই সযত্নে মুছে নিয়েছে সুশান্ত সরকার। তারপর টুং-টাং শব্দ করেছে গোটা-কতক। তারপর মুখ তুলে অফিসারের চোখে চোখ রেখেছে।—সত্যি কথাই বলব। আমি কিছুই জানি না।

বাড়ি থেকে এর পর তাকে জামিনে খালাস করে আনার চেষ্টা হয়েছে। যোগ্য উকিলের হাতে কেস তুলে দেওয়া হয়েছে। এই সদয় পরিবর্তনের কারণ বুঝতে সুশান্তর একটুও সময় লাগেনি। আইনত, অণিমার সমস্ত টাকা-কড়ি বিষয়-সম্পত্তির মালিক এখন সে-ই। হত্যা প্রমাণিত হলে এই সব-কিছু থেকেই সে বঞ্চিত হবে। আর ফাঁসি হলে তো ফুরিয়েই গেল। তখন অণিমার বাবার আত্মীয়-পরিজনের দিক থেকে সম্পত্তি দাবির প্রশ্ন উঠবে। অন্তত কাকিমার দাবির কোন প্রশ্ন থাকবে না।

উকিল তাই স্বাভাবিক পরামর্শই দিয়ে থাকবে কাকিমাকে।

দু'মাস টানাহেঁচড়ার পর মুক্তি।

সংশয়ের অবকাশ ছিল, সেই কারণে মুক্তি মিলেছে।

বাড়িতে পা দিয়ে সেই আগের মতই বোকা-বোকা হাসিমুখে কাকিমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সুশান্ত সরকার। কাকিমা মুখ ঘুরিয়ে চলে গেছে। একটা ওষুধের বড়ি খাওয়াতে হলে যে-মেয়ের ওপর অত্যাচার করতে হত, সেই পাগল মেয়ে আত্মহত্যা করার জন্য একরাশ বড়ি গিলেছে এ-কেউ নারায়ণ শিলা হাতে নিয়ে হলপ করলেও তার বিশ্বাস হবে না। এই ছেলের মুক্তির জন্য তদ্বির করতে হয়েছে, এ-ক্ষোভ তার পক্ষে ভোলা শক্ত।

সুশান্ত দোতলার ঘরে উঠে এসেছে, বিয়ের পর যেটা ওদের দুজনার ঘর ছিল—শেষের দিকে যে-ঘরে অণিমা একাই থাকত প্রায়। ঘরে পা দিতে প্রথমেই চোখে পড়ল দেয়ালের গায়ে সেই দুমড়ানো মুচড়ানো ভাঙা ছবিটা। তার মুখে এখনো অসংখ্য কাচের কণা বিঁধে আছে। ছ'মাসের মধ্যেও এটা কেউ এখান থেকে সরায়নি। ধুলো আর মাকড়শার জালে ছেয়ে আছে।

দেয়াল থেকে নামাল ওটা। গভীর দৃষ্টি মেলে খানিক দেখল

চেয়ে চেয়ে। ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস। আলমারির ওপর তুলে রাখল, পরে একসময় ফেলে দেবে।

ফিরে দেখে দোরগোড়ায় কাজল দাঁড়িয়ে। গম্ভীর মুখে তাকেই নিরীক্ষণ করছে। অণুদির মৃত্যুটা হত্যা কি আত্মহত্যা সে-সম্পর্কে নিঃসংশয় সে-ও নয়। কোর্টের জেরায় অবশ্য ও খুব জোর দিয়েই বলেছিল এ-রকম একটা জঘন্য অপরাধ করার মত মানুষ সুশান্ত সরকার নয়! বলেছিল, সে শিল্পী, শিল্পীর মতই পাগল বউকে নিয়ে দিন কাটিয়েছে—এ-রকম অপরাধ সে করতে পারে না।

কিন্তু মনে মনে বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি। কাজল সাক্ষী-প্রমাণ নিয়েও মাথা ঘামায়নি। ও-সব প্রায় দুর্বোধ্য বিরক্তিকর তার কাছে। থেকে থেকে কাজলের সেই একটা রাতের কথাই শুধু মনে পড়ছে। অণুদির মৃত্যুর সেই আগের রাতটা।...গভীর রাত পর্যন্ত নিচে বসে সেতার বাজাচ্ছিল সুশান্তদা। সেই অস্বস্তিকর বাজনা এখনো যেন তার কানে লেগে আছে। সেই অশান্ত অস্থির বাজনার মধ্যে মৃত্যুর মতই যেন কিছু একটা ঘোষণা ছিল।

— কি রে, কি খবর? হাসিমুখেই সুশান্ত দু'পা এগিয়ে এলো। যেন দিন-কয়েকের প্রবাস-বাসের পর ঘরে ফিরে কুশল জিজ্ঞাসা করছে।

কাজল নিরুত্তর। চেয়ে আছে।

সুশান্তর ভিতরে কি হচ্ছে বোঝার উপায় নেই। তেমনি হৃষ্ট মুখে আপ্যায়ন জানাল, আয়, ভিতরে আয়।...শেখর চাটুজ্যের সঙ্গে তোর কারবার এখনো চলছে না বন্ধ হয়েছে?

নির্লজ্জের মত হাসি দেখেই কাজল জ্বলছিল, শেষেরটুকু শোনা-মাত্র ঝলসে উঠল।—সে খোঁজে তোমার দরকার কি, নিজের চরকায় তেল দাও গে না! খালাস পেয়ে চোখের পরদাও গেছে, কেমন? হেসে মুখ নাড়তে লজ্জাও করে না!

—লজ্জা করছে, আয়, ভিতরে আয়।

রাগের মুখেই কাজল থমকেছে। হাসি-মাখা দুটো চোখে চোখ রেখে ভেতর দেখতে চেষ্টা করেছে। আগেও অমনি হাসিমুখের আড়ালে ক্রূর অভিলাষ উঁকিঝুঁকি দিতে দেখেছে, এখন তার ওপর

থেকে পরদাটুকুও সরে গেছে যেন। এখন সেটা জ্বলজ্বল করছে। কাজল সরকার দ্রুত চলে গেল সেখান থেকে।

সুশান্ত সরকার হাসছে নিঃশব্দে। সে হাসি দেখলে কাজল ছেড়ে ওর মা-ও ভয় পেত বোধ করি।

তিনটে দিন এই ঘরেই শুয়ে বসে কাটিয়ে দিল। মাঝে দুপুরে মাত্র ঘণ্টা কয়েকের জন্য একবার করে বেরিয়েছে। সকলের অলক্ষ্যে গেছে, অলক্ষ্যে ফিরেছে।

চতুর্থ দিন সন্ধ্যার পর কাকিমার ঘরে এসে দাঁড়াল। কাজলও তখন মায়ের কাছেই বসে।

শেখর চাটুজ্যের মুখে কাজল শুনেছে, গতকাল সুশান্ত তার শিল্প-গুরুর কাছে গেছল। গুরু তাকে মুখের ওপর জিজ্ঞাসা করেছিল বউকে সে-ই মেরেছে কিনা। সেতার ছুঁয়ে বলতে বলেছিল। সুশান্ত বলেনি। জবাব দেয়নি। শুধু পাথরের মূর্তির মত বসেছিল। তার মুখের দিকেও তাকায়নি। গুরু তাকে আর সেখানে আসতে বা মুখ দেখাতে নিষেধ করে দিয়েছে। দিন-রাতই এই নিয়ে মা-মেয়ের কি পরামর্শ চলছে। সে ঘরে ঢুকতে দুজনেই সচকিত।

—কাকিমা, অণিমার কি আছে না আছে সব বার কর দেখি, বুঝেটুঝে নিই।

কাজলের মুখে অনাগত শঙ্কা। শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিমলা সরকারের তীক্ষ্ণ দুটো চোখ যেন কেটে কেটে তার মুখের ওপর বসে যেতে লাগল।—কি বার করব, কি বুঝে নিবি?

সুশান্তর কথায় বা হাবে-ভাবে এতটুকু জড়তা নেই। খুব স্বাভাবিক আর সাধারণ কিছুই বলতে এসেছে যেন।—অণিমার বিষয়-আশয়ের কাগজপত্র, টাকা-কড়ি, ব্যাঙ্কের পাস-বই—এই সব। কোথায় কি আছে না আছে আমি তো ভাল করে জানিই না। সাকসেশনের ব্যবস্থা করতেও কত হাঙ্গামা পোহাতে হবে ঠিক নেই।

কাজলের চোখে-মুখে শঙ্কার ছায়া আরো এঁটে বসছে। ঠিক এইভাবে এই মূর্তিতে আর এই সুরে সম্পত্তির দাবি জানাবে

ভাসুরপো, সেটা বিমলা সরকারও ভাবেনি। ঠিক এই গোছের স্পর্ধা কল্পনা করতে পারেনি মহিলা। তাই কয়েক মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গেছল। সামলে নিল। রক্ত-চক্ষু মেলে খানিক চেয়েই রইল শুধু।

তারপর এই টানা ছ'মাস বাদে পাড়ার পাঁচ বাড়ির মানুষেরা সেই তীব্র তীক্ষ্ণ বিষক্ষরা গলা শুনেছে আবার। এমনটা বোধহয় আগেও শোনেনি।

বিমলা সরকার তেড়ে মারতে এসেছে ভাসুরপোকে। চোখের আগুনে তাকে একেবারে ভস্ম করতে চেয়েছে আর গলা দিয়ে অকথ্য বিষ ঢেলেছে।—কি? কি বললি তুই? বিষয়-সম্পত্তির টাকা-কড়ি সব বুঝিয়ে দেব তোকে। খুনী দাগী কোথাকার, বেইমান, বংশের কুলাঙ্গার। বউকে মেরে তুই এসেছিস টাকা-পয়সা বুঝে নিতে? এই মতলবেই মেয়েটাকে শেষ করেছিস তুই? টাকা-পয়সা দেব। হিসেব বুঝিয়ে দেব? নুড়ো জ্বেলে দেব তোর মুখে, আবার তোকে জেলে পাঠাব আমি, আবার যদি লাগি তোকে ফাঁসিতেই ঝোলাব আমি—তুই ভেবেছিস কি—চন্দ্র-সূর্য এখনো আকাশে ওঠে না?

চন্দ্র-সূর্য-ওঠা আকাশের নিচে কি যে ঘটে তখনো বিমলা সরকার কল্পনা করতে পারেনি। কারণ তখনো সুশান্ত সরকার তার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিল। আর তখনো তার ঠোঁটের ফাঁক থেকে সেই বোকা হাসি মিলায়নি।

পরদিনই নিজের স্যুটকেস আর সেতার আর ছোট একটা বিছানা নিয়ে তাকে বাড়ি থেকে বার হতে দেখা গেছে। কাজল সরকার আড়াল থেকে দেখেছে। বিমলা সরকার একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেনি, দু'চোখে আগুন ছড়িয়ে শুধু লক্ষ্য করেছে।

তার দুদিন বাদে অ্যাটর্নির চিঠি এসেছে তার নামে। তার ক্লায়েন্ট সুশান্ত সরকারের তরফ থেকে মৃতা অণিমা সরকাবের সমস্ত টাকা এবং বিষয়-সম্পত্তি দাবি করা হয়েছে। কারণ, আইনত সে-ই সব-কিছুর একমাত্র উত্তরাধিকারী। পত্রপাঠ বিধিমত যাবতীয় সম্পত্তি হস্তান্তরের ব্যবস্থা না করলে মামলার সমস্ত খরচপত্র সুদ্ধ বিমলা

সরকারকে বহন করতে হবে।

ভাসুরপোর সাত-পুরুষ উদ্ধার করতে করতে বিমলা সরকার ছুটল নিজের উকিলের কাছে। যে বিধবার হাতে তখনো অত টাকা তাকে সৎ পরামর্শ কম উকিলেই দিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রেও সৎ পরামর্শ মিলল না খুব। মিললেও সব দিয়ে-থুয়ে হাত ধুয়ে বসে থাকার মানুষ নয় মহিলাটি। উকিল উল্টে যুঝতেই পরামর্শ দিল তাকে।

উকিলের কাছ থেকে পাল্টা চিঠি গেল, মৃতা অণিমা সরকারের মায়ের নির্দেশ অনুযায়ী বিমলা সরকারের জীবদ্দশায় সম্পত্তি হস্তান্তরের কোন প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া অণিমা সরকারের স্বামী বেঁচে থাকতেও যাবতীয় বিষয় যখন বিমলা সরকারের হাতেই অর্পন করা হয়েছে, তখনই এ-কথা সুস্পষ্ট যে সে-সম্পত্তি কখনই সুশান্ত সরকারের প্রাপ্য হতে পারে না। মৃতা অণিমা সরকারের বিবাহ কোন্ চরিত্রের মানুষের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছিল সেটা তার মায়ের এই সম্পত্তি বিলি-ব্যবস্থার মধ্যেই সুস্পষ্ট।

পরের অধ্যায় কোর্ট।

বলা বাহুল্য, কিছুদিন যেতেই পরিস্থিতি বিমলা সরকারের অনুকূল মনে হয়নি আদৌ। প্রতিপক্ষের অর্থাৎ, সুশান্ত সরকারের পক্ষে যুঝতে নেমেছেন সেই অ্যাটর্নি ভদ্রলোক, অণিমার মায়ের জীবিতকালে যিনি বিষয় দেখাশুনা করতেন। সম্পত্তি হাতে নেবার সময় এই ভদ্রলোককে বিমলা সরকার ছেঁটে দিয়েছিল। কারণ মানুষটাকে তখন একটুও সরল মনে হয়নি তার।

ভদ্রলোকের নাম বীরেশ্বর ঘোষ। দশাসই চেহারা। তেমনি গম্ভীর। তার ব্যবসায়ের আসরটি খুব বড় না হলেও তেমন ছোটও নয়। তার ওপর কূটবুদ্ধিও মন্দ ধরেন না।

ব্যক্তিগত আবেদন নিয়ে নিরুপায় বিমলা সরকার তাঁর কাছে ছুটল। কিন্তু আবেদনে নরম হওয়া দূরে থাক তিনি প্রকারান্তরে শাসিয়েই দিলেন, সময় থাকতে এখনো কড়ায়-ক্রান্তিতে মিটিয়ে দিন সব, অন্যথায় পরে বিপদ হবে।

স্বভাবতই বিমলা সরকারের মাথা ঠিক থাকল না। বলে উঠল আপনি অণিমার বাবা-মায়ের আপনার জন ছিলেন, তাদেরই

মেয়েটাকে ও-ভাবে মেরে ফেলল ওই শয়তান, আপনার কি একটু দয়ামায়াও নেই !

জবাবে তির্যক হাসির ফাঁদ পেতেছেন বীরেশ্বর ঘোষ। জবাব দিয়েছেন, আপনি লিখে দিন তাঁদের মেয়েকে সুশান্ত সরকার মেরেছে, আমি ওকে জব্দ করছি।

বিমলা সরকারকে নির্বোধ অপবাদ কেউ দেবে না। যা বোঝবার তক্ষুনি বুঝে নিয়ে উঠে এসেছে। বাড়ি এসে ভাসুরপো আর তার অ্যাটর্নির উদ্দেশে সরবে এবং নীরবে যে পরিমাণ অভিশাপ বর্ষণ করেছে, তার কিছুমাত্র জোর থাকলেও বড় রকমের অঘটন ঘটার কথা। আর, অতবড় পাষণ্ডের মুক্তির চেষ্টা করেছিল বলে সেই সঙ্গে নিজেকেও কম ধিক্কার দেয়নি।

কিন্তু মামলার বক্রগতি দেখে শেষ পর্যন্ত প্রাণান্তকর যাতনা নিয়েই আপসে রাজী হল বিমলা সরকার। সম্পত্তি দিয়ে দেবে। বলা বাহুল্য, নগদ টাকার একটা বড় অংশ অনেক আগেই উধাও হয়ে গেছল। বোনের যে বাড়ি থেকে মাসে সাড়ে বারো শ' টাকা ভাড়া আসত সেই বাড়ি, আর যে ছ' কাঠা জমির এখন চারগুণ দাম, আর আশী হাজার টাকার ফিক্সড ডিপোজিট—শুধু এই ছাড়তেই হৃৎযন্ত্র থেমে যাওয়ার উপক্রম। তার ওপর কেস শুরু হবার পর থেকে ব্যাঙ্কের নগদ টাকাও নাগালের বাইরে।

অ্যাটর্নির মারফৎ সুশান্ত সরকার হিসেব-সাপেক্ষে প্রাপ্য বুঝে নিয়েছে। আর, শেলবিদ্ধ শোকতপ্ত বিমলা সরকার বলতে গেলে শয্যা নিয়েছে।

দিন-কয়েক না যেতে তড়িৎস্পৃষ্টের মতই আবার তাকে উঠে বসতে হয়েছে। কোর্টের দ্বিতীয় শমন এসেছে তার কাছে। সারমর্ম, অণিমা সরকারের নগদ টাকা উত্তরাধিকারী হিসেবে যা পাওয়া গেছে, তার হিসেবে অনেক গরমিল।

আবার মামলা। বিমলা সরকার দিশেহারা। কোথায় কি আছে না আছে সব খুঁটিয়ে বার করা হল। তার মাসের রোজগারের মধ্যে স্বামীর সম্পত্তির একটা ছোট বাড়ির ভাড়া। বর্তমানের বসত-বাড়ি থেকে এক পয়সাও রোজগার নেই, উল্টে ট্যাক্স গুনতে হয়।

অতএব বিমলা সরকারের নিজস্ব আয় বলতে যে ভাড়া আসে, স-কন্যা জীবিকানির্বাহের পক্ষেই সেটা খুব সচ্ছল নয়। তাছাড়া অণিমা সরকারের বিষয় হাতে নেবার আগে ব্যাঙ্কে মহিলার নিজস্ব কত ছিল, তারও হিসেব তো আছেই। অতএব এর বাড়তি যা-কিছু সবই অণিমা সরকারের এবং সেটা সুশান্ত সরকারের প্রাপ্য।

এ-প্রাপ্যের পরিমাণও নিতান্ত কম নয়। অনিমার পৈতৃক বাড়ি থেকে কয়েক বছর ধরে মাসে ভাড়াই তো এসেছে সাড়ে বারোশ' টাকা করে। তার ওপর ব্যাঙ্কের নগদ লক্ষ টাকার অর্ধেক কোথায় উবে গেল? গাড়ি বিক্রির টাকাটাই বা কোথায়? অণিমার চিকিৎসা আর ভরণপোষণে খরচ হয়েছে? বেশ কথা—অমুখ তারিখ থেকে কাজল সরকার অত টাকার মালিক হল কি করে? আরো কয়েকটা ব্যাঙ্কে বিমলা সরকারের নামে অমুক অমুক টাকা গচ্ছিত দেখা যাচ্ছে কি করে? সে-সব টাকা কোথা থেকে এসেছে?

অ্যাটর্নির তৎপরতায় এ মামলারও নিষ্পত্তি হতে সময় লাগেনি খুব। বিমলা সরকার আর তার মেয়ের বর্তমানে যা আছে তার থেকে অতীতে যা ছিল সেটুকু বিয়োগ করে সেই বিয়োগফলের সব-টুকুই সুশান্ত সরকারের দখলে এসেছে।

বিমলা সরকারের সেই শোক সামলাতে এবারে প্রায় বিয়োগান্ত অবস্থা। কিন্তু নাটকের এই অঙ্ক পরিসমাপ্তির আরো কিছু বাকি, জানত না।

এক মাস না যেতে সেই বজ্রাঘাতও নেমে এলো। এবারের দাবির খড়্গটা তুলেছেন অ্যাটর্নি বীরেশ্বর ঘোষ। বর্তমানের পৈতৃক বসতবাড়ির অর্ধেক মালিক ছিল সুশান্ত সরকার। রেজিস্ট্রি ডিড্-এর সার্টিফায়েড কপি দেখে নিয়েই অ্যাটর্নি বীরেশ্বর ঘোষ বিধিবদ্ধ-ভাবে সুশান্ত সরকারের সেই অর্ধেক অংশ ক্রয় করেছেন। অতএব ওই বাড়ির অর্ধেক মালিক সদ্যবর্তমানে বীরেশ্বর ঘোষ। তাই তিনি পার্টিশন স্যুট্ ফাইল করেছেন। তবে সেই অর্ধেক অংশের ন্যায্য মূল্য পেলে সেটুকু তিনি বিমলা সরকারের কাছেই বেচে দিতে রাজী আছেন। ন্যায্য মূল্য বলতে যে-টাকার আভাস তিনি দিয়েছেন। মহিলার তাতেও মূর্ছা যাবার উপক্রম।

পাঁচ

জীবনের আর এক অধ্যায় শুরু।

এ অধ্যায়ে সুশান্ত সরকার ভিন্ন মানুষ।

অনেক টাকা হাতে এসেছে। অনেক বিত্ত। অণিমা তাকে কিছু দেয়নি কে বলল? অনেক দিয়েছে। দুনিয়ায় এই এক মেয়ের কাছে সে কিছুটা কৃতজ্ঞ।

বিত্তের প্রসাদে মুখখানা তার আরো কোমল হয়েছে, আরো কমনীয় হয়েছে, আরো সুশ্রী হয়েছে। বিধাতার দেওয়া ভারী নিরাপদ আবরণ, ওটা। বিত্তের জলুসে সেটা আরো নির্ভরযোগ্য হয়েছে। পতঙ্গ গ্রাসের জাল ওটা। রমণী-পতঙ্গ। কাব্যকলায় পুরুষকেই এতকাল পতঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সুশান্ত সরকার সে উপমা উল্টে দিচ্ছে। আরো উল্টে দেবে। তার ভিতরে যে মানুষ হিংস্র নির্মম নৃশংস নখ-দন্ত মেলে বসে আছে তাকে কেউ দেখছে না, দেখবে না। দেখলেও দেরিতে দেখছে। দেরিতে দেখবে। যেমন দেখল বিমলা সরকার। যেমন দেখল সুজাতা ঘোষ আর বীরেশ্বর ঘোষ।

···অ্যাটর্নি বীরেশ্বর ঘোষের মেয়ে সুজাতা ঘোষ। সুচপল, আধুনিকা মেয়ে। অণিমার মত বা কাজলের মতও সুশ্রী নয় আদৌ। তবু, তার দিকে চেয়ে আর একটি অণিমাকেই দেখেছে সুশান্ত। বিয়ের আগের অণিমা, অবৈধ সন্তান স্খলনের ধকলে যে-মেয়ের মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল।

হ্যাঁ, অ্যাটর্নি বীরেশ্বর ঘোষ তাকে বিশ্বাস করেছিলেন। সুজাতা তাকে বিশ্বাস করেছিল। সুজাতার মা-বোনেরাও বিশ্বাস করেছিল। সেতার নিয়ে রাতের পর রাত তন্ময় হয়ে থাকত যখন, সংঘাতের ঝঞ্ঝা বাজিয়ে যেত যখন তখনো তারা নিরেট এক শিল্পীই শুধু ভাবত তাকে। তার বেশি কিছু না।

বিষয়-সম্পত্তির দখল পাবার পর চারটে মেয়ের ওই বড়টা যে সুশান্ত সরকারের কণ্ঠলগ্ন হবে, অ্যাটর্নি বীরেশ্বর ঘোষ এরকম

একটা কড়ার প্রায় করেই নিয়েছিলেন। আর সেই অনুযায়ী প্রশ্রয়ও একটু-আধটু দিয়েছিলেন। না দিলেও প্রশ্রয়ের পথে হাঁটার মত তৎপরতা তাঁর মেয়ের স্বভাবে অনুপস্থিত নয়।

বীরেশ্বর ঘোষ শুধু সম্পত্তি দখল করে দেননি, জলের দরে সুশান্তর পৈতৃক বাড়ির অর্ধেক অংশও যথার্থই কিনেছেন। ধড়িবাজ অ্যাটর্নি, সুবিধেমত মামলার সম্পত্তি কিনতে একটুও দ্বিধা করেননি। আখেরে লাভ বই লোকসান হবে না জানা কথা। তার ওপর প্রতিদ্বন্দ্বিনী তো এক বিধবা।

যেটুকু ভুল তাঁর হয়েছিল সে-শুধু ভাবী জামাইয়ের ওই সুন্দর মুখখানার বিচার-বিশ্লেষণে।

সব গুটিয়ে হাতে নেবার পর সুশান্ত সরকারের আর এক মূর্তি। বাইরেটা অবশ্য তেমনি নরম, তেমনি নিরীহ। কিন্তু এবারে ভেতর দেখলেন বীরেশ্বর ঘোষ। সুশান্ত সরকার খুব স্পষ্ট করে তাঁকে জানিয়ে দিয়েছে, এ-বিয়ে হবার নয়, তার মত বদলেছে।

বিমূঢ় ভদ্রলোক প্রথমে নরম কথায় ভোলাতে চেষ্টা করেছেন, শেষে শাসিয়েছেন। অমায়িক বিনয়ে অ্যাটর্নিকেই কোর্টের রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে সুশান্ত সরকার।

তার পরেও কণ্ঠলগ্ন হবার আশা নিয়েই হোটেলে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল বীরেশ্বর ঘোষের মেয়ে সুজাতা ঘোষ। সুশান্তর ঠাণ্ডা, অমায়িক জবাব, বিয়ের প্রস্তাব না তুললে তাতে আপত্তি নেই—বরং সাদর অভ্যর্থনাই জানাচ্ছে সে।

সুজাতা ঘোষ তাকে লম্পট খুনী বলে গাল দিয়েছিল। বলেছিল, বউকে যে সে হত্যা করেছে তাতে আর একটুও সন্দেহ নেই। জবাবে হাসিমুখে হত্যার নেশা আর সংকল্প নিয়েই সুশান্ত এগিয়েছিল তার দিকেও।…হত্যা তো কত রকমেরই হতে পারে। ভয়ে রাগে অপমানে সুজাতা ঘোষ কেঁদে ফেলেছিল। সুশান্ত সরকারের সে-কান্না এত বিচ্ছিরি লেগেছিল যে শেষ পর্যন্ত ছেড়েই দিয়েছিল ওকে। তারপর থেকে ওই পর্বে পূর্ণচ্ছেদ।

হত্যা হত্যা হত্যা! হত্যাই সে করতে চায়। শুধু নারী-হত্যা।

সুশান্ত সরকার অজস্র হাসে নিজের মনে। আবারও ভাবে, হত্যা অনেক রকমের হয়। বিশেষ করে নারী-হত্যা। সেই হত্যার উল্লাস ধমনীর রক্তে নাচে। বাইরে তার প্রকাশ নেই।

দক্ষিণের ছ'কাঠা জমিটা দেখে-শুনে চড়া দরে বেচে দিয়েছে। হাতে নগদ সোয়ালাখ টাকার মত এসেছে আরো। বিভিন্ন ব্যাংকের ফিক্সড্ ডিপোজিটে গিয়ে জমা হয়েছে সে-টাকা। আগের আশী হাজার টাকার ফিক্সড্ ডিপোজিটও বিভিন্ন ব্যাংকে ছড়িয়ে দিয়েছে। ইনকাম ট্যাক্সের ঝামেলা যত কমানো যায়। এ-ছাড়া বিমলা সরকারের বিরুদ্ধে দু'দফায় কেস্ করে ব্যাংকের সেই নগদ টাকার খাতায় জমা পড়েছিল নব্বুই হজার টাকার মত। মাথা খাটিয়ে সে-টাকারও মোটামুটি সুব্যবস্থা করেছে। কাগজে-কলমে হিসেব কষে দেখেছে সুশান্ত সরকার, মোট টাকা অক্ষত রেখেই বছরে শুধু সুদ আমদানী হবে আঠারো হাজার টাকার মত। অর্থাৎ, মাসে দেড় হাজার। সেই সঙ্গে বাড়ি-ভাড়া মাসে সাড়ে বারোশ'—পায়ের ওপর পা তুলে বসে-বসে মোট রোজগারের পরিমাণ দাঁড়াল তাহলে মাসে সাতাশ থেকে সাড়ে সাতাশ'শ র মত।

...বিত্তের এই জালটাকে বেশ নিরাপদ আর শক্ত-পোক্তই মনে হল তার।

এদিকটা গুছিয়ে নিয়ে ঝকঝকে ছোট গাড়ি কিনল একটা। নিজেই ড্রাইভিং শিখে নিল। এটা বাড়তি জলুস। দখলের সুযোগ থাক না থাক, মেয়েদের গায়ে লোভনীয় গয়না দেখলে যেমন চোর-ডাকাত খুশি হয়, সুশান্তর ধারণা ছেলেদের গাড়ি দেখলেও তেমনি কারণে বা অকারণে মেয়েরা খুশি হয়।

অণিমা সরকার, তোমাকে ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। মাত্র ক'টা বছর তুমি যে-টুকু বিষ ঢেলে গেছ তার থেকে অনেক-অনেকগুণ বেশি সুধা-বর্ষণের প্রতিশ্রুতি তুমি রেখে গেছ। আমাকে অমৃতের অধিকারী করেছ। এ অধম তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

আর, কোথাকার কে না কে এক প্রকাশ দত্ত, এ অধম কৃতজ্ঞ তোমার কাছেও। অণিমার যৌবন তছ-নছ করে তুমি তাকে রসাতলে পাঠিয়েছে। তার পচা গলা শবদেহের সার থেকে সেখানে বিস্তীর্ণ

হয়েছে সবুজ সংকেতের নিরাপদ আলোয় ঝলমল সবুজ তৃণভূমি। মনের সাধে সেখানে বিচরণ করছে যে মানব-ষণ্ড সে তোমারই সৃষ্টি। তোমাকে কৃতী পুরুষ মানি।

...রাতের কলকাতার যে এত রূপ সে-কি সুশান্ত সরকার আগে জানত। তার বহু বিবরের আঁধার-নিভৃতে যে এত রস অন্তঃসলিলা, নির্বোধ সেতারী সুশান্ত সরকার এও কি জানত? সে কি না-বালক ছিল এতকাল? অন্ধ ছিল? শহরের দিনের আলোর আভিজাত্যেও অকৃত্রিম ললিত অভিনয়ের কত চমক, কত ঠমক, কত আয়োজন। দিন-রাতের এত রূপ এত রস এত চমক এত ঠমকের লক্ষ্য এক। লক্ষ্য শিকার।

...এই শিকারে একটা দৃশ্য চোখ বুজলেই দেখতে পায় সুশান্ত সরকার। এক জানোয়ার আর একটা জন্তুকে থাবার ঘায়ে ধরাশায়ী করেছে। তারপর শ্রান্ত শিথিল নিশ্চিন্ত অবকাশে পাশে বসে একটা থাবা তার বুকের ওপর তুলে দিয়ে পরম তৃপ্তিভরে রক্তাক্ত দ্বিতীয় থাবাটা চাটছে।

...থাবা চাটছে যে জানোয়ার সে বাঘ হতে পারে, বাঘিনীও হতে পারে। আর ওই ধরাশায়ী জন্তু পুরুষও হতে পারে, রমণীও হতে পারে।

এ খেলায় নেমে সুশান্ত সরকার নিজে কখনো শিকার হবে কিনা জানা নেই। খেলায় হার-জিত আছেই। দুশ্চিন্তা নেই, উদ্বেগ নেই তার জন্য। তবে জেতার চেষ্টায় নিষ্ঠা অটুট। প্রেরণা অফুরন্ত। তার চোখ কান নাক জিহ্বা ত্বক সজাগ সর্বদা। খেলতে নেমে যে হারের কথা ভাবে, সে হারে। সুশান্ত ভাবে না। পাঁচ ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে শুধু খেলে যায়।

শিকারের প্রতিদ্বন্দ্বিনীরা সব সার বেঁধে এসেছে। আসছে। সকালে যদি সুশান্ত সরকারকে মণিকা গুপ্তর ড্রইং-রুমের চায়ের আসরে শিল্পকথায় মগ্ন দেখা যায়, বেলা দশটায় দেখা যাবে মিসেস সরখেলের ভাবী সংস্কৃতির অনুষ্ঠান-বিতর্কের আসরে অতিথি-সেবিকা সহ আরো দেড়-জোড়া রমণীর অনুযোগ আর ভ্রূকুটিবাণে বিশ্ব সুশান্ত সরকার নিরুপায়ের মত বসে হাসছে মিটিমিটি। মৃদু

আলাপনে দুপুরের লাঞ্চ যদি সমাধা হয়ে থাকে পুরুষের সততায় সন্দিগ্ধ প্রোগ্রাম একসিকিউটিভ মালা নন্দীর মুখোমুখি বসে, বিকেলের হাওয়া-গাড়িতে তার পার্শ্বলগ্ন দেখা যাবে হাওয়ায় নিরুদ্দেশা হাস্যমুখী কেতকী গাঙ্গুলীকে—খবরের কাগজে মাসিক-পত্রে সাপ্তাহিকে যে-মহিলা আদর্শ গৃহ-রচনা থেকে শুরু করে 'লুপ'-এর ব্যবহার পর্যন্ত বহুবিধ গবেষণার মণিমুক্তো ছড়িয়ে নিজের জীবিকা-নির্বাহ করে থাকে। সন্ধ্যায় অভিজাত হোটেলের গোধুলি-ছড়ানো স্তিমিত আলোয় সুরালোকের ভব্য গুঞ্জনাসরে সঙ্গ যদি দিয়ে থাকে বস্তুবাদ আর দেহবাদ সাহিত্যে রূপায়ণের দুঃসাহসিকা সারথিনী কবিতাময়ী সবিতা চৌধুরী, রাতের নিভৃত-তর প্রহরের একাত্ম সহচরীর মত দেখা দিয়েছে আগামী দিনের ছায়াচিত্রাকাশের উজ্জ্বলতম তারকা মঞ্জরী বিশ্বাস। মঞ্জরী মুকুলিত হবার দুর্লভ প্রতিভা বর্তমান সত্ত্বেও নানা নোঙরামির আবর্তে পড়ে যে মেয়ে দ্বিতীয়া বা তৃতীয়ার বেড়া টপকে এ-যাবৎ প্রথমার ভূমিকায় স্থায়ী হতে পারল না। সেটা সম্ভব সত্যিকারের কোন দরদী প্রযোজকের সমর্থন পেলে। সুশান্ত সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পর সে-আশা আর সুদূরপরাহত ভাবছে না সে।

সুশান্ত সরকার সকলের প্রতিই সদয়, সকলের প্রীতির বিনিময়ে উদ্ভাসিত অথচ বিনম্র। রাগ-রাগিণী সম্পর্কে কৌতূহলের গভীরতা এই দেশে বুঝি একমাত্র মণিকা গুপ্তরই আছে। সংস্কৃতির আলোচনায় মিসেস সরখেলের গোল মুখখানা যত উদ্ভাসিত হতে থাকে, সুশান্তর মুগ্ধ দৃষ্টিটা ততো যেন ওই মুখের মধ্যেই হারিয়ে যেতে থাকে। নিজে পুরুষ বলেই পুরুষের সততায় সন্দিগ্ধ মালা নন্দীর সামনে অপরাধীর মত বসে থাকে। মেয়েদের গৃহরচনায় সুন্দরের বার্তা একমাত্র কেতকী গাঙ্গুলী ছাড়া আর কে পেঁছে দিয়েছে সুশান্তর জানা নেই। আধুনিক গল্প-উপন্যাসে আদি এবং অকৃত্রিম দেহতত্ত্বের সুড়ঙ্গ-পথে রসতত্ত্বের কোন্ দুর্লভ অন্তঃপুরে পেঁছনো যায়, কবিতাময়ী সবিতা চৌধুরীর সর্বাঙ্গে বুঝি সেই রহস্যের হদিস লেখা। আর মঞ্জরী বিশ্বাস? এখনো যে সে নায়িকা-প্রধান হয়ে ওঠেনি সেটা তার দুর্ভাগ্য বটে আবার

সৌভাগ্যও বটে। দুর্ভাগ্য কারণ বক্রপথে অনেক অযোগ্যতর ললাটে নায়িকার সাময়িক তিলক জ্বলজ্বল করছে। আর সৌভাগ্য, কারণ, আগুনে না পুড়লে সোনারও খাদ ঝরে না—হতাশার আগুনে না পুড়লে নায়িকার সত্তা নিখাদ হয় না। সেদিন খুব দূরে ভাবে না সুশান্ত সরকার, প্রযোজকরা যেদিন মঞ্জরী বিশ্বাসের গোলাম হয়ে থাকতে পেলেও কৃত-কৃতার্থ হয়ে উঠবে।

খুশি তারা সকলেই। মণিকা গুপ্ত, মিসেস সরখেল, মালা নন্দী, কেতকী গাঙ্গুলী, সবিতা চৌধুরী, মঞ্জরী বিশ্বাস—সক্কলে। বিচ্ছিন্ন নিভৃতে তাদের প্রত্যেকের সমাদরের পাত্র সে, প্রশ্রয়-লাভের পাত্র। একে একে এদের সকলকেই যেন আবিষ্কার করেছে সুশান্ত সরকার। আবিষ্কারের সেই মিষ্টি বিস্ময় পুরনো হবার নয় যেন।

ফলে আলাপ থেকে ঘনিষ্ঠতার পর্বে উত্তীর্ণ হতে সময় লাগে না খুব।···মণিকা গুপ্তর সঙ্গে যোগাযোগ এক অবাঙালী শিল্পীর আর্ট একজিবিশন দেখতে গিয়ে। যে তৃতীয় ব্যক্তির মারফত পরিচয় মণিকা গুপ্ত তার সম্পর্কে এখন তৃতীয় ব্যক্তির মতই নিস্পৃহ।

···মিসেস সরখেলের সঙ্গে আলাপ মণিকা গুপ্তর ড্রইং-রুমে বসে। এরপর সে-আলাপ কত দ্রুততালে জমাট বেঁধেছে আর কোন্ গোপনতার দিকে এগিয়েছে মণিকা গুপ্তও তার খবর রাখে না।

···পুরুষের সততায় সদা-সন্দিগ্ধ মালা নন্দীর সান্নিধ্য লাভ করেছে বেতারের সেতার-আসরে। গুণমুগ্ধ ভক্তের মতই এগিয়ে এসেছে সে, তারপর নিজেকে বিকশিত করেছে। সুশান্তর ধারণা একাধিক পুরুষ তার যৌবন-বাস্তবে দাগ ফেলে গেলেও এই অন্তরঙ্গ-তার পর মালা নন্দী পুরনো খেদ ভুলতে বসেছে।

···আদর্শ গৃহ-রচনা আর পরিবার নিয়ন্ত্রণের সমঝদার কেতকী গাঙ্গুলীকে কুড়িয়েছিল আউট্রাম ঘাটের এক প্রাক্-সন্ধ্যার পরিবেশ থেকে। সহরে সেদিন কি-একটা রাজনৈতিক গোলযোগের ব্যাপার ঘটেছিল। ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে গেছল, ট্যাক্সিও দুর্লভ। আউট্রাম ঘাট ফাঁকা। তারই মধ্যে ওই মেয়ে কারো প্রতীক্ষায় বসেছিল। কিন্তু তুচ্ছ প্রাণের মায়ায় দুর্যোগ উপেক্ষা করে সেই লোক আসেনি। বিকেল গড়িয়ে যেতে কেতকী গাঙ্গুলীর বক্ষ দুরু দুরু। আশ-

পাশে কয়েকটি অবাঞ্ছিত মূর্তি ঘুর ঘুর করছিল। বিকেলের আলোয় আর একটু টান ধরার অপেক্ষায় ছিল বোধহয় তারা। সেই সংকটে সুশান্ত সরকারের ত্রাতার ভূমিকা। নিজের গাড়িতে তাকে তুলে নিয়ে সমস্ত দুর্যোগের মুখে ছাই দিয়েছে। তার আচরণে কেতকী গাঙ্গুলীর মনে হয়েছিল দু'জনেই সমব্যথী—একজনের দয়িত আসেনি, আর একজনের দয়িতা আসেনি। অতএব সকল সংশয়ের ঊর্ধ্বে তারাই পরস্পরের যোগ্য নায়ক-নায়িকা।

···বস্তু-বাদ আর দেহ-তত্ত্বের দুঃসাহসী লেখিকা কবিতাময়ী সবিতা চৌধুরীর অর্ধেক মন জয় করেছিল দুটি মাত্র পত্রাঘাতে। সুশান্ত সরকার শুনেছিল মহিলা সুদর্শনা এবং হাই সোসাইটির প্রিয়-পাত্রী। একটা মাসিক সাহিত্য-পত্রে ছবিও দেখেছিল তার। প্রথম চিঠিতে সাহিত্য-পথে সমাজ-বিপ্লবের এক অপ্রতিহত নায়িকা বলে অভিনন্দন জানিয়েছিল তাকে। নামী সেতারীর এই স্তুতির ফসল ফলতে সময় লাগেনি। অনেক ধন্যবাদ সহ তড়ি-ঘাড়ি জবাব এসেছে। তারপর এ তরফ থেকে আর একখানা চিঠি এবং তার বিনিময়, তারপর আমন্ত্রণ, তারপর আনা-গোনা, আর তারপর যা · তাই।

···চিত্র-জগতের এক স্বল্পখ্যাত সংগীত পরিচালকের সঙ্গে মোটামুটি আলাপ ছিল সুশান্ত সরকারের। আবহ-সংগীত সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশে মাঝে মাঝে তার সেতার গুরুর কাছে আসত ভদ্রলোক। ওই দুনিয়াটা একবার যাচাইয়ের লোভে একটা মোক্ষম টোপ ফেলেছিল সুশান্ত সরকার। নায়িকা অদ্বিতীয়া সেতার-শিল্পী এমন কোনো রোমাঞ্চকর পটভূমির অবলম্বনে একখানা ছবি করলে কেমন হয় জিজ্ঞাসা করেছিল। ব্যস্, ভদ্রলোক আঠার মত আটকে গেল তার সঙ্গে। দিন-কয়েক স্টুডিও যাতায়াতের পর ছায়াচিত্রা-কাশের উজ্জ্বলতম ভাবীতারকা মঞ্জরী বিশ্বাসকে সে-ই এগিয়ে দিল। সেতার-সাধিকার জীবন-যৌবন পটে কাহিনী রচনার গুরু-দায়িত্ব সুশান্ত সরকারের, অতএব আলোচনার আগ্রহে তার বাস-স্থানে মঞ্জরী বিশ্বাসের পদার্পণ ক্রমে রাতের নিভৃতের দিকে গড়াতে লাগল।

নিজের মনেই হাসে সুশান্ত সরকার। কাজল সরকার আর তার মা বিমলা সরকার তাকে অনেকখানি মানুষ করে দিয়েছে। তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তবু এতটা সম্ভব হল কি করে? শিকারে নেমে সে-কি প্রতিদ্বন্দ্বিনী ঘায়েল করার কোনো চাক্ষুষ অস্ত্র ঘুরিয়েছে মাথার ওপর? তার গাড়ি আছে সেই অস্ত্র, বা ব্যাঙ্কে টাকা আছে অনেক—সেই প্রচারের অস্ত্র?

না। আসল অস্ত্র তার একটাই। প্রচার-বিমুখতার অস্ত্র, নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখার অস্ত্র। এরই জলুসে ওই অস্ত্রগুলো সব দ্বিগুণ তিনগুণ ঝলসে উঠেছে। শহরের সবথেকে লোভনীয় এলাকায় মাসে ছ'শ' টাকা ভাড়া গুণে ছোট্ট ছবির মত একখানা সুইটে থাকে সে। অথচ প্রথম পরিচয়ে মনে হবে, ছন্নছাড়া মানুষ, চাল-চুলো নেই। হৃদ্যতার গুণে তার বাড়ি আসার পর চোখ স্বাভাবিক ভাবেই ঠিকরে যাবে নবপরিচিতার। সুশান্ত সরকারের মুখখানা তখনো সঙ্কোচ-বিনম্র।

গাড়ি তার একখানা, কিন্তু অনেকেরই ধারণা অনায়াসে তিন-খানা হতে পারে। স্বনামে প্রাসাদের মত বাড়ি আছে একখানা সকলেই জানে কিন্তু বে-নামে আর ক'খানা আছে সেই কৌতূহল অনেকেরই। ব্যাঙ্কের তিন লাখ সাড়ে তিন লাখ টাকা তার নিরহংকার সুচারু নির্লিপ্ততার আয়নায় তিরিশ-পঁয়তিরিশ লাখের অনাড়ম্বর জ্যোতি ছড়ায়।

অস্ত্র আরো আছে। প্রায় অমোঘ তাও। সব অস্ত্র ঢেকে দেওয়ার মতই মুখের কমনীয় হাসি আর হাতের সেতার। তার বিত্তের ছটার সঙ্গে এই যোগ অমৃতযোগের মতই। তাই রমণী বক্ষ বিদারণের উল্লাসে সে-ও যে রক্তাক্ত দুটো থাবা চাটছে এ বুঝতে অনেক, অনেক সময় লাগে।

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে।

নিজের ঘরেই সুশান্ত অপেক্ষা করছে। আবার আসছে একজন। নতুন কেউ নয়, পুরনোই। কিন্তু নতুন করে আসছে। সুশান্ত তার জন্যেই অপেক্ষা করছে।

নন্দিতা। নন্দিতা ব্যানার্জী। গুরুর আসরে বসে কিছুদিন যাকে সে সেতার শিখিয়েছিল।···শেখর চাটুজ্যের সেই ছোটবোনের মত আত্মীয়া, যার নিখোঁজ মিলিটারি স্বামী 'সাস্‌পেকটেড ডেড্‌'। সুশান্ত সরকার আপন মনেই হাসছে মিটিমিটি। নন্দিতা ব্যানার্জী ছোটবোন নয় শেখর চাটুজ্যের, ছোটবোনের মত। তক্ষুনি কে জানে কেন, কাজল সরকারের মুখখানা সামনে ভেসে উঠল। ঠোঁটের হাসি ধারালো হয়ে উঠল। তাকে এখন বৈমাত্রেয় খুড়তুত ছোট-বোন বলবে, নাকি ছোটবোন বলবে ?

গুরু তাড়িয়ে দেবার পর এতদিনের মধ্যে নন্দিতার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। দেখা আর হতে পারে এমন চিন্তা মাথায়ও আসেনি। সেদিনের দৃশ্যটা মনে আছে সুশান্তর। গুরু তাকে সেতার ছুঁয়ে বলতে বলেছিল বউকে সে হত্যা করেছে কি না। সুশান্ত বলেনি। মুখ দিয়ে একটি শব্দও বার করেনি। আশায় আর আশঙ্কায় নন্দিতা তখন তার মুখের দিকে চেয়েছিল। আশা করেছিল, সেতারটা টেনে নিয়ে সে নিজেকে নির্দোষ বলবে।

গুরুর আদেশে সুশান্ত যখন বরাবরকার মত তার ঘর ছেড়ে চলে আসছিল, নন্দিতা তখন মাথা নিচু করে বসেছিল।

· কিন্তু এতদিন বাদে তার আবার কি দরকার পড়ল ? তার এই ঠিকানাই বা পেল কোথা থেকে ?

আজই সকালে নন্দিতা টেলিফোন করেছিল, বিশেষ দরকার, একবার দেখা করতে চায়।

'দেখা করতে চাইলে মেয়েদের বিমুখ করা রীতি নয় সুশান্ত সরকারের। নিজের বাড়িতে সন্ধ্যার পর সময় দিয়েছে। এটাই সুসময়। সবিতা চৌধুরীর সঙ্গে এই সন্ধ্যার ডিনার প্রোগ্রাম বাতিল করেছে। তারপর অপেক্ষা করছে। গুরুর সামনে যতদিন মেয়েটার সঙ্গে সেতার নিয়ে বসেছে, সুশান্ত সরকারের নিভৃতের দৃষ্টি নিজের অগোচরেও কখনো অবাধ্য হয়নি। উল্টে কিছুটা সম্ভ্রমের চোখে দেখেছে তাকে। ঠাণ্ডা, গম্ভীর। কিন্তু আজ কল্পনায় সেই মেয়ের যৌবন-বাস্তবের ওপর দু'চোখ বুলিয়ে নিতে অসুবিধে হল না খুব।···মন্দ নয়। কথা কম বলে, কিন্তু বেশ মিষ্টি মেয়ে।

পরিবেশ সাজিয়েই অপেক্ষা করছিল সুশান্ত সরকার। বড় ঘরের দুদিকে দুটো সবুজ আলো জ্বলছে। ঘরের বাতাসেও সবুজের রঙ ধরেছে যেন। মিষ্টি চন্দনধূপের গন্ধে ঘর ভরে আছে। মেঝের পুরু গদিতে একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে সেতারে মৃদু পুরবীর আলাপে মগ্ন।

চাকরকে বলাই ছিল। নন্দিতাকে সে ঘরে পেঁছে দিয়ে গেল। মেঝের গদির ধার ঘেঁষে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে। কিন্তু শিল্পী তখন মীড়ের ব্যঞ্জনায় তন্ময়, খুব মৃদু একটা করুণ সুর যেন আকুলি-বিকুলি করে ক্রমেই অন্তর্মুখী হচ্ছে।

আবেশভরা দু'চোখ তুলে একবার তাকাল সুশান্ত সরকার। বাজনা থেমে গেল।

ঈষৎ আগ্রহে নন্দিতা বলল, থামলেন কেন?

সুশান্ত হাসিমুখে তাকে দেখল একটু, তারপর সেতারটা সামনে রেখে হাল্কা সুরে বলল, খুনীর হাতের আঙুল তো···সব সময় বশে থাকে না। বোসো—

আগে কখনো 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' বলেনি। কিন্তু সে-যেন মনেই নেই।

মনে হয়তো নন্দিতারও নেই। এগিয়ে এসে হাত তিনেক ব্যবধানে বসল। আগের মতই কমনীয় ঠাণ্ডা মুখ। তবে আসা-মাত্র ওই কথা শুনে যেন বিমর্ষ একটু। কয়েক নিমেষ মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর মৃদু অথচ বেশ স্পষ্ট সুরে বললে, আপনি আপনার বউকে খুন করেছেন এ আমি আগেও বিশ্বাস করিনি, আজ আপনাকে দেখার পরে সন্দেহ একেবারে গেল।

সুশান্ত সরকার আর একটু ধৈর্য ধরো। অদৃশ্য থাবা দুটো কি বড় বেশি অস্থির হয়ে উঠেছে? শিকার তো সেধেই এসেছে, বোসো, তাড়া কিসের!

দু'চোখে ছদ্মবিস্ময়ের আভাস। সেই ফাঁকে তার সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল একবার। এবারের নিরীক্ষণের ফলে মনে হল, মুখ-খানা আগের মতই ঠাণ্ডা আর লোভনীয় মিষ্টি বটে কিন্তু কোথায় যেন ব্যতিক্রম একটু। সুশান্ত ঠিক ঠাওর করতে পারল না।

হেসেই জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ এতখানি বিশ্বাস করার মত কি দেখলে ?

নন্দিতা হাসল না। তেমনি চেয়ে থেকেই জবাব দিল, ঠিক বলতে পারব না।

সুশান্ত আরো একবার চোখ বুলিয়ে নিল। নিজের এই দুটো চোখের ওপর অগাধ আস্থা এখন। তবু আগের সঙ্গে ওই মেয়ের কোথায় তফাত ঠিক ধরতে পারছে না। উঠে ঘরের সাদা আলোটা জেলে দিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছেটা দমন করল। ওটা আবার সব অস্পষ্টতার আবরণ খসানোর মত জোরাল। পাকা শিকারীর কাঁচা কাজ করতে নেই।

—যাক, খুশি হলাম। হঠাৎ আমারই সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার হল, কি ব্যাপার ?

কিভাবে কথাটা বলবে নন্দিতা মাথা নিচু করে তাই সম্ভবত ভেবে নিল একটু। তারপর মুখ তুলে আবার চোখে চোখ রাখল। —কাজল সরকার আপনার ছোটবোন ?

কি কাণ্ড, নন্দিতা ব্যানার্জীর এখানে আসার সূত্র ধরে তারও কাজলের কথাই মনে পড়েছিল। কিন্তু না, সুশান্ত একটুও অবাক হয়নি। আর একটি কথাও না শুনে সে বলে দিতে পারে নন্দিতা কেন এসেছে, কি চায়। তবু অবাক একটু না হলে চালে ভুল হবে। জবাব দিল, হ্যাঁ, ছোটবোন মানে বৈমাত্রেয় খুড়তুতো ছোটবোন···

—তাহলেও আপনি তাকে ভালবাসেন শুনেছি। নন্দিতা ব্যানার্জীর গলার স্বরে একটুও দ্বিধা বা সঙ্কোচ নেই। বলল, যদিও বাঁকা দেখা স্বভাব যাদের তারা বাঁকাই দেখে সবকিছু, তবু আপনি তাকে ছোটবোনের মতই ভালবাসেন বলেই আমার বিশ্বাস।

সুশান্তর হাসিই পাচ্ছে। নন্দিতার বিশ্বাস সে তার বউকে খুন করেনি, এখন আবার বিশ্বাস কাজল সরকারকে ও ছোটবোনের মত ভালবাসে।···ভাল। বিশ্বাসে কৃষ্ণ মেলে। জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে বল তো ?

—তার বিপদ। আপনি ইচ্ছে করলে আপনার বোন বিপদে যাতে না পড়ে সে চেষ্টা করতে পারেন।

আনন্দে ভেতরটা থল থল করে উঠছে সুশান্ত সরকারের। কাজলের কি বিপদ একটু চেষ্টা করলেই অনুমান করতে পারে। আর নন্দিতার কেন সেই বিপদ উদ্ধারের বাসনা, তাও। মেয়েটাকে এখন আরো বেশি ভাল লাগছে।

—আর একটু খুলে বল।

খুলেই বলল নন্দিতা ব্যানার্জী। তেমনি ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত মুখে যেটুকু জানাল তার সার কথা, আগামী পরশু সন্ধ্যার পর কাজল সরকারকে অমুক হোটেলে দেখা করতে বলেছে শেখর চাটুজ্যে। এখন সে কলকাতার বাইরে, কাল দুপুরে ফিরবে। সন্ধ্যার পর দেখা হলে কাজলের রোজগারের ব্যবস্থাও পাকা হবে—সে-ভার শেখর চাটুজ্যে নিয়েছে, তার একটুও দুশ্চিন্তার কারণ নেই জানিয়েছে, আর ঠিক সময়ে তাকে হোটেলে আসতে বলেছে।

যে হোটেলের নাম করল নন্দিতা, সেটা নৈশ-বিহারের উপযুক্ত ক্ষেত্রই বটে।

মনোভাব গোপন করে খুব স্বাভাবিক সুরেই সুশান্ত বলল, এতে চিন্তার কি আছে, কাজলই হয়তো রোজগারের ব্যবস্থা করে দেবার কথা বলেছিল, সেই ব্যবস্থাই কিছু হয়েছে।

এবারে জবাবটা ঈষৎ কঠিন শোনাল। ব্যবস্থা কি হয়েছে আমি জানি। আপনি দরকার মনে করেন তো বাধা দিন। দেখা করতে বলে কাজল সরকারকে যে চিঠি লেখা হয়েছে সেটা তার হাতে পড়েনি। কিন্তু পরশু সে দেখা করতে না এলে শেখর চাটুজ্যে খবর নেবেই, আর তারপর বিপদ এড়ানো যাবে না।

এবারে সুশান্ত বিস্মিত একটু। কাজলকে চিঠি লিখে দেখা করতে বলা হয়েছে এটুকুই বোঝা গেল। জিজ্ঞাসা করল, কাজল চিঠি পায়নি তুমি জানলে কি করে?

জবাব না দিয়ে আঁচলের তলা থেকে নন্দিতা একটা খাম বার করে তার হাতে দিল। সুশান্ত অবাক। খামের ওপর টাইপে নন্দিতার নাম লেখা।

মৃদু গলায় নন্দিতা বলল, খুলে পড়ুন।

খাম খুলে সুশান্ত আরো অবাক। ভিতরে কাজলের নামে

চিঠি। ইংরেজিতে লেখা। দৈবাৎ যদি কাজলের মায়ের হাতে চিঠি পড়ে সেই আশঙ্কায় ইংরেজিতে লেখা হয়তো। সাদা-মাটা চিঠিই বটে, তবে ইঙ্গিতশূন্য নয়। লিখেছে, নিশ্চিন্তে দিন কাটাবার মত ভাল রোজগারের ব্যবস্থাই সে করেছে—শুধু তাই নয়, কাজলের ভবিষ্যতের সমস্ত দায়িত্বই তো সে নিয়েছে। অমুক দিন অমুক সময়ে অমুক হোটেলে অবশ্য যেন সে আসে।

চিঠি পড়ে সুশান্ত অনেকটা যেন বিমূঢ় মুখে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু এই চিঠি তোমার নামের খামে কেন?

—মদের ঝোঁকে। খাম যখন টাইপ করেছে তখন মাথা ঠিক ছিল না। তার কাজের দরকারী চিঠিও এমনি একবার আমার নামে এসেছিল। এই চিঠি কাল বিকেলের ডাকে পেয়েছি। আমাকেও চিঠি লিখতে হবে সেটা মাথায় ছিল বলেই ও-রকম ভুল হয়ে থাকবে। আজ সকালের ডাকে সেই চিঠিও পেয়েছি।

বিস্ময়ের অবসান। খাম আর চিঠিটার ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিল সুশান্ত। খামের ওপরে বর্ধমানের ছাপ। ভিতরে কোথা থেকে লিখছে তার ঠিকানা-পত্র কিছু নেই।···মজাই লাগছে এখন। নাটক জমে উঠেছে। বেচারা শেখর চাটুজ্যে। হালকা হেসে জিজ্ঞাসা করল, কাজলের চিঠি তোমার হাতে পড়েছে এই একটা ভুলের জন্যই তার মস্ত বড় বিপদ ভাবছ?

—আমি কিছু ভাবছি না, যা সত্যি তাই বলছি। আপনার বোন সাবধান না হলে তার বিপদ হবে।

আপনার বোন, আপনার বোন! শুনে শুনে সুশান্ত বিরক্ত। আপনার বোনের উদ্দেশে মনে মনেই অশ্লীল একটা গালাগাল করে নিল। তারপর ভাল মুখ করেই জিজ্ঞাসা করল, অর্থাৎ, রোজগারের আশা দেওয়াটা ভাঁওতা?

—না। নন্দিতার মুখ আরো ঠাণ্ডা, আরো কঠিন। রোজগার অনেক হতে পারে, কিন্তু রোজগার যে দিক দিয়ে হবে সেটা ভয়ের রাস্তা। আমাকে দিয়ে সুবিধে হয়নি, সে-জন্যেই আপনার বোনের মত মেয়ে তার দরকার। ও ভয় ছাড়াও মেয়েদের আরো বড় বিপদ আছে—সে-বিপদের কথা জেনেও লোভে পড়ে কাজল সরকার ওই

হোটেলে আসবে মনে হয়। অতটা লোভের ব্যাপার না দাঁড়ালে এই চিঠি লেখা হত না।

সুশান্ত চুপ খানিক। নন্দিতার মুখখানাই লক্ষ্য করছে ভাল করে। মনে হচ্ছে রাগে ঘৃণায় আর বিদ্বেষে ওই মূর্তি স্তব্ধ।

—বুঝলাম। ধীরে-সুস্থে সুশান্ত মুখ খুলল আবার।—এবার একটা কথার সত্যি জবাব দাও দেখি।···তোমার মিলিটারি স্বামী সত্যিই নিখোঁজ?

নন্দিতা থমকালো একটু। তারপর জবাব দিল, না। তিনি বেঁচে নেই।

কপালে আর সিঁথির জ্বলজ্বলে সিঁদুরচিহ্নর ওপর চোখ আটকালো সুশান্তর।—সাসপেকটেড ডেড্ শুনেছিলাম?

—সেটা মায়ের জন্য গোপন করা দরকার হয়েছিল। মা বিধবা, আমি তার একমাত্র মেয়ে। তাছাড়া, মা তখন অসুস্থ ছিল—

সুশান্ত বিমূঢ়ের মত জিজ্ঞাসা করল, এখনো তোমার মা আশা করছেন জামাই ফিরবে?

—তিনি বেঁচে নেই।

সুশান্তর দৃষ্টি রমণীমুখের উপর স্থির হয়ে বসল আরো। আবার হাসি পাচ্ছে। এই ঠাণ্ডা গম্ভীর মুখখানা রীতিমত ভাল লাগছে। লোভ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। অবাধ্য চোখদুটো বারবার তার সর্বাঙ্গে ওঠা-নামা করতে চাইছে।···মা মাবা যাবার পরেও টকটকে লাল সিঁদুর পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কারণ ওই নির্ভরযোগ্য দাগটা মুছে দিতে চায়নি। ওই সিঁদুরচিহ্ন না থাকলে কেমন দেখাতো ভাবতে চেষ্টা করল। একটুও ভাল লাগত না। রোসো সুশান্ত সরকার, আর খানিক সবুর করো, রাতটা তোমার ভালই কাটবে মনে হয়।

সামনের দিকে ঝুঁকল আর একটু।—শেখর চাটুজ্যে তোমার আত্মীয়?

হঠাৎ ঝাঁঝে নন্দিতা বলে উঠল, তার নাম শেখর চাটুজ্যে নয়।

—সেকি! কি নাম তাহলে? মুখে নির্ভেজাল বিস্ময়ের কারুকার্য।

ভিতরে ভিতরে একটা বিপর্যয় চলেছে বলেই নন্দিতা এই উক্তি করেছিল। সংবরণ করে নিল। তেমনি ঠাণ্ডা গলায় বলল, প্রয়োজনমত তার অনেক নাম। কিন্তু সে থাক—

—থাক তাহলে। কিন্তু সে আত্মীয় তোমার ?

স্থির ঠাণ্ডা দুটো চোখ তার চোখে এসে মিলল আবার।—হ্যাঁ, আমার স্বামী।

অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গেল সুশান্ত। তারপরেই আত্মস্থ আবার।···স্বামী, অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বামী। ওই জন্যেই সিঁথি রাঙা।

সুশান্তর হাসি পাচ্ছে। কিন্তু হাসলে সব পণ্ড। স্বামীর ওপর ভক্তি-শ্রদ্ধা কেমন বুঝতেই পারছে। তবু স্বামী একটা থাকা ভাল, তাতে ও নিজে নিরাপদ, অন্যেরাও। স্বামী শুনে খুশি ছাড়া অখুশি হবার কারণ নেই সুশান্ত সরকারের।

জেরা করে করে আরও কিছু কথা বার করে নিল সে। তাকে বিশ্বাস করে এত কথা নন্দিতা বলল কেন জানে না। হয়তো অতি বড় জ্বালায় বলেছে। এমন কি শেষ পর্যন্ত শেখর চাটুজ্যের আসল নামটাও গোপন থাকেনি।···অম্বর ঘোষাল। নন্দিতা বাবা-মায়ের সঙ্গে জব্বলপুরে থাকত, অম্বর ঘোষালরাও। ছেলেবেলা থেকে পরিচয় তাদের। বিয়ে হতে পারত, কিন্তু নন্দিতারাও ঘোষাল বলে তার মা এক গোত্রে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হয়নি। বিয়ে যার সঙ্গে হয়েছিল সেই ছেলে ডাক্তার, বিয়ের পরেই মিলিটারিতে চাকরি নিয়ে চলে যায়। তার মৃত্যুর খবর শোনার পরেও নন্দিতা শোকে স্তব্ধ হয়ে যায়নি। কারণ শোকে স্তব্ধ হবার মত কাছে সেই লোককে কখনো পায়নি। তার থেকে অনেক কাছে ছিল আর কাছে এসেছিল অম্বর ঘোষাল।

···সে তখন জব্বলপুরে ছিল না। বাইরে ছিল। একজনের মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে চলে আসতে দেরি করেনি। গোপনে বিয়ের পর্ব সমাধা হয়েছে। নন্দিতা অনেক দিন পর্যন্ত জানত, ব্যবসায়ের কোন বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছে অম্বর ঘোষাল। কাজের চাপে তাকে বহু জায়গায় ছোটাছুটি করে বেড়াতে হত। কি-রকম

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ তার, কেন নানা জায়গায় ঘুরতে হয়, সেটা বুঝেছে কলকাতায় এসে। সুখের স্বপ্ন ভেঙে খান-খান হয়ে গেছে। চোরাই চালানের কারবার তাদের। সোনা থেকে শুরু করে লাভ-জনক যে-কোন চোরাই জিনিসের লেন-দেনের ব্যবসা। এ ব্যবসায় নির্ভরযোগ্য মেয়ে থাকলে অনেক সুবিধে। নিজের স্ত্রীর কাছেই এ-নির্ভরতা আশা করেছিল অম্বর ঘোষাল। এ-রকম গোটা দুই মেয়ে দলে আছে। ফেরার পথ বন্ধ করে তাদের বাইরে চালান করা হয়েছে। আরো মেয়ে দরকার। বাধা না দিলে কাজল সরকার সেই দরকার মেটাতে এগিয়ে আসবে।

...কলকাতায় নন্দিতার আত্মীয়-পরিজন আছে কিছু। তার দ্বিতীয় বিয়ের খবর তারা জানে না। সেই রেজিস্ট্রি বিয়ের দলিল সুদ্ধ পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারলে নন্দিতা দিত। হিংস্র আক্রোশে নন্দিতার দু'চোখ বুঝি জ্বলে উঠেছিল।—এবারে আর গোপন থাকবে না, সকলেই জানবে। তার কথায় ভুলে আমি আবারও ভুল করেছি —বড় আশা করেছিলাম তাই ভুল করেছি।... সেতার ভালবাসতাম, ভেবেছিলাম এ-ই সম্বল করে পড়ে থাকব, তাকেও বলেছিলাম সে যদি শান্তি চায়, তাহলে আমাকে শান্তিতে থাকতে দিক।...কিন্তু আমারও ভিতরে লোভ ছিলই, তাই এ ভুল। সংসারের স্বপ্ন ছিল, তাই এ ভুল। ছেলেবেলায় যে কাছে এসেছিল, তার মধ্যে কোন পাপ দেখিনি, তাই এ ভুল। বলতে বলতে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল, কিন্তু তারপরেই গলার স্বর বদলালো একটু। অপেক্ষাকৃত ধীর সুরে বলল, এখনো বোধহয় ভুলের মধ্যে বাস করছি... এখনো আশা করছি সে ফিরবে, সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। আর সেই জন্যেই আপনার কাছে না এসে পারিনি।

একসঙ্গে এতগুলো ভুলের কথা শুনে সুশান্ত অবাক হয়েছিল। অবাক হয়েই লক্ষ্য করছিল তাকে। নন্দিতা উঠে দাঁড়াতে এবারে হঠাৎ বুঝি একটা পরদা সরে গেল তার চোখের সমুখ থেকে। আর তক্ষুনি বুঝে নিল, ভুলটা কি। নন্দিতার দিকে চেয়ে যে ব্যতিক্রম অনুভব করেছিল, সেটা কি তাও অস্পষ্ট থাকল না আর।

নন্দিতা অন্তঃসত্ত্বা।

ছয়

শিকারের উল্লাসে অদৃশ্যে দুটো থাবা চাটছিল যে জীবটা, সে নিজেরই নিভৃতের কোন্ গহ্বরে সেঁধিয়ে গেছে। নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে সুশান্ত সরকার নন্দিতাকে বাড়ি পেঁছে দিয়েছে। আর তাকে বলেই কাজলকে লেখা শেখর চাটুজ্যের অন্যথায় অম্বর ঘোষালের চিঠিখানা নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। আসার আগে নন্দিতাকে বলেছিল, আমি যে ব্যবস্থাই করি ঘুরে ফিরে সন্দেহটা তোমার ওপরেই এসে পড়বে হয়তো···যে যাই বলুক, আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে একথা তুমি কক্ষনো স্বীকার কোরো না।

নন্দিতা তেমনি মৃদু আর তেমনি ঠাণ্ডা জবাব দিয়েছে, আমার জন্যে আপনি চিন্তা করবেন না।

সেই রাতেই সুশান্ত সরকার বড় একটা ফোটোগ্রাফিব দোকানে হানা দিল। আপাতত এই চিঠিখানাই দুর্লভ অস্ত্র। এব ফোটোস্ট্যাট্ কপি চাই কয়েকখানা। কারণ, রাত পোহালে এ-চিঠি আর তার হাতে থাকবে না। এটা যার প্রাপ্য সে-ই পাবে। বছর কয়েক আগের সুশান্ত সরকাব আর আজকের সুশান্ত সরকার এক মানুষ নয়। তার মগজ এখন চাকিতে কাজ করে, মতলব ঠিক করে নিতে সময় লাগে না।

···পরদিন খুব ভোরে উঠে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল বর্ধমানে। শেখর চাটুজ্যে বা অম্বর ঘোষালের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার সম্ভাবনাটা বাতিল করে দিয়েছে। এতবড় দুনিয়ায় অমন যোগাযোগ বাস্তবে কমই ঘটে। ঘটলেও তাতে সুশান্তর প্ল্যান ভেস্তাবে না। দেখা হয়ে যাওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়, এই পর্যন্ত। সে-রকম অঘটন কিছু ঘটল না। ঘণ্টাকয়েক বাদেই সে নির্বিঘ্নে ফিবে এলো আবার।

তারপর চুপচাপ ঘরে বসেই কাটিয়ে দিল দিনটা।

তার পরের দিন।

বিকেল। বিরক্ত হয়েই সেতারটা সামনে থেকে সরিয়ে দিল সে।

শিকারের নগ্ন উল্লাসে ভেতরের সেই জীবটা তার রক্তাক্ত থাবা এত বেশি চাটছে যে স্থির হয়ে বসে থাকা দায়। নারীদেহ-বিদারণের নিষ্ঠুর তাড়নায় শ্বাপদের দু'চোখের মতই ধকধক করছে ভেতরটা। এমন আর কখনো হয়নি।

সন্ধ্যার ঠিক ঘণ্টাখানেক আগে গাড়ি নিয়ে বেরলো। মিনিট পনেরোর মধ্যে সেই হোটেলে এসে উপস্থিত হল যেখানে কাজলের প্রতীক্ষায় বসে আছে আর এক আদিম লোলুপ পুরুষ। নিচে থেকে একটু খোঁজখবর করে সোজা দোতলায় উঠে গেল। কোণের দিকের একটা ছোট সুইটের সামনে এসে দরজার গায়ে বোতাম টিপল।

ভিতরে প্যাঁক করে মৃদু শব্দ হল একটা।

দরজা খুলল। যে খুলল তার হাসি-হাসি মুখ মুহূর্তে সাদা।

—সুশান্তদা যে!

—গুড্ ইভনিং অম্বর ঘোষাল, গুড্ ইভনিং। হ্যাঁ, কাজল সরকার নয়, সুশান্ত সরকার।

ভিতরে এসে হাসিমুখে দরজাটা সে-ই ঠেলে দিল। অম্বর ঘোষাল হতভম্ব, তার দু'চোখ বিস্ফারিত।

ঘরের ভিতরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সুশান্ত ফিরল তার দিকে।—বাঃ! একেবারে বাসর-শয্যা প্রস্তুত নাকি হে?

অম্বর ঘোষালের চকচকে মুখের কমনীয়তা গেছে। প্রতিকূল অবস্থায় পড়লে পশু যেমন করে তাকায় তেমনি চেয়ে আছে।—এ সব কথার অর্থ কি?

—অর্থ খুব সোজা। ঘড়ি দেখল সুশান্ত।—আর ঠিক বিশ মিনিটের মধ্যে তুমি এখান থেকে পালাচ্ছ, তারপর কিছুদিনের মত অন্তত কলকাতা থেকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকছ।···আর তা না হলে যে পুলিস অফিসারটিকে সঙ্গে করে ঠিক তোমার দেওয়া ঘড়ি-ধরা সময়ে কাজল এখানে আসছে, তার সঙ্গে তুমি থানায় যাচ্ছ। কাজলের এখন এত রাগ তোমার ওপর যে আমার কথায় কান না দিয়ে সোজা থানায় গেছে।

অম্বর ঘোষালের মসৃণ গালে যেন চড় পড়ল একটা। তবু জোর দিয়েই বলে উঠল, এ-সব কথার মানে কি?

জবাবে সুশান্ত সরকার হাসিমুখেই তার পোর্টফোলিও ব্যাগ থেকে বড় একটা খাম বার করল। তারপর ভিতরের জিনিসটা বার করে তার চোখের সামনে ধরল।

অম্বর ঘোষাল হকচকিয়ে গেল।—কি এটা।

—চিনতে পারছ না? কাজলকে লেখা তোমার চিঠির ফোটোস্ট্যাট্ কপি। এ-রকম একটা নয়, দশটা কপি আছে। চিঠিটা কাজলই আমাকে দিয়েছিল।

—এতে কি হবে? এতে কি এমন আছে?

নিজের আঙুলে করে সুশান্ত তেমনি হাসিমুখে নিজের মাথাটা দেখিয়ে দিল।—বাদবাকি সব এইখানে আছে। আরো জোরে হাসল।—আরে ভাই, এক নৌকোয় দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর অবস্থানের কথা কবিরাও লেখে না—সী ইজ্ মাই পেট—তাই তোমাকে হটাতে এই একমাস আমাকে কম মেহনত করতে হয়নি—জব্বলপুর, বম্বে, দিল্লী কত জায়গায় ঘুরতে হয়েছে। এরপর পুলিস এলে আমার মুখ থেকেই শুনবে সোনা থেকে শুরু করে মেয়েমানুষ চোরাই-চালানের নাটকে পর্যন্ত তুমি একটি সুপটু শিল্পী। হয়তো আমার কথা সব মিথ্যেই প্রমাণ হবে, তবু পুলিস তোমাকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করবে বইকি। সেই সঙ্গে রোজগারের লোভ দেখিয়ে ফুসলে ঘরের বার করার জন্য চিঠি লিখে নেমন্তন্ন করেছ, কাজল এ-কথা বললেও হাজত-বাস করার মত সেটা মন্দ অপরাধ নয়। সে এখন কোনদিকে ঝুঁকেছে এই ফোটোস্টাট্ কপি দেখেই তো বুঝতে পারছ।

একটু চুপ করে থেকে মানসিক বিপর্যয়ের চরম মুহূর্তটাই বেছে নিল সুশান্ত সরকার। মুখ কঠিন, দৃষ্টি কঠোর। চট করে আর একবার হাত-ঘড়ি দেখে নিয়ে চাপা গর্জনে বলে উঠল, আর পাঁচ মিনিট, তুমি যাবে এখান থেকে?

···অম্বর ঘোষাল তস্করের মতই গা-ঢাকা দিয়েছে। আচমকা আক্রান্ত স্নায়ুর যোঝবার ক্ষমতাও সীমিত, জানে সুশান্ত সরকার।

নিচের বেয়ারাকে আবার কিছু নির্দেশ দিয়ে সেই ঘরেই ফিরে

এসেছে সুশান্ত। এবারে আর একজন আসবে। কাজল সরকার আসবেই জানে।···কারণ আবার ঠিক তেমনি খাম সংগ্রহ করে, টাইপে নির্ভুল ঠিকানা বসিয়ে, আর তাতে শেখর চাটুজ্যের সেই আমন্ত্রণ-লিপি পুরে বর্ধমান থেকে পোস্ট করা হয়েছে। তাই সুশান্তর হিসেবে মারাত্মক কিছু ভুল না হয়ে থাকলে আসবেই।

ভুল হয়নি। এলো।

দরজা দুটো ইচ্ছে করেই একটু ফাঁক করে রেখেছিল সুশান্ত। তার একটা আস্তে আস্তে খুলে গেল। কাজল সরকার ভিতরে এসে দাঁড়াল।

আর তারপরেই ভূত দেখার মত বিষম চমকে উঠল।

··তুমি !

হাসিমুখে সুশান্ত এগিয়ে গিয়ে দরজা দুটো বন্ধ করে ল্যাচ টেনে দিল। খুব সহজ অন্তরঙ্গ সুরে বলল, হ্যাঁ, তুই কি চিনতেও পারছিস না নাকি ?

কাজলের সমস্ত মুখ নিমেষে মোমের মত সাদা। এই চাউনি আর এই হাসির আভাস কয়েক বছর আগে বাড়িতে দেখেছিল। তারই ওপরকার পরদাটা এখন একেবারে সরে গেছে।

হাসতে হাসতে কাছে এসে তেমনি অন্তরঙ্গ সুরে সুশান্ত চোখের ইঙ্গিতে ঘর আর গদি-আঁটা নরম শয্যাটা দেখিয়ে বলল, এত অবাক হবার কি আছে, সব তো ঠিক আছে—মানুষটাই কেবল বদলে গেছে। হাসছে।—চোরাই কারবার আর মেয়ে-চালানের কারবারটা ধরা পড়ে যেতে বেচারা অম্বর ঘোষাল, মানে, তোর ওই শেখর চাটুজ্যে পুলিসের ভয়ে কলকাতা ছেড়েই পালিয়েছে। পরে আমার কাছে কান্নাকাটি—দাদা, রক্ষা কর। কি আর করা যাবে, বেচারার বউ আছে একটা. ছেলেপুলে হবে—করলাম রক্ষা। তা সময়মত তোকে তার কাছে পাঠিয়ে দেব'খন। বোস—

কাজল কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েই রইল। বসল না। কাঁপছে অল্প অল্প।

সুশান্তর হাসি-মাখা দু'চোখ তার দেহের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। নগ্ন উল্লাসে ভেতরটা খল খল করে উঠছে। না, এমন আর কখনোই

হয়নি। দেখছে। এই ক'বছরে শরীর শুকিয়েছে একটু, তাতেই আগের থেকে আরো বেশি ভাল লাগছে। সেই নিশ্চিন্ত সচ্ছলতা গেছে বলেই হয়তো সুখের বাড়তি মেদ ঝরে গেছে। সুশান্ত শুনেছিল, কাকিমার সেই ছোট ভাড়াটে বাড়ি মর্টগেজ রেখে অ্যাটর্নি বীরেশ্বর ঘোষের কাছ থেকে বাস্তু-ভিটের অংশ কিনে নিতে হয়েছে। ভাড়াটে বাড়ির মর্টগেজ এ জীবনে আর খালাস না হওয়াই সম্ভব। পৈতৃক বাড়িব কোন অংশ ভাড়া-টাড়া দিয়ে চলছে বোধহয়।

তার চাউনিব আঘাতেই কাজল আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল। অস্ফুট স্বরে বলল, সরো, বাড়ি যাব আমি—

আচমকা বেশ জোরেই একটা ধাক্কা খেয়ে শয্যায় প্রায় উল্টে পড়ল কাজল। অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এলো একটা। অত পুরু গদি না থাকলে দস্তুরমত আঘাত লাগার কথা। হিংস্র আক্রোশে তখনো হাসছে সুশান্ত। বলে উঠল, চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও বাইরে টুঁ-শব্দটি যাবে না—বাড়ি যাবি তুই? বাড়ি যাবার জন্য এ-সময়ে এইখানে এসেছিলি? অম্বর ঘোষাল তোকে বিয়ে করবে, খুব সুখে রাখবে, তাই আগে ভাগে একটু বাড়তি আনন্দ দিতে আপত্তি ছিল না—এখন সমস্তই লোকসান দেখে বাড়ি যেতে হবে—কেমন? হাসছে।—তা অত মন খারাপের কি হল, লোকসান নাও হতে পারে।

বিস্ফারিত নেত্রে কাজল দেখছিল তাকে। ধাক্কায় উল্টে পড়ে বুকের আঁচলটা খসে পড়েছিল তাও হুঁশ ছিল না। ত্রস্তে সেটা টেনে নিয়ে উঠে বসল আবার। বিবর্ণ মুখে বলল, আমাকে যেতে দাও বলছি, তুমি না দাদা!

বিদ্রূপের উল্লাসে আর এক দফা ফেটে পড়ছে যেন সুশান্তর মুখ।—আমি দাদা! সেকি রে? নিজের ভাই-বোনে সংসার পাতে যারা তাদের পর্যন্ত উদার চোখে দেখতিস, এমন আধুনিক ছিলি তুই—আর এ-তো বৈমাত্রেয় খুড়তুতো দাদা!

কাজল আর একবার উঠে দাঁড়াল। মুখে একফোঁটা রক্ত নেই যুঝি। তবু ভয়ের থেকে যেন বিস্ময় বেশি। সেই সঙ্গে নিজেকে

রক্ষা করার আকুতি। বলে উঠল, আমার সেই রোগ তুমিই ছাড়িয়েছ দাদা ভাবতে তুমিই শিখিয়েছ···মায়ের অসুখ, অভাবের দিনে একটা ইস্কুল-মাস্টারিও জুটছে না—আমি না হয় লোভে পড়ে বড় আশা নিয়ে এখানে এসে ভুল করেছি।·· কিন্তু তুমি কি হয়ে গেছ সুশান্তদা? মায়ের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য সর্বস্ব দখল করে নেবার পরেও এত ছোট ভাবতে পারিনি তোমাকে, তখনো দাদাই জেনেছি—কিন্তু এ তুমি কি হয়ে গেলে সুশান্তদা। যত রাগই আমাদের থাক তোমার ওপর, তুমি এমন হবে এ-তো কখনো ভাবিনি সুশান্তদা!

ভয়ে হোক অনুশোচনায় হোক কাজলের গলা ধরে এল। সুশান্তর মুখ থেকে চটুল বিদ্রুপের হাসি মিলিয়ে যাচ্ছে। উদগ্র ঘৃণা ধক ধক করছে দুই চোখে। মুহূর্তের মধ্যে মাথায় কি বুঝি একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল তার। এগিয়ে এল, থাবার মত দুটো হাত তার দুই কাঁধে রাখল। অদম্য রোষে বিড় বিড় করে বলল, আমি তোর দাদা···দাদা বলে জানিস আমাকে? আমি কি ছিলাম কি হয়ে গেছি। কেন হয়েছি, কেমন করে হয়েছি, তোরা কিছু জানিস না—আজ হঠাৎ অনেক নিচ অনেক ছোট দেখছিস—কেমন? দাদা বলে জানিস আমাকে? দাদা আমি তোর—?

বলতে বলতে গালের ওপর ঠাস করে প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দিল একটা। আঘাত সামলাতে না পেরে দু'হাত দূরে সরে গেল কাজল। গালে পাঁচ-পাঁচটা আঙুলের দাগ পড়ে গেল।

অস্ফুট স্বরে সুশান্ত বলল, দাদা যদি বলিস, এখন বোঝ কেমন দাদা—

কাজল সত্রাসে চেয়ে আছে তার দিকে। চোখে জল এসেছে, তবু সংবরণ করতে চেষ্টা করে চেয়েই আছে।

চেয়ে আছে সুশান্তও।

একটু বাদে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজা খুলে দিল।—যা।

দরজা খোলা পেয়েও কাজল কিন্তু চলে গেল না তখুনি। তার ভয় সরে যাচ্ছে। চেয়ে আছে তেমনি। চোখে জল সত্ত্বেও তার মুখে একটু যেন কমনীয় ছায়া নেমে আসছে।

চাপা গলায় সুশান্ত গর্জে উঠল, যা বলছি এক্ষুনি।

সচকিত হয়ে এবারে কাজল পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

সুশান্ত শয্যায় এসে বসল। মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিল বার দুই। বুকের তলায় হঠাৎ এমন এক নাটকীয় পরিবর্তনের ঝড় উঠবে সে-জন্যে একটুও প্রস্তুত ছিল না।

একটু বাদেই উঠে পড়ল। গাড়ি হাঁকিয়ে নিজের সুইটে ফিরল। মগজের মধ্যে তখনো কাঁটা-ছেঁড়া চলেছে কিসের।

রাত্রি।

সেতার বাজিয়ে চলেছে। দীপকের অশান্ত অসহিষ্ণু জ্বালা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। একটা আগুন বাইরে না হোক ভিতরে জ্বলছে। গমকের আঘাতে আঘাতে একটা ক্ষুব্ধ অসহিষ্ণু সুর কেটে কেটে ক্ষিপ্তভাবে পর্দা থেকে পর্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ভেজানো দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল। পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকে একটু এগিয়ে এল মিসেস জোনা টমাস—পাশের সুইট-এর অ্যাংলো টমাসের ঘরনী।

বাজনা থেমে গেল।

শিল্পীর মুখের দিকে চেয়ে জোনা টমাস বিব্রত একটু।—সো সরি টু ডিসটার্ব ইউ। বাজনাটা এত ভাল লাগছিল...

সুশান্ত সরকারের দৃষ্টিটা ধিকি-ধিকি জ্বলছে তখনো।—এত রাতে ভাল লাগাটা নিরাপদ নয় খুব, পালাও এখন।

মিসেস জোনা টমাস হকচকিয়ে গিয়ে পরমুহূর্তে হন্তদন্ত হয়ে প্রস্থান করল।

এই রাতে অন্তত রমণী মাত্রেই দু'চোখের বিষ তার। আবার বাজনা তুলে নিল সুশান্ত সরকার, কিন্তু এবারে আঙুলের আঘাতে যন্ত্রটার থেকে বেসুরো আর্তনাদ বেরিয়ে এল একটা।

সেতার সরিয়ে রাখল। আশ্চর্য, একটু বাদে ভাবছে নিজেই, তার কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ? মহিলাকে এমন অভদ্র-ভাবে ঘর থেকে তাড়াল কেন?

সাত

ঝোঁকের মাথায় দিন কয়েকের জন্য কলকাতা ছেড়েছিল সুশান্ত সরকার।

নেশার সাময়িক বিরতিই শুধু দ্বিগুণ করে নেশার দিকে ঠেলে দিতে পারে। নইলে শ্রান্তি, অবসাদ। যে ক্রূর প্রবৃত্তি এক অদম্য নেশার মত তার স্নায়ু দখল করে আছে, সুশান্ত সরকার তার থেকে মুক্তি চায়নি। কিন্তু বিগত ঘটনার পর হঠাৎ ক্লান্ত লাগছিল কেমন, অবসন্ন বোধ করছিল। আর, ওই ক্লান্তি আর অবসাদের ফাঁক দিয়ে নিজের চেহারাটাই থেকে থেকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। যে-চেহারাটা এ জীবনে আর কোনদিন বিবেকের আয়নায় ফেলে কাটা-ছেঁড়া করতে রাজী নয় সুশান্ত সরকার।

তাই ছুটি দরকার। দিন-কতকের উপোস দরকার। সাময়িক উপোসে ক্ষুধা বাড়ে। রসদ সংগ্রহের উদ্দীপনা বাড়ে।

বিশেষ কোন গন্তব্যস্থল ঠিক ছিল না। দূরের টিকিট কেটে পশ্চিমের গাড়িতে চেপে বসেছিল। সঙ্গে টাকা ছিল আর সেতার ছিল আর দুনলা বন্দুকটা ছিল। বিত্ত হাতে আসার পরেই বন্দুকের লাইসেন্স নিয়েছিল, বন্দুক কিনেছিল। এ-যাবৎ ওটা কোন কাজে লাগেনি···লাগেনি তাই বা কে বলবে। ওটার দিকে তাকালেই এক ধরনের আপস-শূন্য ক্রূর রোমাঞ্চ অনুভব করে। সেটুকুই কাজের। বেরুবার আগে বন্দুকটাও নিয়ে নিজের সঙ্গে নিজে যেন একটু বাস্তব রসিকতা করল সে। সেতার আর বন্দুক—পাশাপাশি মন্দ দেখায় না দুটো জিনিস।

ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় তার সতীর্থ এক বিপুলকায়া বর্ষীয়সী দিশী মেমসাহেব আর তার জীবনসঙ্গী—তেমনি ক্ষীণকায় একখানা আবলুশ কাঠ। রমণীটির আলাপ-জমানোর তাগিদে আর অফুরন্ত প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে বিকেলের দিকে সামনে যে স্টেশনটা পেল, সেখানেই নেমে পড়ল সুশান্ত সরকার।

দেওঘর।

এক শ্রীঘর ছাড়া আর সব ঘরই সমান তার কাছে। ভাল লাগলে দিন কতক এখানেই কাটানো যেতে পারে, না লাগলে ধরে রাখারও কেউ নেই।

এই খেয়ালের পিছনে দুর্নিরীক্ষ খেয়ালীর অদৃশ্য ইচ্ছার অব্যর্থ সন্ধান কিছু থাকতে পারে, এ তখন অন্তত একবারও মনে হয় তার।

ছিল।

ছিল বলেই এই ভূমিতে পদার্পণ।

ঠিক চেঞ্জের সময় নয় এটা। একটু খোঁজখবর করতে মনের মত আস্তানা মিলেছে একটা। উইলিয়ামস্ টাউনের নির্জন পথ ধরে রামকৃষ্ণ মিশনের বিপুল সংস্থা ছাড়িয়ে আরো অনেকটা পথ হেঁটে গেলে প্রায় নির্জনতম কোণে বাংলো প্যাটার্নের ছোট বাড়ি একটা। অদূরে নন্দন টিলা—স্থানীয় লোকেরা অবশ্য ওটাকেই পাহাড় বলে—নন্দন পাহাড়। তার ও-ধারে সরকারী পান্থ-নিবাস আছে। সেটা খালি পড়ে আছে জেনেও এই বাংলোটাই পছন্দ হয়ে গেল সুশান্তর। চারদিকে অনেকটা জমি, বাগান। মাঝখানে ছবির মত বাংলো। মালী আছে একটা। খাওয়া-দাওয়ার যোগানদারী সে-ই করবে আশ্বাস পেতে ওখানেই দিন-কতক কাটিয়ে যেতে পারবে ভাবল।

দিন তিনেক বাদে মালীর পরামর্শমত একটা টাঙ্গা নিয়ে বেরিয়েছিল ত্রিকূট পাহাড়ে বেড়াতে।

বিচিত্র যোগাযোগ এইখানে এসে। এই ত্রিকূট পাহাড়ে।

অবশ্য আগেও দেখেছিল মেয়েটাকে। শনের মত সাদা চুল মোটাসোটা এক বুড়োর সঙ্গে গত দুদিনই বিকেলের দিকে বিদ্যা-পীঠের দিকে যেতে দেখেছে। ও দিকের একমাত্র বেড়ানোর জায়গা ওটাই। চারদিক খোলামেলা, শান্ত নির্জন জায়গাটা। না, হাঁ করে রূপ গেলার মত রূপসী আদৌ নয় মেয়েটি, সাজসজ্জায়ও বাড়তি চটক কিছু নেই। গায়ের রঙও সুশান্তর তুলনায় অন্তত মাজা বলা যেতে পারে। মুখশ্রী মন্দ নয় অবশ্য। কিন্তু আসল শ্রী তার সুঠাম স্বাস্থ্য। বাঙালী মেয়ের তুলনায় একটু বেশি লম্বা। অন্যথায়

ওই স্বাস্থ্য-সম্পদে এমন একটা রমণীয় ছাঁদ ফুটে উঠত না।

অভ্যাসবশতই সুশান্ত দেখেছিল তাকে। বিরতি চাইলেও চোখ সর্বদা বশে থাকে না। মেয়েটা কথা বলতে বলতে ভদ্রলোকের সঙ্গে আসছিল। মুখে সামান্য একটু হাসির মত লেগেছিল। কাছাকাছি এসে চোখ তুলে একবার তাকেও দেখেছিল। তারপর তেমনি কথা বলতে বলতেই পাশ কাটিয়েছিল। পুরুষের দৃষ্টি ওই রকম উৎসুক হয়েই থাকে সেটা জানা আছে বোধহয়। তবু সুশান্ত ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। শিথিল চলার ছন্দটুকু পিছন থেকে আরো একটু উপভোগ্য মনে হয়েছিল।

পরদিনও ওই একই রাস্তায় দেখেছিল তাকে। কিন্তু মেয়েটা তখন কি আলাপে মগ্ন ছিল ভদ্রলোকটির সঙ্গে—তাকে লক্ষ্যও করেনি। নাগালের মধ্যে লোভনীয় শিকার দেখলে শর-সংযোগের জন্য অভ্যস্ত শিকারীর হাতের আঙুল যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে, সুশান্তর ভেতরটাও তেমনি একটু উসখুস করে উঠেছিল শুধু। তার বেশি কিছু হয়নি। কিছুই না। তক্ষুনি বিরতির কথা মনে হয়েছে তার, উপোসের কথা মনে পড়েছে।

কিন্তু ত্রিকূট পাহাড়ের এই যোগাযোগে কিছুই আর মনে থাকল না। প্রায় ঝোঁকের মাথাতেই এক অভিনব কাণ্ড করে বসল সে। শুধু অভিনব নয়, মৌলিকও বটে।

দেহে সামর্থ্য থাকলে পাহাড় টানেই। ও-পাশের নির্জন দিকটা ধরে পাথর বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠছিল সুশান্ত। একটা পাথর পেরুলে মনে হয় সামনেরটাতেও ওঠা যাক। এই করে বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠেছে। সামনের দিকের মাটির মানুষগুলোকে ক্ষুদে ক্ষুদে দেখাচ্ছে।

একটা বড় পাথর ধরে বাঁক ঘুরতেই তার পা দুটো থেমে গেল হঠাৎ। গজ পনেরো দূরে সিঁড়ির মত দুটো ছোট পাথরে পা ফেলে ঝুঁকে ওপরের একটা বড় পাথরে উঠে যাচ্ছে যে মহিলা, পিছন থেকে দেখলেও চিনতে এক মুহূর্ত সময় লাগল না সুশান্তর।

বিদ্যাপীঠের রাস্তায় দেখা সেই মেয়ে। সঙ্গে কেউ নেই, একা। ওপরের সমান বড় পাথরের চাতাল ধরে মেয়েটি পায়ে পায়ে এগিয়ে

চলেছে। পিছন থেকে এই সম্মন্থর চলার ছাঁদটুকু আজ আরো রমণীয় মনে হল।

এই পটভূমিতেও মানুষ রসিক যদি না হয়, তাকে নিতান্ত পাথরই বলতে হবে।

কয়েক নিমেষ চেয়ে দেখেছে সুশান্ত সরকার। তারপর পায়ে পায়ে সিঁড়ির মত ওই ছোট পাথর দুটোর দিকে এগিয়েছে সে। একটার ওপর আর একটা পাথর। সেখানে এসে আবার দাঁড়িয়েছে। আর তারপর মুহূর্তের মধ্যেই এক বেপরোয়া রসিকতার প্রেরণায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে সুশান্ত সরকার। মেয়েটা পাছে ঘুরে দেখে ফেলে তাকে তাই টুক করে বসে পড়েছে।

...তেমনি বসে বসেই একটি কার্য সমাধা করেছে সে। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে। তিন মিনিটও লাগেনি। তারপব সঙ্গোপনে সেই বড় পাথরের বাঁক ঘুবে দ্রুত অনেকটাই নিচে নেমে এসেছে। তারপর একটা পাথরের ওপরেই হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়েছে। ঘামে সমস্ত মুখ ভিজে গেছে তার, হাঁপাচ্ছেও।

অমনি বসে চুপচাপ মিনিট বিশেক কাটিয়ে দিল। হাসছে মৃদু মৃদু। ঘাম-টাম মুছে হাসি গিলে আবার উঠল। নাটক জমে ওঠার সময় হয়েছে মনে হল। সামনে একটা বেতেব ছড়ি পড়েছিল, সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ঝোপে-ঝাড়ে সশব্দে এক একটা বাড়ি দিতে দিতে আর শিস দিতে দিতে ওপরে উঠতে লাগল।

সেই পাথরটার বাঁক ঘুরে থমকে দাঁড়াল। চোখে-মুখে নির্ভেজাল বিস্ময় যেন। ওপরের সেই চওড়া পাথরটার ধারে মেয়েটা বিমূঢ় বিভ্রান্ত মুখে দাঁড়িয়ে। যে-রকম দেখবে আশা করেছিল সুশান্ত সরকার, তার থেকেও চিত্তাকর্ষক লাগল দৃশ্যটা। মেয়েটাও দেখল তাকে। এ-ভাবে হাঁ করে কোন মহিলার মুখের দিকে চেয়ে থাকাটা ভব্যতা নয় বলেই যেন আত্মস্থ হয়ে সুশান্ত সরকার অন্যদিকে পা বাড়াল।

—শুনুন।

প্রত্যাশিত আহ্বানে কান জুড়িয়ে গেল। গলার স্বরটুকু বেশ নিটোল, মিষ্টি। ঘুরে দাঁড়াল।—আমাকে?

মেয়েটি বিড়ম্বিত মুখে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ তাকেই ডাকছে। বেশ একটু বাড়তি মনোযোগে পা ফেলে ফেলে সুশান্ত সেদিকে এগলো। পাহাড়ে উঠতে অভ্যস্ত নয় এবং পা হড়কে পতনের আশঙ্কা —এই দুটো অভিব্যক্তিই স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা। পাথরটার নিচে এসে মুখ তুলে তাকাল। কেন ডেকে থাকতে পারে দৃষ্টিতে সেই নির্ভেজাল আর নিরীহ বিস্ময়।

সঙ্কোচ আর সঙ্কটের এমন মিশেল আর বোধহয় দেখেনি সুশান্ত সরকার। গলার স্বর এবারেও তেমনি মৃদু কিন্তু পরিপুষ্ট। বললে, কি করে নামব বুঝতে পারছি না···

তার বিপদ সম্পর্কে এই প্রথম সচেতন যেন সুশান্ত সরকার। এদিক-ওদিক তাকিয়ে পরিস্থিতিটা বুঝে নিয়ে দু'চোখ বড় বড় করে তার মুখের ওপর রাখল আবার। পাল্টা বিস্ময়ে বলল, তাইতো, আপনি ওখানে উঠেছেন কি করে!

বিপন্ন আর বিভ্রান্ত মুখে মেয়েটি জবাব দিল, পর পর দুটো পাথর ছিল—ওই দুটো বোধহয়? একটার ওপর আর একটা ছিল ·· দুটোই সরে গেল কি করে বুঝতে পারছি না।

পাথর দুটোর দিকে একনজর দেখে নিয়ে সুশান্ত জবাব দিল, আপনার ভুল হচ্ছে বোধহয়, অন্য কোন দিক দিয়ে উঠেছেন – খুঁজে দেখুন, ঠিক রাস্তা পেয়ে যাবেন।

—দেখেছি, কোন দিক দিয়েই নামা যাচ্ছে না, ওইখান দিয়েই উঠেছিলাম।

সুশান্ত বলল, কি সর্বনাশ, আপনি ওঠার পরেই তাহলে পাথর দুটো গড়িয়ে গেছে বোধহয়—আগে গড়ালে তো শেষ হয়ে যেতেন —এ-ভাবে কেউ ওঠে।

এক নেমে আসা ছাড়া আর কোন চিন্তাই তার মাথায় ঢুকছে না। অস্ফুট স্বরে আবার বলল, এখন নামি কি করে···

হতবুদ্ধির মতই সুশান্ত আবার তাকালো চারদিকে। বিপদ-তারণের মত কিছুই চোখে পড়ল না। নিচের দিকে তাকাতে মাথা ঘোরার উপক্রম যেন। অগত্যা নিজেও সে বিপন্নের মতই জিজ্ঞাসা করল, নিচে থেকে একটা মই নিয়ে আসব?

সংকটাপন্ন মুখে বিরক্তির ছায়া মেয়েটির, দুদিকে ধরার কিছু না থাকলে মই বেয়ে নামা যায় না সে-বুদ্ধিও নেই। চিন্তিত মুখে বলল, মই পেলেও নামা যাবে না···

অতএব সুশান্ত আরো বেশি চিন্তিত।—তাহলে লোক ডেকে আনি?

ওপরের বিরক্তি আর শঙ্কাভরা দু'চোখ এবারে তার মুখের ওপর আটকালো। বিরক্তিটুকু প্রচ্ছন্ন, শঙ্কাই বেশি। আগে কখনো এই লোকটাকে দেখেছে বলে মনে পড়ল না। বলল, আপনি যে পাথরটার ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানে তো ভাল করে দুটো লোকও দাঁড়াতে পারে না—লোক এসে কি করবে?

যে-পাথরটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেটাও যেন এই প্রথম দেখল সুশান্ত। অতএব বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটায় উপক্রম তারও। যে পাথরটার ওপর মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে সেটাও কম করে একবুক সমান উঁচু। মাথা চুলকে আর কোন পথ না পেয়ে সুশান্ত জিজ্ঞাসা করল, আমি এটা থেকে সরে গেলে লাফিয়ে নামতে পারবেন?

যা স্বাভাবিক তাই করল মেয়েটা। সত্রাসে মাথা নাড়ল। কারণ ওইটুকু পাথরে লাফিয়ে পড়ে ঝোঁক সামলানো কোন পুরুষের পক্ষেও সম্ভব নয়। বিশেষ করে এই পরিস্থিতিতে। কোন একদিকে গড়ালে একেবারে অতলে, দেহের একখানা হাড়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অগত্যা শেষ চিন্তাটাই মাথায় এল সুশান্তর। তার আগে দু'পাশের দুই মৃত্যু-কিনারা দুটো দেখে নিল। হাতের ছড়িটা ফেলে দিয়ে তার পা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল।—আপনি এই পাথরটার ওপরেই বসে পড়ুন, বসুন!

দাঁড়িয়ে মাথা ঝিম ঝিম করছিল। সঠিক না-বুঝেও মেয়েটি বসল আস্তে আস্তে।

—এবার আমার দিকে পা ঝুলিয়ে দিন—দিন!

নিরুপায় মুখে তাই করল। তার দুই হাঁটু সুশান্তর বুকের কাছে ঠেকল।

—এবারে দু'দিকে দেখুন, বেশি নার্ভাস হলে বা পা ঠিকমত না পড়লে দু'জনেই একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে যাব—দু'হাত শক্ত

করে আমার গলাটা ধরুন—আঃ ধরুন না, এই বিপদে আবার—ঠিক আছে, জোরে ধরুন—

ত্রাসে বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখ মেয়েটার। মৃত্যু বুঝি হাঁ করে আছে তার চারদিকে। সুশান্তর সবল দুই বাহু দু'দিক থেকে তার কোমর বেষ্টন করল। তারপর সামনের দিকে টেনে আনল তাকে। শেষে প্রাণপণে বুকের সঙ্গে সাপটে ধরে রমণী-দেহখানা একরকম টেনেই নামাল। নিচের এই পাথরটাও সত্যিই দু'জনের সুস্থমত দাঁড়ানোর অনুপাতে বড় নয়, কিন্তু মেয়েটি নামার পরেও এইভাবে তাকে আঁকড়ে ধরে থাকার মতও ছোট নয়। টাল সামলাতে না পারার ভয়েই যেন দুই শক্ত বাহুতে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে আছে তাকে। নামার সময় দু'চোখ বুজে ফেলেছিল, নামার পরেও কয়েকটা মুহূর্ত ভয়ে নীল মেয়েটার দুই ঠোঁট—অতএব বাধা দেবার কোন প্রশ্ন ওঠে না নিজের অগোচরে সে-ও খানিকটা আঁকড়েও ধরেছিল তাকে।

মেয়েটাই আগে আত্মস্থ হল। ফাঁড়া কেটেছে মনে হওয়া মাত্র সমস্ত মুখ লাল। কিন্তু দেখল, স্নায়ুর ওপর এতবড় ধকলের ফলেই দু'চোখ বুজে আছে লোকটা, আর বুকের সঙ্গে তখনো এত জোরে চেপে ধরে আছে যে, নড়ারও ক্ষমতা নেই তার।

সে-চেষ্টা করতে লোকটা চোখ মেলে তাকাল। তাকিয়ে যেন দেখল দু'জনেই বেঁচে আছে। চার আঙুল তফাতের কালো দুটি চোখের তারার সঙ্গে দৃষ্টিটা মিলল। মেয়েটির আরক্ত মুখে ঘাম দেখা দিয়েছে। সুশান্ত তবু তক্ষুনি ছেড়ে দিল না, তেমনি আগলে রেখেই পরের পাথরটাতে টেনে নামালো তাকে। তারপরেও এক-হাত ছেড়ে দিয়ে শক্ত মুঠোতে তার একটি বাহু ধরে অন্য হাতে তেমনি কোমর বেষ্টন করে টেনে নামাতে লাগল। মুখে পুরুষোচিত গাম্ভীর্য।

অস্ফুট স্বরে মেয়েটি বলল, ছাড়ুন এবারে পারব।

না, এখনো পা কাঁপছে আপনার, এ অবস্থায় লজ্জা করার কোন মানে হয় না।

আবারও তেমনি জোরালো পুরুষের কণ্ঠস্বর, ও-রকম বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে বলেই তার যেন এই ভাবে ধরে নামানোর

অধিকার। এবং দায়িত্বও। এমন বিড়ম্বনার মধ্যে জীবনে পড়েনি মেয়েটি, মুখ বুজেই নামতে হচ্ছে।

আরো খানিকটা নামার পর এবারে নিশ্চিন্ত হয়েই সুশান্ত কোমর ছেড়ে দিল। কিন্তু হাতখানা ধরেই থাকল। নিজের অজ্ঞাতেই হাত ছাড়াতে চেষ্টা করেছে মেয়েটি। পারেনি। অনেকটাই নামার পর সে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর কয়েক ধাপ নামলে নিচের লোক স্পষ্টই দেখতে পাবে। সোজা চোখের দিকে তাকিয়ে এত জোরে হাত ধরে রাখার অর্থটা বুঝতে চেষ্টা করল। কিন্তু বোঝা গেল না। ওই মুখে নিরাপদে অবতারণের আগ্রহটুকুই যেন সব। তারপর তেমনি স্পষ্ট মৃদু গলায় বলল, ছাড়ুন আর অসুবিধে হবে না।

—ও। বিড়ম্বনার একটু সুচারু বিন্যাস সহকারেই সুশান্ত এবারে তাড়াতাড়ি হাত ছেড়ে দিল।—কিন্তু দেখবেন, পাথরে হোঁচট খেয়ে পা না মচকায়।

জবাব না দিয়ে মেয়েটি আগে আগে নামতে লাগল। পিছনে সুশান্ত। দেখছে। দু'চোখে লোভ চিকিয়ে উঠছে। আত্মতুষ্টিতে বিভোর। ওই দুর্লভ রমণী-অঙ্গের স্পর্শ এখনো নিবিড় হয়ে সর্বাঙ্গে লেগে আছে বুঝি।

…দুর্লভ ভাবছে কেন? দু'হাত পিছন থেকে খুঁটিয়ে দেখছে সুশান্ত।…মুখ এখন দেখা যাচ্ছে না, শুধু গালের পাশটা দেখা যাচ্ছে।…কিন্তু চার আঙুলের মধ্যে দেখেছিল যখন, মাজা রং সত্ত্বেও ভীতিবিহ্বল মুখখানা ভারী কমনীয় লেগেছিল। দেখছে।…দুর্লভ এই নিটোল স্বাস্থ্য-সম্পদটুকু। আরো দুর্লভ এখনকার ওই আত্মস্থ চলার ছাঁদটুকু। ঠিক এমনটি সচরাচর দেখা যায় না। অনেক-দেখা অভ্যস্ত চোখে কিছু যেন বৈচিত্র্যের সন্ধান মিলেছে। নিবিড় সান্নিধ্যে ওই রমণীদেহ বুকের মধ্যে দুই বাহুর পেষণে বন্দী করেছিল যখন, বরাত ভাল যে উত্তেজনায় সত্যিই নিজের পা হড়কায়নি।

প্রায় সমতলে নেমে এসে দেখল অদূরে সেই পাকাচুল-মাথা বুড়ো ভদ্রলোক লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে। তাদের দেখা-মাত্র এগিয়ে আসতে আসতে সম্মুখবর্তিনীর উদ্দেশে বলে উঠলেন, তুই এতক্ষণ

কি করছিলি ? আমার তো ভাবনা ধরে গেছল।

মেয়েটি নিরুত্তর।

সুশান্তর দিকে চোখ পড়তে ভদ্রলোক থমকালেন একটু। মনে হল মেয়ের পরিচিত কেউ হবে। জিজ্ঞেস করলেন,—ইনি ?

সুশান্ত হাসিমুখে এগিয়ে এল। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার জানিয়ে বলল, আমার নাম সুশান্ত, সুশান্ত সরকার—ইনি আপনার মেয়ে ?

হ্যাঁ, কেন ?

এ-ভাবে আর একা পাহাড়ে উঠতে দেবেন না—খুব বিপদে পড়েছিলেন।

সেকি! কি হয়েছিল ? ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়ের মুখের দিকে চেয়েও যেন ব্যতিক্রম ঠেকল কিছু।

সুশান্তই জবাব দিল, পাহাড়ের ওই ডগায় একটা উঁচু পাথরে উঠে আর নামতে পারছিলেন না--

কি সর্বনাশ! ভদ্রলোকের মুখে ত্রাস।--হ্যাঁ রে মনু, তুই তো এ-রকম করিস না কখনো! দেখ তো কাণ্ড, পড়ে গেলে হাত-পা আস্ত থাকত!

মেয়ে নিরুত্তর। বিব্রত, আবার বিরক্তও একটু। এক-পলক সে-দিকে চেয়ে সুশান্ত গম্ভীর মুখে যোগ দিল, হাত-পা কেন—পড়লে একেবারে নিচেই পড়তে হত।

অ্যাঁ! ভদ্রলোকের মুখে অস্ফুট আর্তনাদ।—কি সাংঘাতিক! তুই কেন ও-ভাবে উঠতে গেলি ? আর কক্ষনো তোকে এদিকে আসতে দেব না। বিপদ যেন এখনো কাটেনি, সুশান্তর দিকেই ফিরলেন, তারপর, নামল কি করে ?

—আমিই কষ্ট করে নামালাম।

—দেখো তো কাণ্ড, আপনি না থাকলে কি মুশকিল হত ?

মেয়ে মুখ তুলে সোজা সুশান্তর দিকে তাকাল এবার। ঈষৎ অসহিষ্ণু ঠাণ্ডা গলায় বলল, বাবাকে আর বেশি ভয় দেখানোর দরকার নেই। চল বাবা—

এগিয়ে চলল। হ্যাঁ, চলার এই ধীর আত্মস্থ ছন্দটুকুই দু'চোখ

ভরে দেখার মত। সুশান্ত আগেও তাই দেখেছে। এখনো দেখছে। চারদিকে আর কিছু দেখার নেই। ভদ্রলোক বলে উঠলেন, চললি কোথায়? বসে জিরিয়ে নে একটু—

সুশান্তর দিকে ফিরলেন, দেখুন তো, এ-রকম ছেলেমানুষি ও কক্ষনো করে না—কি যে মাথায় চেপেছিল···চিৎকার করে ডাকলেও তো শুনতে পেতাম না! আপনাকে ধন্যবাদ।

সুশান্ত সবিনয়ে জবাব দিল, আমি ছেলের বয়সী, এ-রকম বললে লজ্জা পাচ্ছি।

ভদ্রলোক খুশি।—বেশ বাবা, কি নাম যেন বললে—সুশান্ত? থাকো কোথায়?

ভদ্রলোকের মনু অদূরে আবার বাপের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে গেছে। এদিকেই চেয়ে আছে। চোখাচোখি হতে আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে নিল। সুশান্ত জবাব দিল, দেওঘর।

—দেওঘর? সেখানে থাকো, না বেড়াতে এসেছ?

—বেড়াতে।

—বেশ, তুমি কিসে এসেছ—ওই তো টাঙ্গা দেখছি, আচ্ছা, ওটাকে বিদেয় করে এস, আমরা ট্যাক্সিতে এসেছি—একসঙ্গে গল্প করতে করতে যাই চল-

সুশান্ত তক্ষুনি টাঙ্গাঅলাকে ডবল বখশিশ করে বাপ মেয়ের কাছে এসে পেঁছুবার আগেই তাঁব পাশে এসে দাঁড়াল। কাছে এসে ভদ্রলোক মেয়েকে বললেন, সুশান্তকেও ধরে নিয়ে এলাম, একসঙ্গে যাওয়া যাবে—

একনজর তাকিয়েই বোঝা গেল ব্যবস্থাটা মেয়ের মনঃপূত হয়নি। কিন্তু সুশান্ত সরকার তার ধার ধারে না। যে নাটক সে সৃষ্টি করেছে, ওই মেয়ের আর অব্যাহতি নেই। খানিক আগের সেই নিবিড় স্পর্শ এখনো সর্বাঙ্গ জুড়ে আছে সুশান্তর।

শক্ত পাথুরে মাটির ওপর দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ করে ট্যাক্সি ছুটেছে। এ-ধারে মেয়ে, মাঝে ভদ্রলোক, ও-ধারে সুশান্ত। ভদ্রলোক অনর্গল কথা বলে চলেছেন।

তাঁর নাম অবিনাশ দত্ত। মেয়ের নাম গার্গী। তিনি মনু বলে

ডাকেন। একসময় ইউ. পি-র কোন এক য়ুনিভার্সিটিতে পড়াতেন —সাবজেক্ট সোসিওলজি। অনেক দিন হল অবসর নিয়েছেন। দুই ছেলে, মেয়ের বড় দুজনেই—ছেলেরা কলকাতায় বড় চাকরি করে—একজন পুলিস অফিসার, আর একজন নাম-করা কোম্পানীর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার—উইলিয়ামস টাউনের এ-মাথায় ছোট একটা বাড়ি কিনে বছর তিনেক হল এখানেই আছেন—মেয়েও তাঁর কাছেই থাকে, বুড়ো বাপকে ছেড়ে কোথাও নড়তে চায় না।

সুশান্ত সরকার মনে মনে খুশি। একটা গল্পের পটভূমি প্রস্তুত যেন। শুধু নায়ক আবির্ভাবের প্রতীক্ষা। আবির্ভাব ঘটেছে। কথা শোনার ছলে ঝুঁকে এক একবার ওই ধারের দিকে তাকাচ্ছে। নির্বাক মূর্তির মত বসে আছে, বসার ভঙ্গীটুকু শিথিল অবশ্য।··· মনু, গার্গী। গার্গী দত্ত। দুটোই মানানসই নাম। ··বয়েস ছাব্বিশ-সাতাশের কম হবে না। এখনো বিয়ে হয়নি কেন সেই কৌতূহল। ···হয়নি ভালই হয়েছে। বিপাকে পড়ে পুরুষের কণ্ঠলগ্ন হওয়াটা এই প্রথম কিনা জানে না। মুখ দেখে সেই রকমই মনে হয়, কিন্তু মেয়েদের মুখ দেখে ভিতর বিচার করার মত আহাম্মক নয় সুশান্ত সরকার। আগে করেছে। করে ঠকেছে। মরুকগে, পাহাড়ের সেই নিবিড় স্পর্শে আর এই সান্নিধ্যেও ধমনীর রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে—এটুকুই আপাতত বাস্তব সত্যি।

সচকিত হল। অবিনাশ দত্ত তাকেই জিজ্ঞাসা করছেন, কলকাতায় কোথায় থাকো।

বলল।

—চাকরি কর, না ব্যবসা?

অম্লানবদনে সুশান্ত জবাব দিল, কিছু না।

ভদ্রলোক এবারে বিস্মিত একটু। এ-বয়সের ছেলে কিছু না করে থাকে কি করে জানেন না। কিন্তু সুশান্ত নিজে থেকে আর কিছু বলল না দেখে প্রশ্ন অন্য দিকে ঘোরালেন। কলকাতায় কোথায় থাকে, কে আছে না আছে ইত্যাদি। বাবা-মা ভাই-বোন আত্মীয়-পরিজন কেউ নেই শুনে আন্তরিক মন্তব্য করলেন, তুমি তো বড়ো আনফরচুনেট হে!

একটু বাদেই আবার জিজ্ঞাসা করলেন এখানে কোথায় ওঠা হয়েছে। একলা কোন্‌ নির্জনে বাংলো নেওয়া হয়েছে শুনে চোখ কপালে তুললেন।—সেকি, ওই রাজ্যের পারে একলা একটা মালির ভরসায় থাকো! কেন, এদিকে তো কত বাড়ি খালি পড়ে আছে, ও-সব দিকে—

আরো কি বলতে গিয়ে বললেন না মনে হল। সুশান্তর শোনার আগ্রহ নেই। একটু বাদে ভদ্রলোক মেয়েকেই লক্ষ্য করলেন ভাল করে, কি রে, তুই একেবারে চুপ মেরে গেলি যে—বিপদ যখন কেটেই গেছে, ও নিয়ে আর ভেবে কি হবে।

মনে মনে সুশান্ত বলল, বিপদ কাটেনি, বিপদের সবে শুরু। প্রথমে আড়চোখে, পরে ঝুঁকেই তাকাল।...মেয়ের নির্লিপ্ত দৃষ্টি দূরের দৃশ্য দেখায় মগ্ন।

দেওঘর পৌঁছে সুশান্ত বাজারের কাছটায় নেমে গেল। অবিনাশ দত্তর সেই দিনই তাকে নিজের বাড়িটা দেখিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল। লোভের বশে শুরুতেই ভুল করার ইচ্ছে নেই, সুশান্ত সবিনয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আর একদিন যাব। দু'হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়েছে গার্গী দত্তর উদ্দেশেও। কিন্তু তখনো সে গাড়ির জানালায় কনুই রেখে আর সেই হাতের ওপর গালের একদিক রেখে রাস্তার লোক-চলাচল দেখছে।

গাড়িটা বেরিয়ে গেল। সুশান্ত সরকার সেদিকে চেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল খানিক। ভিতরের লুব্ধ অনুভূতিটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু ঠিক আগের মত বৈচিত্র্যশূন্যও নয় আবার...।

আট

কোন সুরসিক মনীষীর উক্তি, দুনিয়ার সব আইনের জোর কেবল মাত্র রমণীর গভীর একটি চাউনির কাছে বরবাদ হয়ে যেতে পারে, আর, সহস্র বিতর্কের ঝড় তুলে যেটুকু ক্ষমতা লাভ সম্ভব, একটি রমণীর চোখের জল তার থেকে বেশি ক্ষমতা ধরে।

ঠিক এই গোছের রমণী সুশান্ত সরকার কখনো দেখেছে কিনা

ভাবছিল। অনেকগুলো চেনা-মুখ তার চোখের সামনে আনা-গোনা করেছে।···চোখের জলের ক্ষমতা কিছুটা দেখেছে অস্বীকার করবে না। প্রাক্-সন্ধ্যার এক হোটেলে কাজলের চোখের জল তার ভিতরে কোথায় গিয়ে কাটা-ছেঁড়া শুরু করে দিয়েছিল জানে না। কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে গোটা মানুষটাকেই যেন বদলে দিয়েছিল।

···কিন্তু রমণীর ওই কটাক্ষ সম্পদ? না, দেখেছে বলে মনে পড়ে না। তবু মন বলছে, সে-রকম সম্পদ আছে এমন রমণীও আছে। খুব স্বল্পক্ষণের জন্য যে-রকম আভাস একবার মাত্র পেয়েছিল ত্রিকূট পাহাড়ে। নিরাপদ অবতরণের পরেও যখন ওই মেয়েকে জোর করে ধরে রেখেছিল। আধা-বিমূঢ় আধা-সংশয়ভরা গভীর দুটো কালো চোখ যখন কয়েক পলকের জন্য তার মুখের ওপর স্থির হয়েছিল··· ।

কিন্তু শুধু সে জন্যেই রমণীর ওই দুর্লভ কটাক্ষ সম্পদের অধিকারিণী ভাবছে না তাকে। তখন ওই গোছের ভাবনা-চিন্তার অবকাশও ছিল না, অতনু-সান্নিধ্যের একটা লোলুপ স্পর্শের তাপ শুধু মগজের দিকে ধাওয়া করছিল। আর তারপরে, এই দুদিনের মধ্যে সর্ব-আইন নাকচ করার মত রমণীর দৃষ্টি-বাণ সরাসরি তার মুখের ওপর বিদ্ধ হয়নি। তবু, মনীষী প্রোক্ত ওই উক্তিটা থেকে থেকে মনে এসেছে তার। মনে হয়েছে, ভদ্রলোক মিথ্যে বলেনি।

বিদ্যাপীঠের পথে পরদিন আর তার পরদিনও দেখা হয়েছে। বাবার সঙ্গে আগের মতই বেড়াতে বেরিয়েছে। মন্থর চলার ভঙ্গীটুকু চোখে আগের থেকেও বেশি মনোরম লেগেছে সুশান্তর। প্রতিটি পা ফেলার মধ্যে যেন সত্তার নির্লিপ্ত প্রত্যয়ের ছোঁয়া আছে। সুশান্তর দু'চোখ যেন থেকে থেকে এরই স্বাদ গ্রহণ করেছে।

তাকে দেখে অবিনাশবাবু খুশি, কিন্তু গার্গী দত্ত চিনতে পারার স্বীকৃতিটুকুও দিতে চায়নি। সেটা অবশ্যই আরো বেশি স্বীকৃতির নামান্তর। সুশান্ত হাসিমুখে কাছে আসা মাত্র তার গম্ভীর দৃষ্টিটা অন্যদিকে সরেছে। বিদ্যাপীঠের বিস্তৃত আঙিনায় ঢুকে অবিনাশ-বাবু বসে পড়েছেন। তাকে বলেছেন, আর হাঁটে না, বসে গল্প করি এস। অগত্যা সুশান্তকেও বসতে হয়েছে। মেয়ে বসেনি,

দূর থেকে দূরে সরে গেছে, আধঘণ্টাখানেক তেমনি সুচারু শিথিল ছাঁদে এদিক-সেদিক ঘুরেছে, এ-এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বাগান দেখেছে, ফুল দেখেছে। তারপর বাবার কাছে এসে বলেছে, ওঠো এবার, আর না।

ডেকে আর দাঁড়ায়নি। ফেরার রাস্তায় চলতে শুরু করেছে। অবিনাশ দত্তর সঙ্গে সুশান্তও উঠেছে। খানিকটা পথ এগিয়ে দিয়েছে তাঁকে। দৃষ্টিটা একবারও সামনের দিক থেকে ছিঁড়ে আনতে পারেনি। গার্গী দত্ত ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখেছে একবার। বাবার পাশে পাশে তাকে আসতে দেখে আবার একলাই এগিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা দুর্বার অভিলাষ সুশান্তর দু'চোখে জমাট বেঁধেছে। ···ঠিক এমনটাও আগে আর হয়নি যেন।

প্রমীলা-রীতি সম্পর্কে একটা ধারণা তার মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে। বলা বাহুল্য, সেটা তাদের অনুকূল নয় কিছুমাত্র।··· দুনিয়ার কোন রমণী কোন পুরুষকে ভালবাসে বলে সে বিশ্বাস করে না। অম্বর ঘোষালের প্রতি নন্দিতার আকর্ষণটাকেও সে ভালবাসা বলে ধরে নেয়নি। মোহ ভেবেছে। নন্দিতার বেলায় সেই মোহটাকে অসম্মান করতে পারেনি—এই পর্যন্ত বলা যেতে পারে। আরো পারেনি, সে সন্তান-সম্ভবা বলে।

···কিন্তু তার মতে,মেয়েরা একজন সঙ্গী বেছে নেয় অন্য কারণে। সে নিজে ভালবাসে বলে নয়, ওই বিশেষ একজনের কাছ থেকে ভালবাসা পেতে চায় বলে। আসলে ভালবাসার নাম দিয়ে এ দুনিয়ার যা-কিছু বিকোয়, তার সব-কিছুই ভালবাসে তারা। তারা ভালবাসা খোঁজে, ব্যক্তিগতভাবে কাউকে ভালবাসে না।

গত দুই একটা বছর এই ধারণা নিয়েই নির্দ্বিধায় মেয়েদের সঙ্গে মিশেছে সে। সকলেই চটকদার মেয়ে তারা, ধারণা বদলাবার মত তীক্ষ্ণ ব্যতিক্রম কারো মধ্যে দেখেনি। তাই অনায়াসে সে তাদের নিয়ে খেলা করতে পেরেছে, অপমান করতে পেরেছে। নিজের বিবেকে একটি আঁচড়ও কখনো পড়েনি, একঘেয়ে স্থূল তিক্ত অভিজ্ঞতার দরুণ অনেক সময় বরং ক্লান্তি বোধ করেছে।

সেই ক্লান্তি দূর করার জন্যেই কলকাতা ছেড়ে আসা।

তা বলে ভেতরটা বদলে যায়নি তার, মেয়েদের সম্পর্কে ধারণা বদলায়নি।···বদলালে বিবেকের আঁচড় পড়বে, বদলালে বিগত দিনের অনেক অপচয়ের চিত্র সামনে ভিড় করে আসবে, নিজের চোখে নিজেকে নিচে টেনে নামাবে।

···তাই কোন মেয়ের মধ্যে ব্যতিক্রমের আঁচ পেলে বা শুচিতার ব্যবধান দেখলে সেটা দ্বিগুণ নস্যাৎ করে দেবার ঝোঁক চাপে, লোভ জাগে, শিকারের আক্রোশ পুষ্ট হয়ে ওঠে।

ঠিক এই গোছের ঝোঁক আর লোভ আর আক্রোশ আর অভিলাষ নিয়ে বাপের পাশে পাশে মেয়েটাকে চলে যেতে দেখছে সুশান্ত সরকার।

তৃতীয় দিনে বাপকে একলাই দেখল। দেখা-মাত্র নিজের মনেই আশাভঙ্গজনিত একটা কটূক্তি করে উঠল। অবিনাশ দত্ত কথায় কথায় জানালেন, মেয়েটা দুপুরের আগেই কোথায় গেছে, বিকেলেও ফিরল না দেখে একাই বেরিয়ে পড়েছেন। বলা বাহুল্য, সুশান্তর গল্প সেদিন জমল না। আর কথার ফাঁকে অনেকবারই বিমনা দেখা গেল তাকে।

আর, তার পরের দুদিন ভদ্রলোকের দর্শনও মিলল না।··· রোজই এক জায়গায় বেড়াতে না-আসাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সুশান্ত ভেবেছে, এবারে সত্যিই তাঁর বাড়িতে গিয়ে হানা দেবে কিনা। ভদ্রলোক অনেকবার করে বলেছেন। তবু গেলে নির্বুদ্ধিতা হবে জানে।

নির্বুদ্ধিতার কাজ করেনি। কিন্তু দিনও বোধহয় এত নীরস ভাবে আর কখনো কাটেনি। চুপচাপ বসে পাহাড়ের সেই উষ্ণ ঘন স্পর্শস্মৃতি বার বার অনুভবের মধ্যে টেনে আনতে চেষ্টা করেছে। হাসি পাচ্ছে, ওই মেয়ে এটুকুই নিশ্চয় দূরে ঠেলে দিতে চেষ্টা করছে। নইলে এ-রকম ব্যবহার করবে কেন? ব্যবধান-রচনার চেষ্টা এমন স্পষ্ট হয়ে উঠবে কেন? কল্পনায় ওই মেয়েটাকে যত কাছে টেনে আনতে পেরেছে সে, সেই স্পর্শস্মৃতির মধ্যে যত বেশি ডুব দিতে পেরেছে—অস্থিতে পেশীতে স্নায়ুতে অস্থির যাতনার মত এক দুরন্ত বাসনা ততো বেশি নড়ে-চড়ে বেড়িয়েছে।···না, সুশান্ত সরকারের

এতদিনের শিকার-লীলার আসরে ঠিক এমনটি আর ঘটেনি।

পরদিন।

দুপুর থেকেই দিনটা মেঘলা। সুশান্ত বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। রাতের গাড়িতেই কলকাতা রওনা হবে কিনা ভাবছিল। এ-রকম একঘেয়ে ভাবে দিন কাটাতে আর ভাল লাগে না।···মেয়েটা ভয় পেয়েই একেবারে সরে গেল মনে হতে শিকারের নেশাও ফিকে হয়ে এসেছে। ভীতু মেয়েকে সে করুণা করতে পারে।

দূরে নন্দন পাহাড়ের দিকে চোখ যেতে হঠাৎ হৃৎপিণ্ডটাই বুঝি লাফালাফি শুরু করে দিল তার। কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকেই সবেগে ঘরে চলে এল। আধ মিনিটের মধ্যেই বেরুলো আবার। চোখে বায়নাকুলার।

তেমনি দ্রুত ঘরে ঢুকে গেল আবার। ট্রাউজারের ওপর বুশ-শার্টটা চড়াতে চড়াতে এক মিনিটের মধ্যেই বেরুলো। নন্দন পাহাড় কাছেই—কিন্তু ছুটে গিয়ে হাজির হবার মত কাছে নয়। সামনেই একটা সাইকেল-রিকশ দেখে হাতে স্বর্গ পেল যেন।

নন্দন পাহাড় লোকে বলে বটে, আসলে ওটা বড়-সড় ঢিপিই একটা। পাথর নেই, ঘাসে মোড়া। ওপরটা সমতল। সেখানে শিথিল ভঙ্গিতে বসে আছে গার্গী দত্ত। বসে নেই ঠিক। তার সামনে ফ্রেমে-আঁটা সাদা বস্তু একটা, হাতে বোধহয় রঙ-পেন্সিল। মাঝে মাঝে মুখ তুলে সামনের ঘন জঙ্গলের দিকে তাকাচ্ছে, তারপর আবার ওই সাদা বস্তুর ওপর হাত নাড়ছে।

···মনে হল ছবি আঁকছে। মেয়ে ছবি আঁকে সেই সংবাদ অবিনাশ দত্তর মুখে শুনেছিল। তিনি বলেছিলেন, মেয়ে ভাল করে বি. এস-সি পাস করার পরে তাঁর ইচ্ছে ছিল এম. এস-সি পড়ুক—কিন্তু এমনি ছবি আঁকার ঝোঁক যে কাউকে কিছু না জানিয়ে সোজা আর্ট কলেজে গিয়ে ভর্তি হয়ে এলো। বাপের মতে, তাঁর মেয়ে চমৎকার আঁকে। কলকাতার কোনো মেয়ে-স্কুলে ছবি-আঁকা শেখানোর মাস্টারিও নাকি করেছে কিছুকাল। বাবাকে একলা থাকতে দিতে চায় না বলে সব ছেড়েছুড়ে এখানে চলে এসেছে।

বায়নাকুলার লাগিয়ে সুশান্ত সরকার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখছে বুঝি। দামী বায়নাকুলার তার। রমণী অঙ্গ-সৌষ্ঠবের প্রতিটি ভাঁজ প্রতিটি রেখা নিবিড় সান্নিধ্যে টেনে আনার তাড়না দুই চোখে। না, আর তাকে শিকারের পাত্রী ভাবতে পারছে না, ভীরু ভাবতে পারছে না।

কাছাকাছি এসে রিকশ ছেড়ে দিল। পায়ে পায়ে উঠতে লাগল। একটুও কষ্ট হবার কারণ নেই –শেষ মাথা পর্যন্ত বাঁধানো ধাপ। এই টিবির ওপর শহরের জল সরবরাহের ট্যাঙ্ক বসানো বলেই সম্ভবত এই ব্যবস্থা।

··হাত পনেরো পিছনে এসে দাঁড়িয়ে গেল সুশান্ত সরকার। হাঁটু মুড়ে বসার এই রমণীয় শিথিল ভঙ্গীটুকু শুধু নয়, তন্ময়তার এমন মাধুর্যও আর বুঝি দেখেনি।···সমস্ত শরীর নিষ্কম্প স্থির। ফ্রেমে-আঁটা কাগজের ওপর শুধু রঙ-পেন্সিল ধরা হাতখানা নড়ছে মাঝে মাঝে, আর দু'চোখ থেকে থেকে একবার দূরের ঘন সবুজের দিকে উধাও হচ্ছে। ধ্যানস্থ তন্ময়তায় কেউ যেন প্রকৃতির সম্পদ আহরণ করে পুজোর উপচার সাজাচ্ছে।

এইখানে এসে একটু আগের চপলতা গেছে সুশান্তর। পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে এসেছে অনেকটা নিজের অগোচরে। আরো কাছে। তাই একটা ছায়া দ্বিগুণ বড় হয়ে ফ্রেমে-আঁটা কাগজটার দিকে এগোচ্ছে খেয়াল নেই।

ছায়াটা কাগজের ওপর পড়তে গার্গী দত্তর তন্ময়তা ভঙ্গ হল। আস্তে আস্তে ফিরে তাকাল সে।

···একেবারে পিছনে, আধ-হাতের মধ্যে সেই লোকটা দাঁড়িয়ে।

চোখের ওপর রমণীর দু'চোখ স্থির হতে সুশান্ত বাস্তবে ফিরল যেন। মুখে অপ্রস্তুতের ভাব একটু। সামান্য সরে দাঁড়াল। আর সেই মুহূর্তে ভাবল, স্নায়ুগুলো সব আশ্চর্য দখলে এই মেয়ের— চাউনিতে জড়তা নেই, মুখে একটা রেখাও আঁচড় কাটল না। ভব্যতার ব্যবধান রচনা হওয়ামাত্র মুখ ফিরিয়ে ধীরে-সুস্থে ফ্রেম থেকে মোটা কাগজটা খুলে সেটা মুড়তে মুড়তে উঠে দাঁড়াল।

সুশান্ত সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল, অপরাধ করলাম?

গার্গী দত্ত মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়াল। বেশ স্পষ্ট সুরেই জিজ্ঞাসা করল, কেন ?

আমি আসতেই ছবিটা মুড়ে ফেললেন···দেখতে দেবেন না ?

ঠাণ্ডা দু'চোখ নীরবে তার মুখের ওপর বিচরণ করল একপ্রস্থ। —দেখে কি হবে, প্রশংসা করবেন ?

প্রশংসার হলে করতাম।

জবাব না দিয়ে নির্লিপ্ত চোখের কোণে আর একবার দেখে নিয়ে সে এগোবার উপক্রম করল। অর্থাৎ প্রশংসার না হলেও স্তুতি-বাক্য শুনতে হবে সেটা যেন জানাই। এবং তাতে তার কোনরকম আগ্রহ নেই।

সুশান্ত সঙ্গ নিল। সেই পাহাড়ের মতই হাত দুটো তার নিশপিশ করে উঠল। কিন্তু আসল মূর্তি সহজ সরল সৌজন্যের প্রলেপে ঢাকতে জানে সে। বলল, সেই দিন থেকেই আমার মনে হচ্ছে আপনি ভয়ানক অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন আমার ওপর···কেন বলুন তো ?

আবার দাঁড়াল। মুখের ওপর কালো চোখের দৃষ্টিটা স্থির হল আবার।—কেন মনে হচ্ছে ?

কি জানি · ও-রকম একটা বিপদে পড়ে সেদিন আপনি ঘাবড়ে গেছলেন, আর আমিও একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু—

কি বলতে কি বলবে ভেবে না পেয়ে থেমে গেল যেন।

—ও রকম একটা বিপদ কেটে যাবার পর আলাপ-পরিচয়টা ভালই জমবে ভেবেছিলেন ?

কথার এই ভঙ্গিটা স্পষ্টই বক্র ঠেকল কানে। হাসিমুখে বিব্রত ভাব ফুটিয়ে জবাব দিল, খুব না হোক একটু-আধটু আলাপ-পরিচয় হওয়াটা খুব অস্বাভাবিক ভাবিনি।

—একটু-আধটু আলাপ বাবার সঙ্গে হয়নি ?

—তিনি নমস্য, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে বলেই আমার লোভ বেড়েছিল -

জবাব না দিয়ে গার্গী দত্ত লোভটা কিসের তাই যেন দেখছে।

সুশান্ত সামলে নিল তাড়াতাড়ি। বলল, আপনাকে খোলাখুলিই

কথাটা জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলাম, কিন্তু ক'দিন আপনার দেখাই পাইনি। আজ ছবি মুড়ে ফেলতে দেখে স্পষ্টই বুঝছি সেদিনের ব্যাপারে আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন···

মুখের ওপর রমণীর কালো চোখের দৃষ্টিটা এবারে খরখরে হয়ে উঠতে লাগল। মুখখানা কমনীয়, কিন্তু তাতেও যেন টান ধরছে। তেমনি নির্লিপ্ত স্বরে গার্গী বলল, সেদিনের ব্যাপারের পর থেকে আমিও একটু ভাবনার মধ্যে ছিলাম।···তারপর আর একবার ওই ত্রিকূটে গেছলাম, সঙ্গে আমাদের মালী আর তার একজন আত্মীয় ছিল। দু'জনেই জোয়ান গোছের লোক।

সুশান্তর দুর্বোধ্য লাগল, কিন্তু অজ্ঞাত কারণেই ভিতরটা সচকিত একটু।—ত্রিকূটে মানে সেই ত্রিকূট পাহাড়ে ?

—হ্যাঁ।···ওই লোক দুটোকে নিয়ে সেইখানেই আবার উঠেছিলাম, যেখান থেকে পাথর দুটো গড়িয়ে গেছল। দেখছে। চোখে পলক পড়ছে না। বলল, দুটো জোয়ান লোক ওই পাথর দুটো তুলে আগের জায়গায় বসাতে ঘেমে নেয়ে গেছল।···আমি বড় পাথরটায় উঠে যাবার সময়ও ও দুটো নড়েনি, তারপরেই আপনা থেকে ও-রকম গড়িয়ে গেল কি করে ভেবে পাচ্ছিলাম না।

গোপনতার পর্দাটা এভাবে ছিঁড়ে-খুঁড়ে যেতে পারে সুশান্ত কল্পনাও করেনি। কি বলবে ভেবে না পেয়ে বলে উঠল, হনুমান-টনুমানে যদি গড়িয়ে থাকে—

এবারের নির্লিপ্ত চাউনিটা মুখের ওপর মুহূর্তের জন্য কেটে বসল বুঝি। জবাব দিল, সেটাই সম্ভব।

এগিয়ে চলল। তেমনি ঠাণ্ডা পদক্ষেপে বাঁধানো ধাপ ধরে নেমে যেতে লাগল। একবারও ফিরে তাকাল না।

···গার্গী দত্ত মিথ্যে বলেনি। যথার্থই ভেবেছে সে। অবিনাশবাবু পর্যন্ত দুটো দিন অন্যমনস্ক দেখেছেন মেয়েকে। তারপর সত্যিই লোক দুটোকে নিয়ে গার্গী দত্ত সেই পাহাড়ে গিয়ে উঠেছিল আবার। হুকুম শুনে লোক দুটো অবাক হয়েছে, আর পাথর নড়াতে গিয়ে গলদঘর্ম হয়েছে। গার্গী দত্ত যা বোঝবার বুঝে এসেছে। তারপর

থেকে সর্বাঙ্গ জ্বালা করেছে তার। পুরুষের স্পর্শ যেন দ্বিগুণ ছেঁকে ধরেছে। এযাবৎ পুরুষের দৃষ্টি দূর থেকেই উৎসুক হতে দেখেছে সে। সাহস করে কেউ কাছে ঘেঁষেনি।···এ-রকম দুঃসাহস সে কল্পনাও করতে পারে না। অথচ সে যা দেখেছে আর যা ঘটে গেছে, সেটা কল্পনা নয়, নগ্ন সত্যি।

সুশান্ত সরকার সেইখানেই দাঁড়িয়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা গেল ওই রমণীমূর্তি, দেখল। তারপর নেমে এলো একসময়। হেঁটেই বাংলোয় ফিরল। সামনের বারান্দার চেয়ারে বসে রইল। ভিতরে ভিতরে নখ-দন্ত বার করা দুটো থাবা চাটছে সেই থেকে। কিন্তু শুকনো থাবা। আহত শিকার নেই সামনে। খেয়ালের বশে নয়, বৈচিত্র্যের আশায় কলকাতা ছেড়েছিল সুশান্ত সরকার। দিন কতকের জন্য প্রবৃত্তির লাগাম টেনে ধরে রাখতে চেয়েছিল। ওই ছেদটুকুই বৈচিত্র্য, ওটুকুই আবার নতুন প্রেরণার ইন্ধন যোগাবে ভেবেছিল। ফল বিপরীত দাঁড়াল। মনে হল এতদিনই বরং প্রবৃত্তির ওই লাগাম তার দখলে ছিল। এখানে এসে এই প্রথম তার বল্গা ছিঁড়েছে।··· এতদিনই বরং ভিতরটা তার উপবাসী ছিল, এই প্রথম সে ক্ষুধার স্বাদ অনুভব করল। রমণীদেহ-গ্রাসে এমন নিষ্ফল আগুন শিরায় শিরায় আর বুঝি কখনো এভাবে ওঠা-নামা করেনি।

এই অশান্ত ভাবটা কেটে গেল খানিকক্ষণের মধ্যেই। চেষ্টা করতে হয়নি, নিজে থেকেই গেছে। ওই ঢিবিতে বসে ছবি আঁকার সেই স্থির তন্ময় মূর্তি তার নিভৃতের দু'চোখ দখল করে বসছে। নির্নিমেষে সুশান্ত সরকার এবার তাকেই দেখছে। অচপল অচঞ্চল শান্ত মৌন পটে-আঁকা মূর্তি একখানা। জীবন্ত মূর্তি। সৃষ্টির গভীরে সমাহিত।

তক্ষুনি অনুভব করেছে সুশান্ত সরকার, এই প্রথম অনুভব করেছে, ওই মেয়ে অ্যাটর্নি বীরেশ্বর ঘোষের মেয়ে সুজাতা ঘোষ নয়, ড্রইংরুমের মণিকা গুপ্ত নয়, সংস্কৃতির প্রতিমূর্তি মিসেস সরখেল নয়, প্রোগ্রাম একসিকিউটিভ মালা নন্দী নয়, বিকেলের হাওয়াগাড়ির সহচরী কেতকী গাঙ্গুলী নয়, দেহবাদিনী সাহিত্যিক সবিতা চৌধুরী নয় বা ছায়াচিত্রাকাশের ভাবী তারকা মঞ্জরী

বিশ্বাস নয়।

গার্গী দত্ত আর একজন। সম্পূর্ণ আর একজন।

নিজের মধ্যে নিজে অনেকখানি সম্পূর্ণ, এমন একজন।

কিন্তু সুশান্ত সরকার কি করবে এখন? রাতের গাড়িতে কলকাতা রওনা হবে?

নয়

একটা অদৃশ্য আকর্ষণ তাকে টেনে রেখে দিল।

পাহাড়ের সেই নাটকের আড়ালের সবটুকু নগ্নতা যেভাবে ওই মেয়ে তার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে গেল, এরপর তার মত চোখ-কান-কাটা মানুষেরও আর মুখ দেখানো সম্ভব নয় মনে হয়েছে। দু'তিনদিনের মধ্যে সে-চেষ্টাও করেনি। কিন্তু কোন মেয়েকে দেখার সর্বক্ষণের এমন তাড়নাও আর বোধহয় অনুভব করেনি। এই তাড়নার মধ্যে গ্রাসের ব্যভিচারী বাসনা ছিল না বললে ভুল হবে। বরং বেশি ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো কিছু ছিল যা তাকে তিনদিনের মধ্যে এই বাংলো ছেড়ে নড়তে দেয়নি।

···একটা মেয়ে বাপের পাশে পাশে পথ চলে যখন, সেই মন্থর চলার ছাঁদের স্পর্শে নির্জন পথটার শ্রী ফিরে যায় যেন।

···দূরের ওই টিবির ওপর বসা সেই মেয়ের সুষ্টিব নিশ্চল তন্ময়তার চিত্রটা কতবার যে বিমনা করেছে সুশান্ত সরকারকে, ঠিক নেই।

দিনের আলোয় সবে সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে। দু'দিন ঘরে বসে থাকার পর আজও বাইরে বেরুবার জন্য ভেতরটা উন্মুখ হয়ে ছিল সুশান্তর। বেরুলে ছটফটানি কমতে পারে, তৃষিত দু'চোখের বাসনা ঠাণ্ডা হতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একজনের সঙ্গেও দেখা হবেই। গার্গী দত্তর বাবার সঙ্গে। সেখানেই বাধা। নয়তো সুশান্ত ছুটেই বেরুতো। যা ঘটে গেছে তার পরেও সামনে গিয়ে দাঁড়াত। শুধু এই প্রতীক্ষাটুকু নিয়েই এখনো এ জায়গায় পড়ে

আছে কিনা জানে না।

এত দূর থেকেও উইলিয়ামস্ টাউনের বেঁকানো রাস্তাটা দেখা যায়। এই বাংলোয় দাঁড়িয়েই বিকেলে পাশাপাশি দুটি মূর্তির আভাস পায়। বাইরে বেরুবার জন্য সুশান্তর বুকের ভেতরটা তখনই সব থেকে বেশি লাফালাফি করতে থাকে। কিন্তু মেয়ের কাছ থেকে তার স্বরূপ জানার পর ভদ্রলোকের অভ্যর্থনা কল্পনা করেই আর এগোতে পারে না।

সন্ধ্যার এই পূর্বক্ষণে সামনের বারান্দায় সুশান্ত সেতার নিয়ে বসেছিল সেদিন। ঠিক বাজাবে বলে বসেনি, কিছুই ভাল লাগছিল না, তাই ওটা টেনে নিয়েছিল। কিন্তু কখন বাজনার মধ্যে ডুবে গেছে হুঁশ নেই।

তন্ময়তার সেই গভীর থেকে একসময় মুখ তুলে দেখে বাদামের গেটের সামনে কারা দুজন দাঁড়িয়ে। নিমেষের জন্যে স্তব্ধ সে। টান-ধরা আলোয় মুখ একটু অস্পষ্ট দেখা গেলেও চিনতে একটুও সময় লাগল না। সেই কটা মুহূর্তের মধ্যে সুশান্তর মাথার ভিতরে কি যে ঘটতে লাগল সে নিজেও জানে না। ক'টা নিমেষের ছেদ দ্বিগুণ ভরাট করে সেতারের তার হঠাৎ ঝমঝমিয়ে উঠল আবার। সুরের জাল ফেলে ফেলে দুটি প্রাণীকে কাছে টেনে আনার জন্য হাতের আঙুল এমন আকুলি-বিকুলি আর বোধহয় কখনো করেনি। সুর ছড়িয়ে ছড়িয়ে সে যেন আহ্বান করছে তাদের।

সুরে সাড়া মেলে। মিলল। গেট ঠেলে পায়ে পায়ে এদিকেই আসছে তারা। মনে হল মেয়ের হাত ধরে একরকম জোর করেই টেনে নিয়ে আসছেন ভদ্রলোক। তাঁর মুখে খুশি, চোখে নীরব বিস্ময়। এই সবটাই যেন তাঁরই আবিষ্কার।···আর যা দেখছে আর যা শুনছে তার জন্য বুঝি প্রস্তুত ছিল না ওই মেয়েও।

সুশান্ত সরকার বাজনা থামায়নি। থামাবার উপায় নেই যেন। তন্ময়তার আরো দ্বিগুণ গভীরে ডুবে যেতে চায় সে। ওই নন্দন টিবিতে রমণীয় শিল্প-রচনায় যে তন্ময়তা দেখেছিল তার থেকেও গভীরে ডুব দিতে চায়। দু'চোখে সেই তন্ময়তার আবেশ মাখিয়েই ইশারায় বসতে বলল তাদের। তারপর সুরের ওঠা-নামার ভিতর

দিয়ে এক গভীর প্রশান্তির মধ্যেই যেন তলিয়ে যেতে লাগল সে।

প্রদোষের আলাপে আলাপে 'শ্রী' রাগের ক্ষিতিপাল মূর্তিটি এখন স্পষ্টতর হয়ে চোখে ভাসছে তার। তেজদৃপ্ত শ্রী চিরযৌবন অথচ কমনীয় সুন্দর—ষড়জাদি সাত-স্বর তার সেবায় নিয়োজিত। শৌখিন বিলাসী শ্রী-রাগের সুরে সুরে সুন্দরের পথে বিচরণ। সেই সুর বীর-রস ব্যঞ্জক অথচ শান্ত-সমভাবে আত্মস্থ, কঠোর। কিন্তু তারই মধ্যে উদার কোমলের স্পর্শ। হৃদয়ের নিভৃতের সঙ্গে তার নিবিড় যোগ। পার্থিব আর অপার্থিব দুটি চরম সীমায় পেঁছে ওই দুইয়ের মাঝে কেউ বুঝি এক সামঞ্জস্যের বার্তা পেঁছে দেওয়ার ধ্যানে মগ্ন। বীর-রসের সঙ্গে করুণ আর শান্ত-রসের সমন্বয়ে সাম্য মৈত্রী কল্যাণ আর শান্তির প্রতীক রাগরাজ শ্রীর আবির্ভাবে এক শান্ত উদার স্তব্ধতায় বাতাসও বুঝি ভরে উঠেছে।

অবশেষে বিলয়ের তটে পেঁছল সুশান্ত।

আর, তারও খানিক বাদে ওই প্রশান্ত স্তব্ধতার গভীর থেকেই যেন উঠে এলেন অবিনাশ দত্ত। বললেন, তুমি এত বড় একজন গুণী এ তো ভাবতেও পারিনি।

সুশান্তর তন্ময় দু'চোখ তাঁর মুখের ওপর উঠল একবার, তারপর পাশ্বর্বর্তিনীর দুটি চোখের ওপর মিলল। গার্গীর চোখে-মুখেও নীরব চাপা বিস্ময়, যে লোকটাকে মাত্র দুদিনের দেখায় সে মর্মে মর্মে চিনেছে, এ সেই লোক কিনা তাই যেন দেখছে।

অবিনাশ দত্ত খুশিতে আটখানা হয়ে বললেন, আমি অবশ্য গানবাজনা তেমন বুঝিনে, মনু দিনকতক গানের চর্চা করেছিল, ও যা গুনগুন করে তাই শুনি—কিন্তু আজ একেবারে কান-মন ভরে গেল। কি বাজাচ্ছিলে বল তো?

—শ্রী। গার্গীর দিকে তাকিয়ে সুশান্তর মনে হল, শ্রী'র ভাব-মূর্তি সে চেনে, শুধু ওই মূর্তি এই একজনের হাতে কি.করে রূপ পেল তার চোখে-মুখে এখনো সেই বিস্ময়।

অবিনাশ দত্তর সরল উচ্ছ্বাস বাড়ছেই, বললেন, তুমি এমন একজন ওস্তাদ বাজিয়ে অথচ আলাপ করে আমরা ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি। আজ বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ এদিকে এসে পড়ে বাজনা

কানে আসতে আমরা অবাক। মেয়ের দিকে তাকালেন, দেখ্, তার পরেও তো তুই আসতে চাইছিলি না, আমি জোর করে ধরে নিয়ে এলাম বলে—না এলে শুনতে পেতিস ? তক্ষুনি কি মনে পড়তে সুশান্তর দিকে ফিরলেন, খুশির অনুযোগের সুরে বললেন, তুমিও তো কম খাবাপ লোক নও দেখি—সেদিন পাহাড় থেকে ফেরার সময় জিজ্ঞাসা করলাম, কি কবো—স্রেফ বসে দিলে, কিছু না।

সুশান্তব গা বেয়ে যেন একটা অস্বস্তির বোঝা নেমে যাচ্ছে। বলেনি···ওই মেয়ে তাহলে তার বাপকে এখনো কিছুই বলেনি। আর তক্ষুনি মনে হল, শুধু এই মেয়েব পক্ষেই কিছু না-বলা সম্ভব। না-বলার কারণ নিয়ে অনেক লোভনীয় চিন্তার বিস্তাব ঘটানো যেতে পারে। কিন্তু সেটা অবকাশসাপেক্ষ। ওই চিন্তার দূতেরা অপেক্ষা করুক। মৃদু হেসে জবাব দিল, সেদিন ওই একটাই সত্যি কথা বলেছিলাম।

কিছু না বুঝেও অবিনাশ দত্ত হা-হা করে হেসে উঠলেন।

- বসুন একটু।

চকিতে কি মনে পড়তে সেতারটা নিয়ে সুশান্ত ভিতরে চলে এলো। সেতার রাখতে আসেনি। তার ঘর দেখতে ভদ্রলোক যদি ভিতরে ঢুকে পড়েন, অবাঞ্ছিত কিছু চোখে পড়বে। টেবিলের ওপর থেকে মদের বোতলটা স্যুটকেসে ঢুকিয়ে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে হাঁক শোনা গেল, খুশির আতিশয্যে তাব নামটাই ভুল কবে ফেললেন ভদ্রলোক। চেঁচিয়ে বললেন, ওহে সুকান্ত, ভিতরে আবার কি করছ, আমরা এখন চা খাব না কিন্তু—

বাইরে এসে তাঁর আরো সামনে চেয়ার টেনে বসতে বসতে সুশান্ত বলল, আমার নাম সুশান্ত।

ভদ্রলোক অপ্রস্তুত। -দেখেছ কাণ্ড, ক'দিন দেখা হয়নি, তার মধ্যে ভুলে মেরে দিয়েছি। বয়েস তো হ'ল, ভুল হয়ে যায়—

সুশান্ত সবিনয়ে বলল, ভুল হবে না এরকম একটা নামও আমার আছে, কিন্তু সেই নামে ডাকা শক্ত।

—কি বল তো ?

—হনুমান।

মুখে বা জবাবের সুরে রসিকতার লেশমাত্র ছিল না সুশান্তর। গম্ভীর দু'চোখ একবার তার দিকে ফিরিয়ে গার্গী দত্ত অন্য দিকে তাকাল। আর অবিনাশবাবু বারান্দা সরগরম করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, খাসা নাম! না, ওই নামে ডাকতে পারব না— ছেলেবেলায় খুব দুষ্টু ছিলে বুঝি তুমি?

হাসিমুখে জবাব এড়িয়ে সুশান্ত জিজ্ঞাসা করল, চা দেবেই না? উনি তো খেতে পাবেন··· ।

ইঙ্গিতে মেয়েকে দেখাল। অবিনাশবাবু মাথা নাড়লেন।—না, ও-ই তো বলল, চায়ের জন্যে গেল বোধহয়, বারণ করো –

বাবাকে নিয়ে এইরকম ঝামেলায় পড়তে হয় মেয়ের। অন্য পরিস্থিতি হলে হেসে ফেলত। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল এবার—

হ্যাঁ, অন্ধকার হয়ে গেল, এদিকটায় আবার—

বলেই থমকালেন একটু। সুশান্তকে বললেন, এই নির্জনে তুমি একা পড়ে আছ কেন? আমাদের ওদিকে তো কত বাড়ি খালি পড়ে আছে, এদিকটায় তেমন—

পাছে ভয় পায় এই জন্যেই বোধহয় শেষ করলেন না কথাটা। সুশান্ত চট করে ঘরে ঢুকে বড় টর্চটা নিয়ে বেরিয়ে এলো, চলুন এগিয়ে দিই—

অন্ধকার পথে পাশাপাশি তিনজন চলতে লাগল। দু'ধারে দু'জন, মাঝে অবিনাশ দত্ত। তিনি বললেন, চা তুমি এবারে আমার বাড়ি গিয়ে খাবে, কবে আসছ বল—

সুশান্ত নিস্পৃহ জবাব দিল, দেখি—

—দেখি মানে! অনেক দিন ফাঁকি দিয়েছ তুমি, কি রে মনু, তুই যে কিছু বলছিস না?

মনু এবারও নীরব। ভদ্রলোকের বিস্ময়ের উদ্রেক না হয় এই জন্য সুশান্তই কথার রাশ টানল তাড়াতাড়ি। বলল, আমার বাজনার আপনি যত প্রশংসাই করুন, ও'র বোধহয় তেমন ভাল লাগেনি।

—না লেগে পারে, হ্যাঁ রে মনু?

ও ধার থেকে আবেগশূন্য খুব স্পষ্ট জবাবই শুনল এবার।— বাজনা খুব আশ্চর্যরকম ভাল লেগেছে বাবা।

জবাবের বক্র ব্যঞ্জনাটুকু যার উপলব্ধি করার সে-ই করল শুধু। অন্ধকারে চোখ দুটো তার পাশের দিকে নির্লজ্জভাবেই অবাধ্য হয়ে উঠেছে থেকে থেকে। ত্রিকূট পাহাড়ের সেই উষ্ণ স্মৃতি ভিতরে ভিতরে সজীব করে তুলতে চাইছে।

অবিনাশবাবু বললেন, শুনলে তো, আমারই এত ভাল লাগল, ওর ভাল লাগবে না। কোন কথা শুনব না, বোস একবার করে আমাদের ওখানে আসতে হবে তোমাকে, আর সেতারও অবশ্য সঙ্গে আনবে-নইলে বাড়ি তো চিনেই গেলাম, আরো লোক জুটিয়ে নিয়ে এসে হামলা করব।

কথায় কথায় বিদ্যাপীঠের চত্বরে এসে দাঁড়াল সকলে। এদিকটায় আলো আছে। মিশনের এক চেনা সাধুর সঙ্গে দেখা হতে হাসিমুখে অবিনাশ দত্ত তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। এমনি কোন সুযোগের প্রতীক্ষায় লালায়িত হয়ে উঠেছিল সুশান্ত। ··হাত পাঁচ-সাতেকের ব্যবধান রচনা করে বাপের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে গার্গী দত্ত। বাসনার তাপ মুহূর্তে নিভৃতে চালান করে সুশান্ত শান্তমুখে ব্যবধান লঙ্ঘন করল। স্পষ্ট নিরুত্তাপ গলায় জিজ্ঞাসা করল, আপনার বাবা বার বার করে বাড়িতে যেতে বলছেন, আমি কি করব?

গার্গীর ঠাণ্ডা দৃষ্টিটা একেবারে তার চোখের ওপর এসে স্থির হল। এমন নিঃসঙ্কোচে আর কোন মেয়ে তাকে দেখেছে মনে হল না। জবাব দিল, বলা একটু শক্ত নয়?

সুশান্ত অম্লানবদনে সায় দিল, খুব শক্ত।

—তাহলে সেটা মনে রেখেই আসবেন।

এই আসতে বলাটা আর যাই হোক আমন্ত্রণ নয়। সুশান্ত তা আশাও করেনি। এই মেয়ের পক্ষে আমন্ত্রণ জানানো সম্ভব নয়। বাপের আগ্রহেরই মর্যাদা দিল শুধু, আর সেই সঙ্গে বুঝিয়ে দিল তার দিক থেকে সে অভিপ্রেত কেউ নয়।

তবু বাতাসে সাঁতার কেটেই অন্ধকারে বাংলোয় ফিরল সুশান্ত। হাতের টর্চ জ্বালার কথাও মনে থাকল না। দিনটা আজ এই রূপ

আর এই রঙ নিয়ে হাজির হবে কল্পনাও করেনি।

···গার্গী দত্ত। গার্গী···। এ নাম ওই গোছের মেয়েকেই যেন ভারী মানায়। এই নামের সঙ্গে কেমন যেন গভীরতার যোগ আছে। কঠিন নয়, আবার কাদা-মাটির মত নরমও নয়। সুশান্ত মনে করতে চেষ্টা করল কি? মনে পড়ল। পৌরাণিক ভারতের ঋষিকন্যা ব্রহ্মজ্ঞা বিদুষী গার্গী - জনক-সভায় তর্কযুদ্ধে ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্কের স্মরণীয়া প্রতিদ্বন্দ্বিনী এবং পরে তাঁর সহধর্মিণী। ভাবতে অদ্ভুত ভাল লাগছে সুশান্তর। মিল খুঁজতেও। যা ঘটে গেছে, গার্গী দত্তর তারপর একটুও সদয় ব্যবহার করার কথা নয় তার সঙ্গে, করেওনি। এক-ধরনের বলিষ্ঠ কঠিন ব্যবধানে নিজেকে সংযত রেখেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও একবারও কমনীয়তাশূন্য মনে হয়নি তাকে।

ভেবেই চলেছে সুশান্ত সরকার।···বয়েস তো কম হয়নি, বিয়ে কেন হয়নি এখনো? কত হবে বয়েস? মরুকগে, মেয়েদের বয়েস যেমন দেখায়, তেমন। কেমন দেখায় ভাবতে গিয়ে চোখের কোণে লোভ চিকিয়ে উঠছে।···বিয়ে হয়নি, না করেনি? তক্ষুনি ধরে নিল বিয়ে না হওয়া বা না করার মধ্যে হৃদয়ের ব্যাপার বা হৃদয়-বিদারক ব্যাপার কিছু না থেকে যায় না। নিকুচি করেছে। থাক বা না থাক, শিকারে নেমে এই সব ছেঁদো ব্যাপার কবে আবার সে সম্ভ্রমের চোখে দেখেছে। অন্ধকারে দু'চোখ আবার চকচক করে উঠল তার। এবারে শিকারের মত শিকারেই নেমেছে সে। দেখা যাক।

অথচ পরদিন আবার তাকে কাছে দেখার সঙ্গে সঙ্গে অন্তত এই শিকারের নগ্নতাটুকুই শুধু একবারও মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিল না। সন্ধ্যার পরেই সেতার কাঁধে সাইকেল-রিকশয় চেপে যথাস্থানে হাজির।

অবিনাশ দত্ত খুশিতে আটখানা। আশপাশের বাড়ির আরো জনাকয়েক ভদ্রলোককে এনে জড়ো করেছেন তিনি। এখানে মস্ত এক শিল্পী আবিষ্কারের কৃতিত্ব মোটামুটি তাঁর।

সেই কঠিন অথচ কমনীয় ব্যবধান থেকে গার্গীর আতিথ্যে ত্রুটি ঘটেনি। আজ সন্ধ্যায় এই আসর বসবে তার যেন জানাই ছিল। চাকরের হাত দিয়ে সকলকে চা দিয়েছে, খাবার দিয়েছে। তারপর

বেশ তফাতে একটা মোড়া টেনে নিয়ে বাজনাও শুনতে বসেছে।

আর, শুধু এই একজনকে লক্ষ্য করেই সঙ্গীতের এক অতলস্পর্শ গভীরে নিজেকে বিলীন করে দিতে চেয়েছে সুশান্ত সরকার। একটু একটু করে সেই গভীরেই ডুবতে পেরেছে। ইমনের মর্যাদা-গম্ভীর রঙ-রস-মাধুর্যের স্পর্শ ছড়িয়ে ছড়িয়ে সঙ্গীত-লক্ষ্মীর স্তব চলেছে যেন। সুরের বিস্তারে, খরজের গমকে, গান্ধার থেকে নিখাদের বিস্তীর্ণ মীড়ের সূক্ষ্ম আবেদনে সেই স্তব মূর্ত হয়ে হয়ে ঘরটা ভরাট করে দিচ্ছে।

…স্তব শেষ হল একসময়। কিন্তু তার রেশ ঘরের বাতাসে খানিকক্ষণ থেকেই গেল।

দেখা গেল ঘরের মধ্যে আর বাইরেও আরো অনেকে দাঁড়িয়ে গেছে। কেউ তাদের ডাকেনি, সুর তাদের টেনে এনেছে। অবিনাশবাবুর বন্ধুরা প্রশংসা করলেন, আর উৎফুল্ল মুখে ভদ্রলোক নিজে বার বার মাথা ঝাঁকালেন। শেষে আবার বাজাবার অনুরোধ।

কিন্তু কারো প্রশংসার দিকেই লক্ষ্য নেই সুশান্ত সরকারের। লক্ষ্য একদিকে, শুধু একজনের দিকে। সুরের মায়া একটি রমণীর অন্তস্তল কতখানি ছুঁয়ে গেছে, তাই শুধু জানার আগ্রহ। দেখার আগ্রহ। ছুঁয়ে গেছে মনে হয়। ইচ্ছেয় হোক বা অনিচ্ছেয় হোক, সুরের তন্ময়তা থেকে ওই মূর্তিও অব্যাহতি পায়নি।

আবার বাজাবার অনুরোধ আসতে সামান্য হেসে সেতার টেনে নিল সুশান্ত সরকার। নিজেব মনেই বলল, তবলা ছাড়া খুব সুবিধে হয় না। তারপর মুখ তুলে সোজা গার্গী দত্তর দিকে তাকালো। দৃষ্টি গভীর। সেতারের তারের উপর আঙুল নড়ে উঠল বার দুই। বলল, সন্ধ্যারাগিণী গৌরী।

দৃষ্টিটা তারপর আস্তে আস্তে অবিনাশবাবুর দিকে ফিরিয়ে রাগ-বর্ণনা শেষ করল। বলল, গৌরী শ্যামবর্ণা, তরুণী। তাঁর দু'কানে শোভা পাচ্ছে রসাল মুকুল, ভ্রমরকুল তাই মধুর গন্ধে আত্মহারা হয়ে তার চারদিকে গুনগুন শব্দ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে তারা পাচ্ছে, তবু আরো বেশি করে পেতে চাইছে।

রাগিণীর রসালো বর্ণনা শুনে সকলে খুশি। গার্গীর মুখের

লালচে আভাস তারা লক্ষ্য করল না। সরাসরি আবার তার মুখের দিকে তাকানোর মত নির্বোধ নয় সুশান্ত সরকার। বর্ণনার স্তুতি যথাস্থানে পেঁছেছে এ-সে ভালই জানে।

এ বাজনাটা গোড়া থেকেই জমে উঠল। ছন্দে ছন্দে রস উপচে উঠতে লাগল যেন। অনেকেরই মনে হল মূর্তিমতী তরুণী রাগিণীর তালে তালে নানা ছাঁদে পা ফেলে এক সুর-ললনা বাগিচায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর গুনগুন গুনগুন শব্দে ভ্রমরকুল তাকে ঘিরে আছে। নানা ঝঙ্কারে তরুণী রাগিণীর কখনো বিরক্তি, কখনো মিনতি, কখনো কপট ক্রোধ -তারপর হাল-ছাড়া গা-ভাসানো মিতালি।

এ বাজনা শেষ হতে সকলে উৎফুল্ল মুখে বাঃ-বাঃ করে উঠল। কিন্তু সেদিকে কানও নেই চোখও নেই সুশান্তর। সে দেখল গার্গী সকলের অলক্ষ্যে নিঃশব্দে মোড়া ছেড়ে পাশের ঘরে চলে গেল। সুশান্ত হাসছে অল্প অল্প। সেই হাসির মধ্যে ভারী একটা প্রসন্নতা ছাড়া আর যে কিছু নেই তাও অনুভব করেছে।

বাইরের লোক সব বিদায় হতে অবিনাশ দত্ত একগাল হেসে দরাজ গলায় বললেন, খুব আনন্দ পেলাম আজ, একেই বলে গুণী। আরো বাজাতে বলতুম, কিন্তু রাত হয়ে গেল, যে জায়গায় থাকো···

সুশান্তর উন্মুখ দৃষ্টি ভিতরের ঘরের দিকে। বলল, তাতে কি, কেউ একটা রিকশ ডেকে দিক

—হ্যাঁ। চাকরকে ডাকতে গিয়ে আবার কি মনে হল তাঁর। হাঁক দিলেন, মনু, ও মনু—!

সুশান্তর মনে হল, মেয়েকে ডেকে ভদ্রলোক যেন তার অব্যক্ত প্রার্থনাই মঞ্জুর করলেন একটা। মেয়ে দু-ঘরের মাঝের দরজায় এসে দাঁড়াল।

ব্যস্ত-সমস্ত মুখ করে অবিনাশবাবু বললেন, হ্যাঁ রে, রাত হয়ে গেল, সুশান্তকে অতক্ষণ ধরে কষ্ট দিলুম, এর পর ফিরে গিয়ে মালীর হাতের কোন্ খোট্টাই খানা জুটবে কে জানে। আমাদের তো এ-বেলা মাংস, ও এখানেই খেয়ে যাক না—কুলোবে না?

বাপের দিকে চেয়ে আর তাঁর কথা শুনে মেয়ের ঠোঁটের ডগায়

হাসি ভাঙতে দেখল সুশান্ত। জবাব দিল, কুলোবে, তাহলে আর দেরি না করে তোমরা মুখ-হাত ধুয়ে নাও।

…তোমরা। এই 'তোমরা'র সুশান্ত একজন। তারও কানে কি সুর বাসা বেঁধেছে আজ।

অনুমোদন মিলতে অবিনাশ দত্ত খুশি এবং নিশ্চিন্ত।—তাহলে আর কি, একেবারে খেয়েই যাও—আমার চাকর রিকশয় করে তোমাকে পেঁছে দিয়ে আসবে'খন।

এমন প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করার ইচ্ছেও নেই, সাধ্যও নেই। একটু সৌজন্যের খাতিরে সুশান্ত হেসে জবাব দিল, তার দরকার হবে না, এর থেকেও অনেক বেশি রাতে আমি ফিরি। কিন্তু মিছিমিছি ওঁকে আবার এই মুশকিলের মধ্যে ফেললেন…

মুশকিল আবার কি, গল্প করতে করতে একসঙ্গে খাব—

পরক্ষণেই খাওয়ার প্রসঙ্গ ভুললেন ভদ্রলোক। দেখেন, সুশান্ত দেয়ালে টাঙানো একটা বাঁধানো ছবি দেখছে মন দিয়ে। ছবিটা যে ভাল লেগেছে তার মুখ দেখেই বোঝা যায়। বিষয়বস্তু খুব সাধারণ। ছবির একদিকে অভিজাত মেয়ে-পুরুষদের আনন্দ-কোলাহল—তাদের ছেড়ে অন্য দিক ঘেঁষে পা ফেলে এগিয়ে আসছে নিঃসঙ্গ একটি মানুষ—নিজের মধ্যেই পরিপূর্ণ, আনন্দমগ্ন। এই মানুষটি স্বয়ং অবিনাশ দত্ত।

সানন্দে এবং সাগ্রহে অবিনাশবাবু বলে উঠলেন, সুন্দর না? মেয়ের কাণ্ড, ও এইরকমই ভাবে ওর বাবাকে। আগ্রহ দ্বিগুণ বাড়ল হঠাৎ, দাঁড়াও, তুমি যেমন গুণী মানুষ, তোমাকেও দেখাই কিছু, এসো—

তাকে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকতেই গার্গী বাধা দিতে চেষ্টা করল। বলল, তোমাকে এখন আর মেয়ের হয়ে গুণের পাল্লা নিয়ে বসতে হবে না বাবা, খাবে এসো—

—দাঁড়া না, এসো সুশান্ত, নিজের বিদ্যে ও বাক্সে ঢুকিয়ে সকলের আড়ালে রাখতে পারলেই বাঁচে। হাসিমুখে সেই ঘরের মধ্য দিয়ে আর একটা ছোট ঘরে টেনে নিয়ে চললেন তাকে। পিছন ফিরে সুশান্তর আর একবার পিছনের মুখখানা দেখার ইচ্ছে ছিল,

কিন্তু সে বোকামি আর করল না।

ছোট বড় অনেকগুলো অ্যালবাম, বাঁধানো খাতা-ভরতি ছবি। ফ্রেমে মাউণ্ট করা বড় রঙিন ছবিও আছে গোটা কয়েক। পুরু কাগজে মোড়ানো ছবিরও অভাব নেই। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য খুব একটা চোখে পড়ার মত বা অভিভূত হবার মত চটকদার কিছু নয়। পাহাড়-পর্বত, জেলেদের সমুদ্রে মাছধরা, সমুদ্র, জঙ্গল, সান-সেট, সান-রাইজ, পশু-পাখি, ফুল-বাগান, ল্যাণ্ডস্কেপ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, ছেলের দঙ্গল, মেয়ের দঙ্গল, তপোমগ্ন যোগী, এমনি কত কি। কিন্তু প্রতিটি ছবির পরিচ্ছন্নতাটুকুই যেন প্রাণ-বৈচিত্র্য। সবেতে যেন একটুখানি প্রসন্নতা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। যা দেখলে চোখ খুশি হয়, ভিতর খুশি হয়। অন্তর্নিহিত প্রসন্নতাটুকুই যেন শিল্পীর সৃষ্টি-মন্ত্র।

এই দেখার মধ্যে কোন ছলচাতুরি নেই সুশান্তর। দু'চোখ ভরেই দেখছে। এরই মধ্যে দুটো ছবি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কতবার দেখল ঠিক নেই। এ ছবি দুটোর পরিকল্পনা অভিনবও বটে।···রিক্‌শ থেকে নেমে এক মহিলা ছদ্ম-কোপে রিক্‌শঅলার দিকে চোখ পাকিয়ে চেয়ে আছে, আর আধ-বুড়ো রিক্‌শঅলা পয়সাসুদ্ধ হাতখানা তার দিকে বাড়িয়ে একগাল হাসছে। নিচে লেখা, এ কি দিলে গো মা! পরের ছবিটা আরো মজার। মোটাসোটা এক মাঝবয়সী মেছুনি সামনে পেল্লায় বঁটি নিয়ে বসে দাঁড়িপাল্লায় কাটা মাছ ওজন করছে, আর আড়ে আড়ে তার অস্থির-সংশয় ক্রেতার দিকে তাকাচ্ছে—মেছুনির দুই ঠোঁটের ফাঁকে স্নেহ আর কৌতুক ঝরে পড়ছে—মা যেন কম দেবার অছিলায় ছেলের অস্থিরতা উপভোগ করছে।

দুটো ছবির মধ্যে হৃদয়ের প্রসন্নতাটুকু যেন সব।

ছবি দেখা শেষ করে সুশান্ত জিজ্ঞাসা করল, এমন রিক্‌শঅলা আর এমন মেছুনিও আছে নাকি?

অবিনাশবাবু হা-হা শব্দে হেসে উঠলেন। তারপর তেমনি জোরেই ডাকলেন, ও মনু, সুশান্ত কি বলছে শুনে যা শিগগীর—

কিন্তু মনুর দর্শন মিলল না। অবিনাশবাবু সোৎসাহে বললেন, আমিও ঠিক এই সমালোচনাই করেছিলাম, বুঝলে। তা মনু কি

বলে জান? বলে, নেই তো, কিন্তু থাকলে কেমন সুন্দর হয় দেখো দেখি।···ওর সব আঁকার মধ্যেই ওই এক ঝোঁক, খুব খারাপও ভিতরে কত সুন্দর হতে পারে। গলা খাটো করে বললেন, মেয়েটার ভেতরটাও যে বড় সুন্দর হে।

এই সুন্দরের উপলব্ধি সুশান্ত নিজেও না-করে পারছে না। খেতে বসে মুখ তুলে এক-একবার যত দেখছিল, এই উপলব্ধিটুকু ততো বাড়ছিল।

টেবিলে তিনজনের খাবার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গম্ভীর মুখে তাদের এটা-ওটা দেবার ছলে গার্গী বসছে না। অবিনাশবাবুর সে খেয়াল নেই। খেতে খেতে তিনি একবার বাজনা আর একবার মেয়ের ছবি আঁকার প্রশংসা করে চলেছেন। সুশান্তও ইচ্ছে করে খাচ্ছেই না প্রায়। হাত গুটিয়ে একসময় মুখ তুলতে চোখ দুটো গার্গীর নীরব চোখে এসে মিলল—আপনি বসুন।

এবারে অবিনাশ দত্তর খেয়াল হল। বললেন, তুই বসতেই পারলি না এখনো! আমাদের যে হয়ে এলো, বসে পড়—

অগত্যা বসতে হল। অবিনাশ দত্ত আবার গল্প জুড়লেন। আর কথার ফাঁকে খাওয়াও শেষ করলেন। কিন্তু সুশান্ত তখনো খাবার নিয়ে নাড়াচাড়াই করছে শুধু।

অবিনাশবাবু মুখ হাত ধুতে গেলেন। এটুকু অবকাশেরই প্রতীক্ষায় ছিল সুশান্ত। খাবারের ডিশ থেকে হাত তুলে নিয়ে সোজাসুজি পার্শ্ববর্তিনীর দিকে তাকাল।—আপনার ছবিগুলো দেখার পর থেকে বার বার একটা কথা মনে আসছে।···বলব?

বাবা উঠে যেতে মেয়ে তাঁর ডিশগুলো বাঁ হাতে একটু সরিয়ে গুছিয়ে রাখছিল। নিরুত্তর। অনুমতি মিলুক বা না মিলুক, মনে যা আসছে সুশান্ত তা ব্যক্ত না করে পারল না যেন। সামান্য প্রতীক্ষার পর আবার বলল, আপনি কুৎসিতকেও এমন সুন্দর করে দেখতে পারেন, আমি সেই করুণাটুকুও পেতে পারি না?

গার্গী দত্তর নিবিড় কালো দুটো চোখের তারা এবারে তার মুখের ওপর স্থির হল। সহজ নির্লিপ্ততায় জবাব দিল, যাদের সুন্দর করে দেখি তাদের ভেতরটাও অসুন্দর নয় ভাবতে চেষ্টা করি।

জবাবের তাৎপর্য স্পষ্ট। অর্থাৎ ভেতর যাদের জানাই আছে তাদের নিয়ে কোনরকম কল্পনা করার প্রশ্ন ওঠে না। এবং সামনে যে বসে, তার ভেতরটা জানা হয়ে গেছে।

কিন্তু এই মুহূর্তে অন্তত কোন ঠেস গায়ে মাখতে রাজী নয় সুশান্ত। যা-ই বলুক, আজকের পরিবেশ মোটামুটি তার সহায়। কয়েক নিমেষ তেমনি নিষ্পলক চেয়ে থেকে আবার বলল, তাহলে আমাকে দেখে এর ঠিক উল্টো সাবজেক্টও তো পেতে পারেন, যার বাইরেটা সুন্দর কিন্তু ভেতরটা ভয়ানক কুৎসিত!

লোকটা সেই থেকে কিছুই খেল না গার্গী দত্ত লক্ষ্য করেছে। কিন্তু ভব্যতার দায়েও তা নিয়ে কিছু বলল না। তেমনি ঠাণ্ডা মুখে স্পষ্ট করেই পাল্টা প্রশ্ন করল, তা পেতে পারি, কিন্তু সে চেষ্টা কবতে যাব কেন?

অর্থাৎ, সুশান্ত সরকারকে নিয়ে তার মাথা ঘামাবার মত কোন কারণ বা অবকাশ নেই সেটাই বুঝিয়ে দিল।

কিন্তু সুশান্ত সরকার চলে যাবার পর মাথা না ঘামিয়ে পারেনি গার্গী দত্ত। বাবা শুতে যাবার পর কম করে ঘণ্টা দেড়-দুই জেগে থাকে। ছবি আঁকে, নয়তো বই পড়ে। আজ কিছুই করা গেল না।···বলতে গেলে মৌখিক আলাপের আগেই পুরুষের কামনার এমন দুঃসাহসিক পদক্ষেপ আর দেখেনি। ত্রিকূট পাহাড়ের ছলনার সেই লোলুপ নগ্নতা ভোলবার নয়। তার পরেও ওই চোখে পুঞ্জীভূত বাসনার তাপ শাণিত ছুরির ফলার মত জ্বলে-জ্বলে উঠতে দেখেছে অনেকবার। এই সাতাশ বছরের জীবনে পুরুষকে সে তফাতে রেখে এসেছে, পুরুষ তাকে সমীহ করতে বাধ্য হয়েছে। তার বিশেষ একটা কারণ আছে। নিজের দুই দাদাকে চোখে আঙুল দিয়ে কিছু দেখাতে চেয়েছিল, কিছু বোঝাতে চেয়েছিল। কিন্তু সে কারণটা পুরুষের প্রতি একেবারে ক্ষমাশূন্য হয়ে থাকার মত বড় কিছু নয়। বরং উল্টো। তার এখনো মনে মনে আশা, দাদাদের অনুতাপ হবে একদিন, সেই অনুতাপের আঁচে তারা সুন্দর হবে। বাবা মিথ্যে বলে না, সবার মধ্যে আর সব কিছুর মধ্যে সুন্দর দেখার ইচ্ছেটা এক ধরনের বাতিকই বটে তার। কিন্তু তাকেই নগ্ন

বাসনার আওতায় টেনে আনার মত অমন বেপরোয়া দুঃসাহস কোন পুরুষের হতে পারে, ও সে কল্পনাও করতে পারে না।

কিন্তু তার চিন্তার দ্বন্দ্ব ঠিক এই কারণে নয়। অমন দুঃসাহসের যোগ্য প্রত্যুত্তর সে দিতে পারে। দিয়েছে। দরকার হলে আরো দেবে। মন বলছে দরকার হবে। বাবার প্রশ্রয়ে লোকটা আরো এগোবে। কিন্তু এই বিতৃষ্ণার পাশাপাশি তার বিস্ময় অন্য কারণে। ভেতরটা যার এত নোংরা, সে এ-রকম বাজায় কি করে? তার ভেতরটা ঠিক ওভাবে জানা না থাকলে এমন এক গুণীর সংস্পর্শে এসে কত খুশি হত ঠিক নেই।···ইমনের সেই গম্ভীর মাধুর্য-ভরা স্তব এখনো কানে লেগে আছে। আর অলি-গুঞ্জনে ঘেরা রাগিণী গৌরীর আবির্ভাব এমন সজীব মূর্ত হয়ে উঠেছিল যে বাজনা শেষ হবার পরে সে সেখানে বসে পর্যন্ত থাকতে পারেনি। ঘরের মধ্যে একটা স্পর্শ যেন ছেঁকে ধরেছিল তাকেই।

এ কেমন করে হয়? ভেতরটা যার এত খারাপ, তার আঙুলে এ-রকম জাদুর ছোঁয়া আসে কি করে।

দশ

বিচ্ছিন্ন অন্ধকারে সুশান্ত সরকারের স্নায়ুতে স্নায়ুতে কামনা জ্বলে। তার বাসনার রাজ্যে এত দিনে এক সরলা রমণীর পদার্পণ ঘটেছে। সবলা, কিন্তু ভেতরটা সরস, কমনীয়। আঘাত দেবার মধ্যেও যার আচরণ অশোভন নয়, আত্মমর্যাদাবোধশূন্য নয়। তাই প্রীতি যদি আপাতত না-ই মেলে, আঘাতও লোভনীয়। সে-সুযোগ সুশান্ত নিজেই তৈরি করে দেয়।

এই লোভের দিকে এগোতে গিয়ে সেদিন এক অভাবনীয় বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেল।

ব্যাপারটা সামান্য এবং স্বাভাবিক। এখানে আশ্রম আছে কয়েকটা। তার মধ্যে একটাকে শুধু আশ্রম না বলে বেশ বড়সড় প্রতিষ্ঠান বলা চলে। সেবা শিক্ষা সংস্কৃতি আর ধর্মাচরণের ব্যাপক কর্মসূচী তাদের। অবিনাশ দত্ত আর সেই সূত্রে তাঁর মেয়ের সঙ্গেও

ওখানকার কর্ম-কর্তাদের অন্তরঙ্গ আলাপ পরিচয় আছে। ভদ্রলোক অনেকদিনের বাসিন্দা এখানকার, উচ্চশিক্ষিত অথচ নিরহঙ্কার ভালমানুষ—হৃদ্যতা থাকাই স্বভাবিক।

সৌম্য-দর্শন দুই-একজন আশ্রমবাসীকে সুশান্ত তাঁর বাড়িতেও দেখেছে। আর, অবিনাশবাবুর মুখে প্রতিষ্ঠানটির প্রশংসা শুনেছে। সমস্ত ভারত থেকে বহু ভক্ত আর সাধু-সন্ত-মোহান্তর নাকি আনাগোনা সেখানে। ধর্মাচরণের তাগিদে না হোক, সুস্থ অবকাশ বিনোদনের লোভেও অবিনাশ দত্ত মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে থাকেন। ওকেও দুই-একদিন নিয়ে যেতে চেয়েছেন। যাবে-যাবে করেও সুশান্ত এ-যাবৎ গিয়ে উঠতে পারেনি। আসলে কিছুমাত্র আগ্রহবোধ করেনি।

কিন্তু আর এড়ানো গেল না। ছোট জায়গায় শিল্পী হিসেবে এরই মধ্যে সুশান্তর নাম মন্দ ছড়ায়নি। এ-ব্যাপারে অবিনাশবাবুকেই তার প্রধান প্রচার-সচিব বলা যেতে পারে। বাজারের উদ্দেশে বেরিয়ে সেদিন সকালের দিকে সুশান্ত তাঁর ওখানে একবাব ঢুঁ না দিয়ে পারল না। বাজারে যাওয়াটা উপলক্ষ, আসল উদ্দেশ্য এইটুকুই।

গিয়ে দেখে বাবা-মেয়ের সামনে ওই আশ্রমের দুটি পরিচিত মূর্তি সেখানে বসে। ওকে দেখা-মাত্র তাদের কি যেন একটু আনন্দের কারণ ঘটল। ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে তারা নমস্কার জানালো। ওদিকে উৎফুল্ল অবিনাশবাবু প্রায় চেঁচামেচি করে উঠলেন, এসো এসো, মেঘ না চাইতেই জল —এতক্ষণ তোমার কথাই হচ্ছিল।

আড়চোখে সুশান্ত একবার মেয়ের মুখখানা দেখে নিল। সেখানে উচ্ছ্বাসের লেশমাত্র নেই। বরং একটু বেশি নিস্পৃহ যেন। হাসি-হাসি অপ্রস্তুত মুখ করে সুশান্ত জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার?

প্রসন্ন বদনে ব্যাপার বিস্তার করলেন অবিনাশবাবু? সারমর্ম, এই ভদ্রলোক দুটি তাঁর মারফৎ ওকেই আমন্ত্রণ জানাতে এসেছেন। আশ্রমের মাসকাবারী সাংস্কৃতিক উৎসবের দিন আজ— সন্ধ্যার দিকে গান-বাজনার আসর বসবে। অতএব সুশান্তকে যেতে হবে এবং বাজাতে হবে। ভদ্রলোকেরা এখানে এসেছেন অবিনাশবাবুকে ধরে

নিয়ে ওর ওখানে যাবেন বলে। কিন্তু রোদ চড়ে যাওয়ায় অবিনাশ-বাবু ওঁদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য মেয়েকে সাধছিলেন। কিন্তু মেয়ে বলছিল, কাউকে যেতে হবে না, বাবাব নাম কবে ওঁরা গিয়ে বললেই হবে। ঠিক এই সময়ে আসামী নিজেই হাজির।

মেয়ের মুখের বিড়ম্বনাটুকু সুদৃশ্য বটে। সুশান্ত ভিন্ন আর কেউ তা লক্ষ্য করল না। সুবোধ বালকের মত মাথা নেড়ে সায় দিল সে, উনি ঠিকই বলেছেন। যাব।

একটু বাদে আশ্রমবাসীরা হৃষ্টচিত্তে বিদায় নিলেন। আলাপের প্রয়াসে সুশান্তর সরল দৃষ্টি মেয়ের দিকে ঘুরল।—নেমন্তন্ন তো নিইয়ে ছাড়লেন, কি বাজাবো বলে দিন দেখি?...ধর্মের আসবে-টাসরে বাজিয়ে অভ্যেস নেই তেমন।

গার্গী জবাব দিল না। বাজানোর আমন্ত্রণ যে গ্রহণ করিয়ে ছেড়েছে এই অন্তরঙ্গ ইঙ্গিতও বরদাস্ত করার মত নয়। কিন্তু অবিনাশ দত্ত অত প্যাঁচ খোঁচের ধার ধারেন না। মেয়ের হয়ে তিনিই জবাব দিলেন, ধর্মের আসর আবার কি, তুমি যা বাজাবে তাইতেই সোনা ঝরবে, আর তাই কান পেতে শুনবে সকলে।

কিন্তু সুশান্তর কেমন ধারণা হল, সকলে শুনবে না।

ধারণাটা যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ মিলল প্রতিষ্ঠানের সান্ধ্য-আসরে এসে। বহুজনের সমাবেশে একখানি মাত্র চেনা-মুখ অনুপস্থিত। অবিনাশ দত্ত এসেছেন, গার্গী দত্ত আসেনি।

হতাশার বদলে মনে মনে নিজের বিবেচনা-শক্তির তারিফ করল সুশান্ত। আসেনি বলে ভিতরে ভিতরে খুশি বরং। ওই মেয়ে তার প্রতি সচেতন বলেই আসেনি। অন্যথায় আসত।

খানিকটা প্রস্তুত হয়েই সুশান্ত সরকার সেতার-হাতে এখানে হাজিরা দিয়েছে। দুপুরে চানের সময় মাথায় তেল ছোঁয়ায়নি। তাইতেই একটু শুকনো-ভাব এসেছে। সাদর আপ্যায়নের জবাবে প্রথমেই ঘোষণা করল, শরীরটা হঠাৎ একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে, কথা দিয়েছে বলে আসা। গোড়াতেই যদি তার প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা হয় তো একটু-আধটু বাজিয়ে যেতে পারে।

আশ্রমবাসীরা স্বভাবতই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কেউ কেউ একজন ডাক্তারও ধরে আনতে চাইলেন। সুশান্তকেই আবার সে প্রস্তাব নাকচ করতে হল। অবিনাশবাবু বললেন, নিশ্চয় বেশি রোদ-টোদ লাগিয়ে শরীরটা খারাপ করেছ।

সেটা মেনে নিয়েই এবারে ভাল মুখ করে সুশান্ত জিজ্ঞাসা করল, গার্গীদেবী এলেন না?

—না, ওরও মাথা-টাথা ধরেছে বোধহয়, নইলে আসে তো· ·

ওটুকুতেই চিন্তাচ্ছন্ন মুখ সুশান্তর।—জ্বর-টর হয়নি তো?

—কি জানি, পাছে আমি ভাবি তাই বলে না তো কিছু···তবে জ্বর-জ্বালা হলে বোঝা যেত, সে-রকম কিছু নয়।

তৃতীয় দফা বাজনা শেষ করে আবার অনুরোধ সরগরম হয়ে ওঠার আগেই সেতার-হাতে সুশান্ত সরকার উঠে পড়ল। তাড়াতাড়ি একজনকে একটা রিক্‌শ ডেকে দিতে বলল। বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছে ভেবে অবিনাশবাবু ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এলেন। সুশান্ত হেসে জানালো, কিছু না ভালই আছে।

সেতার কোলে রিক্‌শয় বসে ও মুখ টিপে হাসছিল। নাটকীয় দিন বটে একখানা। তাকে দেখা-মাত্র গার্গী দত্তর মুখখানা কেমন হবে, তা যেন তখন থেকেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে।

···কিন্তু ওপরওয়ালা কোন্ নাটকের জাল ফেলে বসেছে আর তার মধ্যে পড়ে মুখখানা কার যে দেখতে কেমন হবে জানা থাকলে সুশান্ত সরকার ধরণী দ্বিধা হতে বলত বোধহয়।

অবিনাশবাবুর বাড়ির দরজায় রিক্‌শ থেমেছে। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সেতার-হাতে নিঃশব্দে আঙিনা পেরিয়ে দালানে উঠেছে। তারপর ঠোঁটের ফাঁকে হাসি আগলে ঘরে পা দিয়েছে।

তারপরেই বিষম ঝাঁকুনি। মুহূর্তের মধ্যে নির্বাক বিমূঢ় চিত্রার্পিত যেন একেবারে। ঘরে যাকে আশা করেছিল সে আছে। তার সামনেই বসে আছে আর একজন, যাকে আশা করা দূরে থাক—এ কদিনের মধ্যে স্মৃতি থেকেই মুছে গেছল।

মঞ্জরী বিশ্বাস। আগামী দিনের উজ্জ্বলতম তারকা মঞ্জরী

বিশ্বাস। সুশান্ত সরকারের প্রযোজনায় আর তারই লেখা গল্পে নায়িকারূপে প্রস্ফুটিত হবার আশায় যে নিজের জীবনটি ধরে আছে।

তাকে এতখানি অবাক হতে দেখেই মঞ্জরী বিশ্বাস ভিতরে ভিতরে অপ্রস্তুত একটু। সে-ভাব কাটানোর চেষ্টায় মুখের পুরু প্রসাধনে অন্তরঙ্গ হাসির ফাটল ধরল।—কি আশ্চর্য! চিনতেও পারছেন না নাকি?

কলকাতায় থাকতে দুর্বল মুহূর্তের ঘনিষ্ট অন্তরঙ্গতা দুজনেরই তুমি'র পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি-বিবেচনায় এটুকু বুদ্ধি খরচ না করতে পারলে আর নায়িকা কিসের।

তবু বিস্ময় সামলাতে সময় লাগল সুশান্তর। চকিতে গার্গীর দিকে তাকালো একবার। শান্ত গম্ভীর মুখে সে তার দিকেই চেয়ে আছে।

…কি ব্যাপার! তুমি এখানে? গলার স্বরও আটকে যাবার দাখিল সুশান্তর।

লঘু চপলতায় নিজের অস্বস্তি সরল করে আনার প্রয়াস মঞ্জরী বিশ্বাসের।—কেন, এ জায়গাটা কি আপনার একলার? হাসি।—যেন কাউকে কিছু না জানিয়ে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, তেমনি জব্দ।

এই ক'টা মুহূর্তের মধ্যেই চোখ কান আর মাথা যেন তফাত হয়ে গেছে সুশান্তর, কানে যা শুনছে বা চোখে যা দেখছে তার সবটাযেন মোটামুটি এখনো মাথায় ঢুকছে না। একটু থমকে গার্গীর দিকে চোখ ফেরালো আবার।

…আপনার সঙ্গে এর আগে আলাপ-পরিচয় ছিল নাকি?

জবাবে গার্গী সহজ ভব্যতার দায়ে মঞ্জরী বিশ্বাসের দিকে তাকালো শুধু।

তার হয়ে জবাবটা মঞ্জরীই দিল, উৎফুল্ল মুখ করে বলল, আগে ছিল না, আপনার খোঁজে এসে আলাপ-পরিচয় এখন হল। ভারী ভাল লেগেছে ও'কে। আপনার মালী এ-বাড়ি চিনিয়ে দিল, এসে দেখি এখানেও আপনি নেই। বসে ও'র সঙ্গেই একটু গল্প করছিলাম।

এ-রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে সুশান্ত জীবনে পড়েছে কিনা জানে না। গার্গীর নিস্পৃহ মুখেও অস্পষ্ট বিস্ময়ের ছাপ পড়ছে লক্ষ্য করল। নিজের অগোচরে দৃষ্টিটা খরখরে হয়ে উঠছে সুশান্তর। মঞ্জরীকেই দেখছে।—আমি এখানে আছি জানলে কি করে?

নিজের হঠকারিতা বুঝতে পারছে মঞ্জরী বিশ্বাস। তাকে এখানে দেখে লোকটা যে একটুও খুশি হয়নি সেটা ভালই অনুভব করতে পারছে। তবু হেসেই জবাব দিল, সেটা আপনার ফ্ল্যাটের ভাটিয়ার কাছ থেকে নিকুঞ্জদা জেনে নিয়েছে···তিনি অনেকটা এগিয়ে গেছেন, তাই আমাকে পরামর্শ দিলেন, একবার দেখে এসো।

নিকুঞ্জদা সেই স্বল্পখ্যাত সংগীত পরিচালক, যার মারফৎ মঞ্জরী বিশ্বাসের যোগাযোগ। আর, ভাটিয়া হল সুশান্তর কলকাতার ফ্লাটের মালিক ওই বাড়িরই তিনতলার একটা ফ্ল্যাট নিয়ে নিজে থাকে। এখানে এসে সুশান্ত তার কাছে গোটা দুই দরকারী চিঠি লিখেছিল বটে, আর এখান থেকেই তার ভাড়ার চেকও পাঠিয়েছিল।

চাপা রাগে কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে বসার উপক্রম। অপরের বাড়িতে আর এক মার্জিত-রুচি মেয়ের সামনে এতটুকু অসংযত আচরণ আরো বিসদৃশ হবে, সে বিবেচনা আছে। লোভের তাড়নায় মঞ্জরী বিশ্বাস অনায়াসে এ পর্যন্ত ছুটে আসতে পেরেছে কারণ তার কিছু খোয়াবার ভয় নেই। সুশান্তর কাছ থেকে এই লোভ আর এই নিঃশঙ্কতার স্থূল প্রশ্রয় মিলেছে এতকাল। কিন্তু আজ ঘৃণায় আর বিদ্বেষে ভিতরটা একাকার হয়ে গেল তার। পাশাপাশি দুজনের দিকে চেয়ে মনে হল এই ঘর আর ঘরের বাতাসের শুচিতা নষ্ট হয়ে গেছে।

এখান থেকে এই মুহূর্তে ওকে নিয়ে সরে যাওয়াটাই একমাত্র স্বাভাবিক প্রয়াস। কিন্তু সুশান্ত সে-চেষ্টাও করল না। এখান থেকে নিজের শিকড়ও উপড়ে তোলার সামিল হবে সেটা, ধরা-পড়া আসামীর পালানোর মত হবে। গার্গী দত্ত হয়ত কিছুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করবে না বা একটি কথাও জিজ্ঞাসা করবে না, তবু আজ পালালে সুশান্ত নিজেই আর এ-মুখো হতে পারবে না। মঞ্জরী বিশ্বাসের অসাক্ষাতে পরে যে কৈফিয়তই দিক, সেটা আর

বিশ্বাসযোগ্য হবে না, বা গার্গী দত্ত তা শুনতেও চাইবে না। ব্যবধানটুকুই চতুর্গুণ স্পষ্ট করে তুলবে শুধু। সে ব্যবধান আর কোনদিন ঘুচবে না।

সেতারটা আগেই টেবিলের ওপর রেখেছিল, এবারে একটা চেয়ার টেনে বসল।···মঞ্জরী বিশ্বাসের মুখের উগ্র প্রসাধনে শুকনো ফাটল ধরেছে। ট্রেনের ধকলে ও-রকম হয়ে থাকবে। যে-জন্যেই হোক, সাদাসিধে বেশবাস পড়া আর এক মেয়ের পাশে বড় বেশি কুৎসিত লাগছে তাকে।

যতটা সম্ভব সংযত করে নিল নিজেকে।- বিকেলে এসেছ ?

—হ্যাঁ। বাতাস অনুকূল ঠেকছে না বলেই লোকটাকে নিয়ে এক্ষুনি উঠে পড়ার ইচ্ছে মঞ্জরী বিশ্বাসের। তাই যোগ করল, বেজায় ক্লান্ত লাগছে—

কিন্তু ক্লান্তির আবেদন ব্যর্থ। সুশান্ত আবার জিজ্ঞাসা করল, এভাবে হঠাৎ চলে এলে, রাত্তিরে থাকবে কোথায় ?

মঞ্জরী বিশ্বাসের দু'চোখ তার মুখের ওপর সচকিত হল মুহূর্তের জন্য। এই সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হয়নি কখনো। কিন্তু সে অভিনেত্রী তো বটে। চোখে আর গলার স্বরেও উদ্বেগ ঝরল একটু।—কেন, মেয়েদের থাকার মত এখানে ভাল হোটেল-টোটেল নেই ?

—না। এটা কলকাতা নয়।

মুখের ওপর বিড়ম্বনার ছায়াটা ঘন করে তুলল মঞ্জরী বিশ্বাস। —বড় মুশকিল হল তো।···রাতে আর ফেরার গাড়ি-টাড়ি নেই ?

—একটা আছে। খুব ভোরে কলকাতা পৌঁছয়।

অর্থাৎ ফেরত-গাড়ি ধরা ছাড়া আর গত্যন্তর কিছু নেই। কেন নেই মঞ্জরী বিশ্বাস সেটা স্পষ্টই বুঝেছে। আরো ভাল করে বুঝে নেবার জন্য দৃষ্টিটা আস্তে আস্তে পার্শ্ববর্তিনীর দিকে ফেরালো।

বোবার মত বসে থেকে গার্গী অনেকক্ষণ ধরে অস্বস্তি বোধ করছিল। তারই বাড়ি, উঠে যাওয়াটাও অশোভন।···মেয়েটিকে এখানে দেখামাত্র লোকটার হাব-ভাব-আচরণ বিসদৃশ ঠেকেছে। কৌতূহলের অদৃশ্য আঁচড় যদি কিছু পড়ে থাকে, এই কারণেই পড়েছে।

ভব্যতার দায়ে এবারে মুখ খুলতে হল। বলল, বিকেলে এসে রাতের গাড়িতে ফিরতে আপনার কষ্ট হবে। একটা রাত আপনি এখানেই থেকে যেতে পারেন, আমাদের কোনরকম অসুবিধে হবেনা।

অসুবিধে হবে কি হবে না মঞ্জরী বিশ্বাস সেটা সুশান্তর দিকে চেয়ে বুঝে নিতে চেষ্টা করল। তারপর জবাব দিল, না…ফিরেই যাব।…কিন্তু আপনার সঙ্গে দুই-একটা কথা বলে নেওয়া দরকার যে…নিকুঞ্জদাকে কি বলব না বলব…

ইঙ্গিত বোঝা-মাত্র গার্গী চেয়ার ছেড়ে ওঠার উপক্রম করল। তার আগেই বাধা পড়ল। সুশান্ত বলল, আপনার ওঠার দরকার নেই, বসুন।

যেন তারই বাড়ি, তারই ঘর এটা। মঞ্জরীর দিকে ফিরে ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত গলায় একেবারে শেষ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল সে।—নিকুঞ্জবাবুকে বোলো, আর ওসবের মধ্যে মাথা গলাবার ইচ্ছে নেই।

নেই যে মঞ্জরী বিশ্বাস সেটা অনেক আগেই টের পেয়েছে। তবু আশা।—সে কি! আপনার কাছে ভরসা পেয়ে আমরা যে অনেকটা এগিয়ে গেছি!

—আমি ভরসা কাউকে দিইনি, এগিয়ে যেতেও বলিনি! নিজের একটা চিন্তার কথা শুধু বলেছিলাম। যাক, আমি যা ঠিক করেছি শুনলে তো?

এতদিনের স্বপ্নভঙ্গের হতাশা একেবারে গিলে ফেলতে পারার মত বড় অভিনেত্রী এখনো হয়ে ওঠেনি মঞ্জরী বিশ্বাস। তবু সে-চেষ্টাই করল প্রথম। ঠোঁটে হাসি মাখিয়ে বলল, হ্যাঁ শুনেছি… চলি তাহলে এখন। উঠে গার্গীর দিকে ঘুরে দাঁড়াল।—অসময়ে এসে পড়ে আপনাদের বড় বিরক্ত করে গেলাম, কিছু মনে করবেন না।

জবাবে গার্গী দুটো সৌজন্যের কথাও বলতে পারল না। তার বাড়িতে তারই সামনে এক অপরিচিতা আর এক স্বল্প-পরিচিতের মধ্যে এ-রকম একটা প্রহসন ঘটল কি করে সেটাই আশ্চর্য। এর অনেকটাই প্রচ্ছন্ন বটে, তবু পরিচ্ছন্ন লাগছে না খুব।…মেয়েটা সকালের গাড়িতে উঠে বিকেলে পেঁৗছেছে আবার রাতের ট্রেন ধরে কাল সকালে নামবে। এর মধ্যে খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কিনা বা

হবে কিনা তাও সন্দেহ। তবু গার্গী দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে পারল না।

মঞ্জরী বিশ্বাস সুশান্তর দিকে ফিরল এবার। ঠোঁটে আরো বেশি হাসি ঝরাবার চেষ্টায় মুখখানা প্রায় বিকৃত দেখালো। যাবার আগে যেন শেষ ছোবল বসিয়ে দিয়ে গেল একটা। বলল, এখানকার ঠিকানা দিয়েছে বলে আপনার ফ্ল্যাটের মালিকের ওপর আপনি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন বুঝতে পারছি।···কিন্তু সে-বেচারার দোষ নেই, ভদ্রলোক সেদিন নিকুঞ্জদার কাছে দুঃখ করছিল, আপনি এত ভক্ত জুটিয়েছেন যে রোজ টেলিফোনে বা বাড়ি এসে তাদের খোঁজ-খবরের ঠেলা সামলাতে গিয়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই তার ঝগড়া বেধে গেছে—স্ত্রী নাকি তাকেই সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছে। প্রাণের দায়ে সে-বেচারা এখন আপনার প্রায় সব ভক্তকেই এ ঠিকানা বাতলে দিয়েছে।···তাই ভয় হয়, আপনার এই নিরুপদ্রব অজ্ঞাতবাসের ওপর এ-রকম আরো না দু'চারটে হামলা হয়ে যায়। আচ্ছা—

হনহন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটা বিষাক্ত বাতাস যেন থমকে রইল খানিকক্ষণ পর্যন্ত।

কানের দু'পাশ গরম ঠেকছে গার্গীর। নিরুপদ্রব অজ্ঞাতবাসের কথা বলে মেয়েটা এই লোকের মুখের ওপর যে কুৎসিত ইঙ্গিত ছুঁড়ে দিয়ে গেল, তার একটা ঝাপটা যেন ওর মুখেও এসে লেগেছে। ···এখন কি করবে, কৈফিয়ত নেবে, না এক্ষুনি উঠে চলে যেতে বলবে।

কি করবে স্থির করার জন্যেই ঠাণ্ডা দু'চোখ তার মুখের ওপর উঠে এলো।

সোফায় শরীরটা একটু ছেড়ে দিয়ে সুশান্ত বলল, এক পেয়ালা চা বা কফি হবে?

গার্গী চেয়ে আছে। সহজ হবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু দেখছে না।—আপনি আশ্রমে বাজাতে যাবেন না?

জবাব পেলে বলবে, চা সেখানেই পাবেন। যে জবাব পেল, সেটা আশা করেনি।

—সেখানকার পাট সেরেই তো এখানে এলাম। আপনার বাবা বললেন, মাথা ধরেছে বলে আপনি যেতে পারেননি, তাই ভাবলাম ফেরার সময় একবার দেখে যাই। দেখতে এসে এ-রকম বিভ্রাটের মধ্যে পড়ে যাব কে জানত···।

গার্গী তেমন ফর্সা না হলেও মুখে উষ্ণ লালচে আভা ছড়াচ্ছে একটু একটু করে। ও যায়নি বলেই তাড়াতাড়ি বাজনা সেরে এখানে চলে এসেছে সেটা বুঝতে বাকি থাকল না। অনুচ্চ কঠিন সুরে জিজ্ঞাসা করল, এখানে এ-রকম বিভ্রাট হল কেন ?···ওই মেয়েটিকে এভাবে অপমান করবেন জানলে তাকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেলেন না কেন ?

কোনরকম চপলতা বা ভাঁওতার আশ্রয় নিল না সুশান্ত। জবাব দিল, অপমান-বোধ যাদের আছে ওই মেয়ে তাদের কেউ নয়।···তবু, আমার অন্যায় হয়েছে।

অন্যায় কবুল করা সত্ত্বেও গার্গীর মুখে একটাও নরম রেখা পড়ল না।—মেয়েটি কে ?

সুশান্তর ভিতরটা চকিত হল একটু।—নিজের পরিচয় সে আপনাকে দেয়নি ?

—না। শুধু নাম বলেছে। আর বলেছে, আপনি আত্মীয়ের মতই স্নেহ করেন—

মুহূর্তের জন্য মনের তলায় একটা লোভ উঁকিঝুঁকি দিল সুশান্তর। নিম্নস্তরের সন্দেহ নিরসনের মত করে বানিয়ে বলবে কিছু ? পরক্ষণে সে-চিন্তা বাতিল করে দিল। ঘরের বাতাস অনেকখানি বিষিয়েছে, আর না। বলল, মেয়েটি সিনেমা-আর্টিস্ট, দু'-তিনটে ছবিতে ছোট ছোট কাজ করেছে, এখন নায়িকা হবার ইচ্ছে, সেই লোভে চারদিকে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে।

শুধু রাগ নয়, সেই সঙ্গে একটা বিতৃষ্ণার অনুভূতিও ঠেলে উঠতে লাগল। এখন বুঝতে পারছে মেয়েটা কোন্ হতাশা নিয়ে ফিরে গেল। তেমনি কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করল, সেই লোভের প্রশ্রয় আপনি তাকে দেননি ?

সুশান্ত নিরুত্তর।

দিয়েছে যে সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। সাধারণত কারো সঙ্গে এই পর্যায়ের বাদানুবাদে নেমে আসতে গার্গী দত্তর রুচিতে বাধে। কিন্তু অবাঞ্ছিত জঞ্জাল যদি আপনা থেকে এসে তার দোর-গোড়ায় স্তূপীকৃত হতে চায়, শক্তহাতে তা মুক্ত করার মত সবলতার অভাবও তার চরিত্রে নেই। সেই গোছেরই ব্যাপার দাঁড়িয়েছে যেন। তপ্ত শ্লেষে তাই লোকটার মুখের ওপর আর এক পশলা ঝাপটা মেরে বসল।—আর, আপনার আর যে-সব ভক্তর কথা বলে গেল মেয়েটি, তারা কারা? তারাও সব এই রকমই বোধহয়?

সুশান্ত চুপচাপ চেয়ে রইল খানিক। ভীরুর মত চোখ নামিয়ে নিল না। অপরাধের বোঝা এমন স্পষ্ট হয়ে ওঠা সত্ত্বেও মেরুদণ্ড বেঁকে গেল না। তার ভাল লাগছে। স্থূল স্নায়ুগত ভাল লাগার মত নয়। এর স্বাদ আলাদা, রূপ আলাদা।

যতখানি সম্ভব নিস্পৃহ মুখে জবাব দিল, বাইরে থেকে তারা আর একটু উঁচু মহলের···তবে মূলে খুব তফাত নেই বোধহয়। কি করা যাবে বলুন কলকাতার মত জায়গায় গান-বাজনায় একটু নাম হলে ভক্ত জুটেই যায়···সেই সঙ্গে টাকা থাকলে আরো বেশি জোটে। ভক্তর ঠেলায় অস্থির তখন···

ভিতরটা একবার দপ করেই জ্বলে উঠল গার্গীর। ঠিক সেই মুহূর্তে কি মনে পড়তে স্থির তীক্ষ্ণ দুই চোখ তার মুখের ওপর থমকালো একপ্রস্থ।···কোথায় থাকবে ঠিক না করেই মঞ্জরী বিশ্বাস কলকাতা ছেড়ে এখানে চলে আসতে পেরেছিল কারণ সেটা তার কাছে কোন সমস্যা ছিল না। সমস্যাটা এখানে এসে অনুভব করেছে। এখানে, এই বাড়িতে পা দিয়ে। থাকার প্রশ্ন উঠতে মেয়েটার মুখে চাপা বিস্ময়ের আঁচড় পড়েছিল তাও গার্গীর দৃষ্টি এড়ায়নি। ত্রিকূট পাহাড়ে যে দুঃসাহসিক নগ্ন আচরণ দেখেছে, আর আজ সন্ধ্যায় এখানে যা দেখল যা শুনল, এরপর কেউ হলপ করে বললেও সে বিশ্বাস করবে না রাতে এখানে থাকার ব্যাপারে মঞ্জরী বিশ্বাসের কিছুমাত্র দ্বিধা দ্বন্দ্ব বা সমস্যা ছিল।···যে ঠিকানা সে সংগ্রহ করেছিল সেখানেই সে থাকবে বলে এসেছিল।

দু'চোখে ঘৃণা উপচে উঠছে গার্গী দত্তর। লোকটার কুৎসিত

মুখের ওপর একটা সুশ্রী, সুন্দর মুখোশ আঁটা দেখছে যেন। সেটা ছিঁড়েখুঁড়ে দেবার মতই ক্রুদ্ধ তপ্ত বাসনা একটা। কিন্তু সামলে নিল। রুচিতে বাধছে। এই লোকের সামনে বসে থাকতেও। উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। চা বা কফি চেয়েছিল মনে আছে। এখানকার অবস্থান সহজ আর দীর্ঘতর করার অজুহাত ছাড়া আর কিছু নয় সেটা। এই মুহূর্তে ওটুকু প্রশ্রয় দিতেও আপত্তি। সংযত কঠিন সুরে বলল, এখানেও আপনার সেই গোছের ভক্ত জুটতে পারে ভেবে থাকলে একটু বেশিমাত্রায় হতাশ হবেন। আচ্ছা, আসুন আপনি, আমায় এক্ষুনি একবার আশ্রমে যেতে হবে।—

আসন ছেড়ে সুশান্ত সরকারও উঠে দাঁড়াল। টেবিল থেকে সেতারটা হাতে তুলে নিল। মুখে হাসি বা চপলতার চিহ্নও নেই। বলল, হ্যাঁ, আপনাকে অনেক বিরক্ত করেছি, আর না।...তবে একটা কথা, কলকাতার যে ভক্তদের কথা বলেছি, এখানে সে-রকম চটক দেখলে এ জায়গা ছেড়ে অনেক আগেই আমি পালিয়ে যেতাম।... এখানে এলে মনে হয় নিজের অনেক দোষ আর অপরাধ জমা করে দেবার মত বড় জায়গা এটা, আমি সেই লোভে আসি। আচ্ছা—

চলে গেল।

গার্গী চুপচাপ সেদিকেই চেয়ে রইল। লোকটা অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে আস্তে আস্তে বসল আবার। আশ্রমে যাবার তাগিদও থাকল না আর। শেষের কথা কটা মাথার মধ্যে নড়াচড়া করছে। যে-কোন লোকের মুখে ওই কথাগুলো নাটকীয় শোনাবে। মুখোশ-পরা লোকের মুখে তো শোনাবেই। কপট স্তুতি মনে হবে। অথচ ঠিক যেন সে-রকম শোনালো না, সে-রকম মনে হল না।

অন্যমনস্কের মত কতক্ষণ বসেছিল জানে না। সামনে বাবাকে দেখে সচকিত।

—কি রে, তুই এভাবে বসে···শরীর খারাপ হয়নি তো ?

কপাল পরীক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসার আগেই গার্গী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।—না, শরীর খুব ভাল আছে। ওখানকার আসর এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল ?

—হ্যাঁ। প্রসন্ন মুখে বললেন অবিনাশবাবু।—ছেলেটা যা

করে গেল, তারপর আর কারো প্রোগ্রাম জমলই না তেমন। ওরা তো আমাকে আচ্ছা করে ধরেছে, ফাঁক পেলেই সুশান্তকে তাদের ওখানে টেনে নিয়ে যেতে হবে, নইলে তারা এসে হামলা করবে। তিনখানা বাজিয়ে উঠে পালিয়েছে। ওরও শরীরটা বেশ খারাপ দেখলাম, কাল একবার খবর নিতে হবে—

—তোমার আর রোদে বেরিয়ে কাজ নেই, উনি এখানে এসেছিলেন, শরীর ভালই আছে—তুমি মুখ-হাত ধুয়ে নাও, আমি খাবার দিচ্ছি।

একটু দ্রুতই প্রস্থান করল।

খাইয়ে-দাইয়ে তাঁকে একেবারে শুতে পাঠিয়ে গাগীর্র ছুটি। ঘরে ফিরে সন্ধ্যার ব্যাপারটাই বার বার মনে আসছে। গাগীর্ দেখতে জানে, রঙে-তুলিতে ভিতরের চিত্র বাইরে টেনে আনতে পারে। এই সংধ্যায় ওই লোকের যে-দিকটা অনাবৃত হয়ে গেছে, সেটা মিথ্যে ভাবতে পারছে না। অথচ, সেটাই যদি একমাত্র সত্যি হয়, ওই লোকের হাতে সেতার এলে শিল্পমূর্তি এমন নিখুঁত এমন জীবন্ত হয়ে ওঠে কেমন করে। শিল্পের রাজ্যে এই গোছের আপসও সম্ভব ?...লোকটার শেষের ওই কথাগুলোও মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে বার বার। আর, থেকে থেকে আর যা মনে আসছে, সেটা গাগীর্র নিজের কাছেই বিরক্তিকর।

...নিজের মুখে চা বা কফি চেয়ে পায়নি, ঘরে ফিরে এও একাধিকবার মনে হয়েছে।

কিন্তু সুশান্ত সরকার যা বলে এসেছিল সে কি নিছক স্তুতি ? এই গোছের শস্তা স্তুতির রাস্তায় সে অনেক হেঁটেছে। তবু এও কি ঠিক তাই ?

ভিতর থেকে সায় মিলছে না। আজ যে-পরিস্থিতির বিপাকে পড়েছিল, তার জন্যেও কোন খেদ বা ক্ষোভ নেই। মঞ্জরী বিশ্বাসকে নিয়ে সে যে চোরের মত পালিয়ে আসেনি, তাও এক অনুকূল সুকৃতি যেন।...এখানকার এক রমণীর মধ্যে ইদানীং যথার্থই আশ্চর্য ব্যতিক্রম কিছু অনুভব করে সে। সে-ব্যতিক্রম

আজই যেন সব থেকে বেশি অনুভব করছে।

একলা ঘরের আঁধারে যাকে কেন্দ্র করে কামনার সাত পলতেয় লোভের শিখা জ্বলে জ্বলে ওঠে—তার সামনে গেলে এখন তারা যেন নিজেরাই নিভৃতের কোন শূন্য গহ্বরে মিলিয়ে যায়। সামনা সামনি এখন আর চেষ্টা করেও সুশান্ত সরকার সেগুলোকে তাতিয়ে তুলতে পারে না। তুলতে চায়ও না।

সামনে এলে তখন মনে হয় রমণীর এই সবল ব্যক্তিত্ব-মাধুর্যটুকুই দুর্লভ উপভোগের বস্তু।

কিন্তু আজকের এই ঘটনার পর সুশান্ত কি করবে? আর ও বাড়িমুখো হবে কেমন করে? এখান থেকে চলে যাবার কথা মনে হওয়া মাত্র ভেতরটা অস্থির হয়ে উঠল। যাওয়ার চিন্তা বাতিল।··· মঞ্জরী বিশ্বাসকে নিয়ে উঠে চলে এলে যেতেই হত। কিন্তু এখন মন বলছে তার দরকার হবে না। কেন এ-রকম আশা তাও জানে না।

কলকাতা ছাড়ার আগে গাড়িটা খুঁটিনাটি মেরামতের জন্য এক গ্যারেজে দিয়ে এসেছিল। হঠাৎ মনে হল গাড়িটা এখানে সঙ্গে থাকলে সুবিধে। দিন কয়েকের জন্য গিয়ে গাড়িটা নিয়ে এলে কেমন হয়?. কিন্তু এ জায়গা ছেড়ে এক পা-ও নড়ার ইচ্ছে নেই। অতএব কলকাতার সেই গ্যারেজে টেলিগ্রাম করল। নির্দেশ পাওয়ামাত্র তাদের ড্রাইভার দিয়ে গাড়িটা দেওঘরের এই ঠিকানায় যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

দু'তিনদিনের মধ্যেই গাড়ি এসে যাবে আশা করছে।

···এ দু'তিনটে দিন আর ও-বাড়ি যাবে না। যাওয়া সম্ভব নয়। সকাল থেকে কি এক অদৃশ্য তাগিদে শুধু বিকেলের প্রতীক্ষা করেছে।

বিদ্যাপীঠের পথে বাপ-মেয়ের সঙ্গে পরদিনই দেখা হল। না, গার্গী দত্ত তাকে চেনেওনি। চিনতে চায়নি। তার সঙ্গ পরিহার করার জন্য আগের মত বাবাকে ছেড়ে দূরে-দূরেও চলে যায়নি। সেটুকু দুর্বলতারও প্রশ্রয় দেয়নি।

আশ্রমের কর্মকর্তারা কত খুশি হয়েছে আর তার বাজনার কত প্রশংসা করেছে হৃষ্টমুখে অবিনাশবাবু আর একপ্রস্থ সেই রিরিস্তি

দিলেন। তারপর সন্ধ্যা হতে না হতে অন্য দিনের মতই তাকে বাড়িতে টেনে নিয়ে যেতে চাইলেন।

সুশান্ত জবাব দিল, আজ থাক—

—কেন গো?···ওই যা, তোমার শরীরের খবর নিতেই ভুলে গেছি। কেমন আছ?

—ভাল?

—তবু আজও একটু শুকনো লাগছে। যাক, আজ আর গিয়ে কাজ নেই, বিশ্রাম করো—

পরদিন অধীর মনটাকে শাসন করে করে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘরেই বসে রইল সে। অবিনাশবাবু এ পর্যন্ত এসে ধাওয়া করতে পারেন সে আশাও করছে। আসতে চাইলে কিছু একটা অজুহাত দেখিয়ে মেয়েই বাধা দেবে এ যেন জানাই আছে তার।

সন্ধ্যার পর বোতল খুলে বসল। কিন্তু জঠর জ্বলে গেলেও সমস্ত দিনের অশান্ত শূন্যতাটুকু ভরাট হবার নয়।

পরদিন আবার না বেরিয়ে পারা গেল না। দেখা হল। অবিনাশ দত্ত অনুযোগ করলেন, অসুস্থ ভেবে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। তারপর সেদিনও ধরে নিয়ে যেতে চাইলেন।

মুহূর্তের জন্য গার্গী দত্ত তার দিকে ফিরে তাকালো একবার। সে চাউনিতে সম্ভ্রমের লেশমাত্র নেই। উল্টে তার বাবার সঙ্গে এভাবে লুকোচুরি খেলাটাও যে কাপুরুষতার সামিল তাই যেন বুঝিয়ে দিল।

সুশান্ত কথা দিল, কাল যাব।

গেছে। আর তারপর অবিনাশবাবুর অনুরোধে সন্ধ্যার পর আবার সেতার নিয়েও যেতে হয়েছে। এবং তারপর অনুরোধে নয়, নিজের তাগিদেই গেছে। অন্য দিনের মতই বাজনার আসর এবং শেষে গল্পের আসর জমে উঠেছে। এবং অন্য দিনের মতই গার্গী খাবার আর চা বা কফি পাঠিয়েছে। কিন্তু সুশান্ত পর পর কটা দিন তা স্পর্শও করেনি। অবিনাশবাবুর অনুরোধেও না। বলেছে চা-কফি সে বরাবরকার মতই ছেড়ে দেবার মতলবে আছে। আর,

খাবারও অসময়ে খেলে লাভের থেকে ক্ষতিই বেশি হচ্ছে।

অদূরে চোখ ফেরালে তাঁর মেয়ের স্থির-গম্ভীর মুখে কোন প্রতিক্রিয়া দেখতে পেত কিনা জানে না। কিন্তু সুশান্ত চোখ ফেরায়নি। আর রাতেও ভদ্রলোককে খাবার কথা বলার সুযোগ না দিয়েই উঠে পালিয়েছে।

কিন্তু বাড়ি গেলেই যে গার্গী দত্তর দেখা পায় তা নয়। সকলের অগোচরে তার সবে থাকার প্রয়াস শুধু সুশান্তব কাছেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নীরস আলাপ অবিনাশ দত্তর সঙ্গেই জমিয়ে তুলতে হয়। অল্প কটা দিনের মধ্যে এই মানুষটার আরো প্রিয়-পাত্র হয়ে উঠতে পেরেছে।

···সেই সন্ধ্যায়ও বাজনার আসরে গার্গী এসে বসল না। বাজনা সজীব হয়ে উঠতে আর কেউ মেয়ের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করল না। কিন্তু সুশান্তরও গোঁ কম নয়। তার আঙুলের ছোঁয়ায় সুরের সেতু ধরে একটা আমন্ত্রণ যেন মূর্ত হয়ে উঠতে লাগল।

বাজনাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সুশান্ত উঠে দাঁড়াল। বলল, আসছি—

সকলের চোখের ওপর দিয়েই ভিতরের ঘরে চলে এল সে। এত সহজে এলো যে অবিনাশবাবু কিছু ভাবলেন না। মেয়েকে কিছু বলতে গেল বা তার কাছে কিছু চাইতে গেল এটুকুই শুধু ধরে নিয়ে সদ্য-শোনা সুরের রেশে মগ্ন তিনি।

ভিতরের ঘরেও গার্গীকে দেখতে পেল না সুশান্ত। পায়ে পায়ে তার পরের ছোট ঘরটাতে এসে দাঁড়াল।

একটা অসম্পূর্ণ ছবির সামনে বসে আছে চুপচাপ। হাতে রঙ-তুলি নেই। সুরের রেশ তারও কানে লেগে আছে বোঝা গেল। দরজার দিকে চোখ পড়তে একটা ধাক্কা খেয়েই তার তন্ময়তা ভেঙে গেল যেন। সুশান্ত আরো একটু এগিয়ে এসে দাঁড়াল। গার্গী মুখ তুলে তাকালো।

—বাজনা শুনলেন না?

জবাব পেতে দেরি হল একটু। কিন্তু জবাব পেল।—শুনেছি।

—ভাল লাগেনি?

আবারও সময় লাগল একটু জবাব পেতে। তবু জবাব আবারও পেল।—লেগেছে।

গভীর দৃষ্টিটা সুশান্ত ঘরের চারদিকের ছবিগুলোর ওপরে বুলিয়ে নিল একবার। তারপর মুহূর্তের জন্য দু'চোখ ওই মুখের ওপর স্থির হল আবার।

চলে এলো।

সেই রাতে সুশান্ত আরো কিছুক্ষণ বসে গল্প করে গেল অবিনাশবাবুর সঙ্গে। মানুষটা সুরসিক, অথচ নিঃসঙ্গ। মনের মত গল্প করার লোক পেলে সহজে ছাড়তে চান না। মনের মত লোক সর্বদা মেলে না। তাই এককালে য়ুনিভার্সিটিতে যা পড়াতেন অর্থাৎ সমাজ-বিজ্ঞান নিয়ে অবকাশসময়ে রীতিমত পড়াশুনা করেন এখনো। এই সময় কাটানোর প্রসঙ্গ এবং সমস্যা থেকেই কথায় কথায় প্রকাশ হয়ে পড়ল সম্প্রতি তিনি একটা লেখায় হাত দিয়েছেন, বিষয়বস্তু—বৈদেশিক সাহায্যের প্রভাবে আমাদের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন।

সপ্রশংস বিস্ময়ের অভিব্যক্তি, তারই ফাঁকে সুশান্ত দ্রুত ভেবে নিল কি, তারপর উৎসুক মুখে যেন আবেদন জানাল, খুব ইচ্ছে করছে একদিন একটু শুনি—

অবিনাশবাবু থমকালেন একটু, কিছু মনে কোরো না, তুমি কি পাস বল তো?

—এম. এ।

—কি সাবজেক্ট?

সম্ভব হলে স্যোসিওলজিই বলত, বিপদে পড়ার ভয়ে মিথ্যাচারের দিকে এগলো না।—ইকনমিক্স।

—তাই বলো। এতটা আশা করেননি, তাই ভারী খুশি তিনি।—নইলে এ-সব বিষয় তো কারো শোনার আগ্রহ হবার কথা নয়। তোমাকে শোনাতে পারলে আমার সাহায্যও হবে, ফরেন এড সম্পর্কে আমার থেকে তো তোমারই ভাল জানবার কথা!

খুশির আতিশয্যে পরদিনই সন্ধ্যায় তাকে নেমন্তন্ন করে বসলেন তিনি। খাওয়া-দাওয়ার প্রসঙ্গে সুশান্ত ইদানীং যে কথা বলে আসছে

তা মনেই পড়ল না ভদ্রলোকের। সুশান্তও নিজে যেচে সেটা আর স্মরণ করিয়ে দিল না। স্থির হল, সন্ধ্যায় বাজনার আসর বসবে, তারপর লেখা শোনার। রাতে একবারে খেয়ে-দেয়ে বাড়ি ফিরবে।

সে চলে যাবার পর মেয়ে ঘরে ঢুকল। অবিনাশবাবুর মুখে তখনো খুশির আমেজ। বললেন, ছেলেটা ভারী গুণী, বুঝলি, এমন সুন্দর বাজায়, আজ শুনলাম ইকনমিক্সএ এম. এ.– ফরেন এড্ অ্যাণ্ড কালচারাল চেঞ্জেস নিয়ে কি লিখছি শুনতে চাইল— কাল রাতে ওকে একেবারে খাবার নেমন্তন্ন করে দিলাম।

গার্গী সচকিত একটু।···কাউকে বুঝতে দিক বা না দিক, আজও চা আর খাবারের থালা ফেরত এসেছে সেটা খুব ভাল করেই লক্ষ্য করেছে। সাদাসিধে মুখ করেই জিজ্ঞেস করল, উনি খাবেন বলেছেন ?

···খাবে না কেন! সঙ্গে সঙ্গে কেন জিজ্ঞাসা করছে মনে পড়ে গেল। অপ্রস্তুত মুখ।—দেখেছ কাণ্ড, আজকাল খাওয়া-দাওয়ার কি সব বাছবিচার আছে ওর শুনেছিলাম, সে-সব জিজ্ঞেস না করে ফস করে শুধু নেমন্তন্নই করে বসলাম।

বিরক্তি সত্বেও মেয়ে হেসে ফেলল। –বেশ করেছ, তোমার লেখা শুনতে চাইল যখন তখন আর নেমন্তন্ন না করে উপায় কি। কি খাবে না খাবে তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

পরদিন সকালেই সুশান্তর গাড়ি এসে হাজির। আর তার আধঘণ্টার মধ্যেই সে গাড়ি হাঁকিয়ে চলল অবিনাশ দত্তর বাড়ি। সেখানে এসে শোনে বাবা-মেয়ে দুজনেই বাজারের দিকে গেছে। অতএব সুশান্তর গাড়ি বাজারের পথে ধাওয়া করল।

চৌমাথার মোড় ঘোরার আগেই এক দৃশ্য দেখে ব্রেক কষতে হল। রিক্শয় এক গাদা বাজার চাপিয়ে একলা ফিরে চলেছেন অবিনাশ দত্ত। পাশে মেয়ে নেই।

কি ভেবে সুশান্ত গাড়িটা তাঁর সামনে এগিয়ে নিয়ে গেল না। সাইকেল-রিক্শ চলে গেল। গাড়িটা বাস-স্ট্যাণ্ডের ছায়ায় রেখে সুশান্ত পায়ে পায়ে বাজারের পথে এগুলো। দশ গজ না যেতেই

দাঁড়াল আবার।

···সামনের বড় স্টেশনারি দোকান থেকে কিছু কেনা-কাটা করছে গার্গী দত্ত। নিঃশব্দে পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর লোভ সংবরণ করল সুশান্ত। দূর থেকেই দাঁড়িয়ে দেখল একটু! দূর থেকে দেখলে শিরায় শিরায় রক্ত এখনো অশান্ত হয়। সে-রকমই হল।

একটু বাদেই দ্রুত ফিরে এসে গাড়িতে বসে রইল চুপচাপ।

খানিকক্ষণের নীরব প্রতীক্ষার পর আসতে দেখল তাকে। বাড়ি ফেরার অন্য পথ নেই। কিন্তু সেদিক না গিয়ে বাঁয়ের উল্টো রাস্তায় ঘুরতে দেখল আবার তাকে। মনে হল পোষ্ট-অফিসে যাচ্ছে। ঠিকই মনে হয়েছে। সেখানেই ঢুকল।

এবারে প্রায় বিশ মিনিটের প্রতীক্ষা। সুশান্ত ঘাড় দেখল, দশটা বাজেনি তখনো, তাই বোধহয় দেরি। বিশটা মিনিট বিশ ঘণ্টার মত ক্লান্তিকর লাগল।

তারপর আবার বেরুতে দেখল। সাইকেল-রিকশ স্ট্যাণ্ডের দিকে চলেছে।

পাশ ঘেঁষে এমন অভদ্রোচিত ভাবে গাড়িটা এসে দাঁড়াতে গার্গী দত্ত চমকেই উঠেছিল। ভ্রূকুটি করে চালকের দিকে তাকিয়েই অবাক। এই দেখার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

নেমে এসে সুশান্ত সবিনয়ে বলল, আপনাদের বাড়ি গেছলাম, শুনলাম আপনি আর আপনার বাবা দুজনেই বাজারে এসেছেন··· উনি কোথায়?

বিস্ময় কাটিয়ে মুখে গাম্ভীর্যের আবরণ টেনে আনল গার্গী দত্ত।—তাঁর ব্লাড-প্রেসার, রোদ সয় না। আগে চলে গেছেন।

কথা বলার পরিপুষ্ট ধরনটুকু আজ আবার কান পেতে আস্বাদন করার মত মনে হল সুশান্তর। গাড়ির ও-পাশের দরজাটা খুলে দিল।—আসুন।

গাড়ি দেখেই এ আহ্বানের জন্য প্রস্তুত ছিল যেন গার্গী দত্ত। ঠাণ্ডা জবাব দিল, আপনি যান।

গাড়িটা হাতে আসার জন্যে হোক বা রাতের নেমন্তন্নের জোরে হোক অথবা বিগত কটা দিনের আত্মসংযমের দরুন হোক, সুশান্ত

আজ আবার নিজেকে আগের সেই সুতৎপর সহজতার মধ্যে টেনে তুলতে পেরেছে। হেসেই বলল, আপনি আমার ওপর যে-রকম রেগে আছেন, রাতের অতিথি-সৎকারটা কেমন হবে ভেবে এখন থেকেই ভয় ধরেছে।

গার্গী নীরব। জবাব দিয়ে প্রশ্রয় বাড়াতে চায় না। গম্ভীর, দু'চোখে শুধু বক্রাভাস ফুটে উঠল একটু। যেন বলতে চায় আতিথ্য গ্রহণ না করলেই ভয়ের কিছু থাকত না।

সেটুকু বুঝে নিয়েই যেন হালকা হেসে সুশান্ত জবাবদিহি করল একপ্রস্থ।—আপনার বাবা এত করে বললেন যে আপনি খুশি হবেন না জেনেও রাজী না হয়ে পারা গেল না···তা'ছাড়া নিজেকে কাঁহাতক বঞ্চিত করা যায় বলুন, ক'দিন চা-জলখাবার ফেরত পাঠিয়েও আপনার এতটুকু তাপ উত্তাপ দেখলাম না। সেই রাগেও রাজী হয়ে গেলাম—

রমণীর নির্লিপ্ত-গম্ভীর দৃষ্টিটা তার মুখের ওপর আটকে রইল একটু। --কি আশা করে রাজী হলেন ?

—আশা! সুশান্তর চোখেমুখে তরল বিস্ময়।—খাওয়ার উপলক্ষে আশা করতে গিয়ে এর ঢের আগেই বোকা বনেছি।···সেই প্রথম রাতে আপনাদের খাবার টেবিলে বসেও ইচ্ছে করেই আমি অমন ভাল ভাল খাবারগুলো ফেলে রেখে দিয়েছিলাম, আশা ছিল আতিথ্যের খাতিরেও আপনি যদি একবার বলেন, কিছুই তো খেলেন না।···খাবার সময় অন্তত মেয়েরা ছেলেদের ক্ষমা করে থাকেন, খুব সঙ্গত কারণেই আপনি তাও পারেননি। আর তারপর তো নিজে মুখ ফুটে চেয়েও চা বা কফি পেলাম না। আশা-টাশা জলাঞ্জলি দিয়ে উল্টে আপনাকে একটু গঞ্জনা দেবার লোভে রাজী হয়েছি বলতে পারেন।

এবারে জোরেই হেসে উঠল।

গার্গী চেয়ে রইল। ওই হাসির কতটা খাঁটি আর কতটা মেকী তাই দেখছে। একেবারে নিঃসংশয়ে ঠাওর করা যাচ্ছে না। এও বিরক্তির কারণ। আর একটিও কথা খরচ না করে রিক্‌শর খোঁজে ঘুরে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে মুখভাব বদলে গেল সুশান্তর। চাউনিটা একাগ্র, গভীর। গলার স্বরও।—একটা কথা বললে বিশ্বাস করবেন?

গার্গীকে আবার মুখোমুখি ফিরে দাঁড়াতে হল।

সুশান্ত বলল, এ পর্যন্ত যা-ই ঘটুক না কেন আপনাকে দেখে সত্যি আমার ভাবতে ইচ্ছে করে আমার ওপর যতখানি অকরুণ হবার কথা তা আপনি হতে পারেননি। সে-রকম হওয়াটা আপনার স্বভাব নয়।

ঝোঁকের মাথায় বলেছে কথাগুলো। কিন্তু ওই মেয়ে যে এরই ভিন্ন অর্থ ধরে নিয়ে চতুর্গুণ বিরূপ হতে পাবে সেটা মনে আসেনি। গার্গী দত্ত ধবে নিল লোকটা বলতে চায় ত্রিকূট পাহাড়ের অমন নোংরা ছলনা থেকে শুরু করে সেদিন সন্ধ্যার সেই অনাবৃত ঘটনার পরেও যতখানি রাগ তার হবার কথা, ততটা হয়নি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতেও রুচিতে বাধছে গার্গীর, তবু না বলে পারল না। ধারালো দু'চোখ তার মুখের ওপর ফেলে রেখে বলল, সেই ভরসায় এখন গাড়িতে তুলতে চান?

সুশান্ত যথার্থই ওই অর্থের ধার দিয়েও যায়নি। অম্লানবদনে মাথা নাড়ল, তাই চায়।

অনুচ্চ কঠিন স্বরে গার্গী জবাব দিল, আপনার ভাবনার ভুলটা তাহলে ভাঙা ভাল, আপনাকে আমার মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে, তাই আপনাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সম্মানটুকুও আপনার প্রাপ্য বলে আমি ভাবি না। আর, ও-রকম দু-চারটে গাড়িও আমার দেখা আছে।

রাস্তা পেরিয়ে ইশারায় একটা চলতি রিক্‌শ থামিয়ে তাতে উঠে বসল। একবারও ফিরে তাকাল না।

সুশান্ত দেখছে।···দু'চোখে আজ আবার সেই থাবা-খোলা হিংস্র পশুর বাসনা জমাট বেঁধে উঠছে।

বাড়ি ফিরল। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত একরকম ছটফট করেই কাটাল। তারপর বিকেলেই মদের বোতল আর গেলাস নিয়ে বসল। পরে সন্ধ্যেটা একটু তাড়াতাড়িই এগিয়ে এলো।

ঘর তালাবন্ধ করে গাড়ি হাঁকিয়ে সুশান্ত বেরিয়ে পড়ল আবার। মাথাটা অল্প অল্প দুলছে, স্টিয়ারিংয়ের ওপর হাত দুটো ঠিক আছে।

শহর ছাড়িয়ে প্রায় মাইল দশেক দূরে চলে এলো সে। তারপর কি ভেবে একটা ফাঁকা মাঠের ওপর গাড়ি থামাল। নেমে চুপচাপ বসে রইল খানিক। তারপর শুয়ে পড়ল। ওপরে কালো আকাশ। কোটি কোটি তাবা জ্বলছে। ইচ্ছে করেই এত পথ পেরিয়ে এসেছে। নইলে নেমন্তন্ন রক্ষার অজুহাতে গিয়ে উপস্থিত হবার লোভ ঠেকানো যাচ্ছিল না।

বাড়ি ফিরল যখন, রাত তখন এগারোটা। চারদিক নিঝুম ঢাকা। মালির দেওয়া খাবার মুখে তুলতে গিয়ে হাসিই পেল তার। রুচল না। খাবার ফেলে রেখে উঠে পড়ল। আবার মদ নিয়ে বসল।

ঠিক সময় না জানলেও রাত্রি তখন গভীর। খালি পেটে মদের মাত্রা বেশি হওয়াতে ঘুম আসছিল না। বরং একটা অস্বস্তি বোধ কবছিল।

অনেক দূর থেকে হঠাৎ একটা আওয়াজ ভেসে এলো কানে। দূরে কোথায় একসঙ্গে তিন-চারটে লোক চিৎকার করছে। মনে হল নন্দন পাহাড়ের ওদিক থেকে আসছে শব্দটা। দরজা না খুলে জানলায় এসে দাঁড়াল। গণ্ডগোলটা আরো স্পষ্ট শোনা গেল। বিপন্ন চিৎকারেব মত লাগছে।···কিছু একটা ঘটেছে ওদিকে। টিলার পাশ ঘেঁষে কতগুলো আলোর আভাসও পাচ্ছে। মশাল কি কিসের আলো বোঝা গেল না। মালিটাও রাতে তার বাড়ি চলে যায়, জিজ্ঞাসা করার মত দ্বিতীয় লোক নেই।

তক্ষুনি মনে পড়ল জায়গাটা ভাল না। কিছু একটা বিপদের ব্যাপারই হবে। আর সে বিপদ এদিকেও গড়াতে পারে। সুশান্ত তাড়াতাড়ি বন্দুকটা টেনে নিয়ে গুলি পুরে নিল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আঙিনা পেরিয়ে গেট পেরিয়ে সেই নিঝুম আঁধারে টিলার দিকে খানিকটা এগিয়ে গেল। তারপর আলোর আভাস লক্ষ্য করে পর পর গোটা কয়েক গুলি ছুঁড়ল।

সেই শব্দে নিষুতি অন্ধকারের স্তব্ধতা খানখান হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আলোর আভাস মিলিয়ে যেতে লাগল। একটু বাদে চিৎকার-চেঁচামেচির রেশও আর কানে এলো না?

রাতে গার্গীরও ভাল ঘুম হয়নি। সন্ধ্যা পেরুবার পর রাত যত বাড়ছিল, বাবার ছটফটানিও ততো বাড়ছিল। আর লোকটার ওপর গার্গীর ততো বেশি রাগ হচ্ছিল। ···না, রাস্তায় দাঁড়িয়ে রাগের মাথায় সে খুব সত্যি কথা বলেনি। ওই লোককে নিয়ে মাথা সে ঘামিয়েছে। ও-রকম মানুষ এই পর্যায়ের শিল্পী হয় কেমন করে সেটা আগেও ভেবেছে, আজও ভেবেছে।··বাবার লেখা শোনাটা ছল, কোন্ আগ্রহে লোকটা নেমন্তন্ন গ্রহণ করেছিল, তা ও নিঃসংশয়ে জানে। তাই একেবারে আসবেই না ভাবেনি। সে যা-ই বলুক, এসব লোকের অতখানি মানমর্যাদাবোধ না থাকারই কথা। অতএব আসবে যে সেটা ধরেই নিয়েছিল।

রাত ন'টায় রিকশ করে বাবাকে চাকর পাঠাতে দেখে একবার ভাবল বাধা দেবে। কিন্তু কি ভেবে কিছু বলল না।···রান্না-বান্না সব জুড়িয়ে যাচ্ছে, যত দেরি হবে বাবার কষ্ট। লোক যেমনই হোক, অতিথিকে ফেলে বাবাকে খেয়ে নিতে বলতে পারে না। বললেও খাবে না। তাই বাধা দিল না।

চাকর ফিরে এসে জানাল, বাংলো তালাবন্ধ। কেউ নেই।

অবিনাশ দত্ত অবাক। চিন্তিতও। কি হতে পারে ভেবে পেলেন না। কিন্তু গার্গী দত্ত রাগে জ্বলতে লাগল। ইচ্ছে করেই যে গা-ঢাকা দিয়ে আছে সেটা সে খুব ভালই বুঝতে পারছে। তাগিদ দিয়ে বাবাকে খাইয়ে দিল। কিন্তু নিজের খাওয়া হল না। রাগ সত্ত্বেও মনে হল আর একটা লোকের খাওয়া জুটেছে কিনা কে জানে। অথচ এই বাড়তি আয়োজন বিশেষ করে তার জন্যেই হয়েছিল। আর একদিনও যে ইচ্ছে করেই প্রায় না খেয়ে গেছে তাও মনে পড়ছে। পড়ছে বলেই আরো বেশি রাগ, ও-রকম লোক যত খুশি না খেয়ে থাক, তার তাতে কি?

শুয়ে শুয়ে রাগে ছটফট করেছে। সকাল হলেই বাবাকে কিছু

বলবে ঠিক করল। বলবে লোকটা ভাল নয়, অত মাখামাখি না করাই ভাল। বাবা অবাক হবে, কিন্তু বুঝবে ঠিকই।

কিন্তু এই সংকল্পের পরেও গার্গী স্বস্তি বোধ করল না খুব। আবার সেই পুরনো চিন্তা মাথায় আসছে। ভিতরে ভিতরে অবাকই লাগে বটে।...পাহাড়ের ওপর এক অচেনা মেয়েকে দেখেও অমন বেপরোয়া কার্য লোভ যার, সেই মানুষের মধ্যে ভাল কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু ওই লোকটা বাজনা নিয়ে বসলে এ রকম কাণ্ড হয় কী করে...তার হাতের ছোঁয়ায় রাগ-রাগিণীরা এমন কাছে চলে আসে কেমন করে? গান-বাজনা এত বয়েস পর্যন্ত সে কম শোনেনি, কিন্তু সেতারের এ-রকম হাত যে বেশি দেখেনি, অস্বীকার করবে কি করে?

সকালে উঠে ওই লোকটার সম্পর্কে বাবাকে সতর্ক করার অবকাশ পেল না। তিনিই হন্তদন্ত হয়ে তাকে ডাকতে ডাকতে ঘরে ঢুকলেন। চিন্তায় আর উদ্বেগে মুখ লাল।—মনু, ওরে মনু, এইমাত্র খবর পেলাম কাল মাঝরাতে নন্দন পাহাড়ের ওদিকে সাঙ্ঘাতিক ডাকাতি হয়ে গেছে, একটা লোককে নাকি আধমরা করে রেখে গেছে—ভোরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘোষাল যাচ্ছিল এখান দিয়ে, সে-ই খবরটা দিয়ে গেল—কোন্ বাড়িতে ডাকাত পড়ল বা কে জখম হল বলতে পারল না।

শোনামাত্র গার্গীর বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠল। দুশ্চিন্তা আর উত্তেজনায় বাবা ছটফট করতে লাগলেন। প্রেসারের রোগী, শয্যাতে বসে পড়লেন। কি সর্বনাশ বল দেখি, আমাদের সুশান্তর কিছু হয়ে গেল না তো।...ও-রকম একটা জায়গায় একলা থাকে, ছেলেটাকে সেই কবেই এদিকে চলে আসতে বলতাম, তুই-ই তো বারণ করলি। একে তো কাল আসবে বলে আসেনি, এখন কি হয়েছে কে জানে—

যে-কোন অচেনা মানুষেরও এই বিপদ হয়েছে শুনলে আঁতকে ওঠার কথা। তার ওপর অবিনাশবাবু সত্যিই বলেছিলেন, ও-রকম জায়গায় একলা থাকা ঠিক নয়, ছেলেটাকে এদিকে চলে আসতে বলি। জবাবে বিরক্ত হয়েই গার্গী বাধা দিয়েছিল। বলেছিল,

সকলেই নিজের ভাল-মন্দ বোঝে, সবেতে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে।

অবিনাশবাবু বললেন, শুনে পর্যন্ত হাত-পা কাঁপছে···রিক্‌শ নিয়ে যাই একবার, দেখে আসি—

মুখের বিমূঢ় ভাবটা জোর করেই কাটিয়ে উঠল গার্গী। সত্যিই যদি অঘটন কিছু ঘটে থাকে, বাবা তাহলে সুস্থভাবে ফিরতেও পারবে না। বলল,—তোমার হাত-পা কেঁপে কাজ নেই, গিয়েও কাজ নেই। তুমি ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাক, আমি যাচ্ছি—

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ে একটা সাইকেল রিক্‌শ ধরল।

···লোকটা কতখানি খারাপ সে-চিন্তা একবারও মাথায় আসছে না এখন। কাল খেতে না এসে বাবাকে কতখানি অপমান করেছে সেই চিন্তাও না। সে শুধু আশা করছে গিয়ে যেন দেখে কোন অঘটন ঘটেনি।

দূর থেকে বাংলোর বারান্দার দিকে চোখ পড়তে বুকের ভিতরটা গুরু গুরু করে উঠল আবার। বারান্দায় নানা শ্রেণীর কম করে বিশ-পঁচিশজন লোক দাঁড়িয়ে।

রিক্‌শ থেকে নেমে গেট পেরিয়ে একটু এগোতে সামনে মালির দেখা পেল। তাকেই জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে?

মালির মুখে নিশ্চিন্ত হবার মতই কিছু শুনল। সেই সঙ্গে অবাক হবার মতও।

নিশ্চিন্ত হবার পরেও গার্গী পায়ে পায়ে বারান্দার দিকে না এগিয়ে পারল না।

বাইরের একগাদা লোক ঘিরে ছিল বলেই সুশান্ত তাকে দেখতে পায়নি। সকালে উঠেই রাতের ঘটনা বলে সুশান্ত মালিটাকে নন্দন টিলার দিকে পাঠিয়েছিল কি হয়েছে খবর নিতে। খবর নিতে গিয়ে সে-ই লোক জড়ো করে এনেছে। বসে বসে তাদের ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতার কথা শুনতে হচ্ছিল।

গার্গী দত্তকে দেখা-মাত্র উদ্গত আনন্দে সুশান্ত সোজা হয়ে বসল। রাত-জাগা শুকনো মুখে ওই চাপা আনন্দের ছটা গার্গীর

চোখ এড়ালো না। সুশান্তর গায়ে একটা চাদর জড়ানো ছিল, সেটা কোলের ওপর খসে পড়ল।

—কি আশ্চর্য! আসুন, আসুন—

গার্গী লোকগুলোকে এক-পলক দেখে নিল। দু'জন অচেনা ভদ্রলোক, বাদবাকি স্থানীয় মেহনতী মানুষ। অঘটন ওই ভদ্রলোকদের আবাসেই ঘটেছে বোঝা গেল। বন্দুক নিয়ে সুশান্ত সরকার না বেরুলে দু'দুটো মেয়েছেলে আর ছেলেপুলে নিয়ে বিদেশে বেড়াতে এসে কি সর্বনাশ যে তাদের হয়ে যেত, সেই ত্রাস আর কৃতজ্ঞতার কথাই তাদের মুখে আরো দুই একবার শোনা গেল।

কিন্তু সুশান্ত সরকার তাদের এখন বিদায় দেবার জন্য ব্যস্ত।—ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনারা যান এখন, মেয়েরা হয়তো দিনের বেলাতেও একলা থাকতে ভয় পাচ্ছেন, তাছাড়া চাকরটার কি হল খোঁজ নিন, আর কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় তো ওই ওপরঅলাকে জানান।

তারা চলে গেল। গার্গী দত্ত দাঁড়িয়ে তখনো। শশব্যস্তে উঠে সুশান্ত তার সামনে চেয়ার টেনে দিল।—বসুন।

বসল।

সুশান্ত হাসছে।— আপনি হঠাৎ?

অনেকবারের দেখা মানুষটাকেই আবার একটু মন দিয়ে দেখল গার্গী দত্ত। জবাব দিল, খবরটা ঠিক-মত না শুনে বাবা চিন্তিত হয়েছিলেন।

—ও। সুশান্ত হেসে উঠল। তারপর তেমনি খুশি মুখে বলল, আর এখানে এসে লোকটাকে বহাল তবিয়তে বসে থাকতে দেখে আপনার নিশ্চয় মেজাজ খারাপ হয়েছে?

এ পরিহাসের পরেও গার্গী কেন যেন রাগ করতে পারল না। চেয়ে আছে।

—কাল ওই ভদ্রলোকদের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছিল?

—হয়নি। ডাকাত পড়েছিল।…বউ ছেলেপুলে নিয়ে খুব চেঞ্জেই এসেছিলেন ভদ্রলোকেরা। আজই পালাবেন বলছেন।

—একজন খুব বেশিরকম জখম হয়েছে শুনলাম?

সুশান্ত হাসছে।—ও-রকম রটে, যেমন ভোর না হতে আমার বীরত্বের খবর রটেছে। তারপর জানাল, জখম একটু-আধটু হয়েছে ওই বাড়ির চাকরটা। বাইরে শুয়েছিল, তাকে কিছুটা মারধোর করে ডাকাতরা প্রথমে বেঁধে ফেলেছিল। তারপর শাবল আর কুড়ুল দিয়ে ঘরের দরজা ভাঙার উদ্যোগ করছিল। আর ভিতর থেকে ভদ্রলোক-বউ-ছেলেমেয়েরা আর্তনাদ করে চিৎকার করছিল।

— রাত কত তখন?

—আড়াইটে-তিনটে হবে।

—চিৎকার শুনে ওই রাতে আপনি একলা বন্দুক নিয়ে বেরুলেন?

ভাল লাগছে সুশান্তর। এত ভাল আর জীবনে লাগেনি বোধহয়। সামনে পেলে ডাকাতদের হাতে ফুল-চন্দন গুঁজে দিত হয়তো। হাসছে। জবাব দিল, দোসর আর কোথায় পাব?

কেন বিশ্বাস করা সহজ হচ্ছে না গার্গীই জানে। ঘরে সত্যিই বন্দুক আছে কিনা উঠে দেখে আসতে ইচ্ছে করছে। জিজ্ঞাসা করল, তারপর?

—তারপর টিলার কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে আলো লক্ষ্য করে গোটাকতক গুলি ছুঁড়ে দিলাম।...এখন শুনছি তাইতেই কাজ হয়েছে, গুলির শব্দে ডাকাতগুলো হুড়মুড় করে পালিয়েছে। আর দু-চার মিনিট দেরি হলে ওরা দরজা ভেঙে ফেলত।

নিজের অগোচরেই গার্গী চেয়ে আছে তার দিকে। ত্রিকূট পাহাড়ের সেই লোকের মধ্যে—শুধু ত্রিকূট পাহাড় কেন, আরো বারকয়েক যে লোকের চোখ দুর্বিনীত লোভে চক চক করে উঠতে দেখেছে, আর মঞ্জরী বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে সেই সন্ধ্যায় ওই লোকের যে চরিত্র প্রকাশ হয়ে গেছে তার সঙ্গে এই পুরুষকারের যোগ কল্পনা করাও শক্ত। তার বদ্ধ ধারণা, ওই গোছের লোক কাপুরুষই হয় সাধারণত।...আরো বিস্ময়, যে মানুষের আঙুল সেতারের তার থেকে ওভাবে রাগ-রাগিণীদের টেনে বার করতে পারে, সেই অশান্ত অথচ তন্ময় হাতে বন্দুক কল্পনা করাও শক্ত। সামনের এই মূর্তি যেন শিল্পীরই সাবজেক্ট কিছু—গার্গী দত্ত তাই দেখছিল যেন।

অপলক দৃষ্টি-বিনিময়েরও একটা অস্বস্তিকর স্পর্শ আছে বোধহয়। গার্গী দত্ত সচকিত হল। সঙ্গে সঙ্গে গত রাতের আর এক প্রসঙ্গ মনে পড়ল তার। বরাবরকার মতই গম্ভীর।—কাল রাতে আপনি যাননি কেন ?

সুশান্ত জবাব দিল না। ঠোঁটের ডগায় হাসির আভাস অস্পষ্ট নয়। গার্গীর রাগই হচ্ছে এখন।—ফিরে গেলে বাবা জিজ্ঞেস করবেন, তাঁকে কি বলব ?

- বলবেন, শরীর ভাল ছিল না।

--সেটা বিশ্বাসযোগ্য হবে না, রাতে তিনি দুবার লোক পাঠিয়েছিলেন, একবার ন'টায় আর একবার দশটায়—তখন পর্যন্ত আপনার ঘর তালাবন্ধ ছিল।

ঠোঁটের হাসি আরো স্পষ্ট হল। এ যেন তারই দিন। জবাব দিল, তাহলে বলবেন এখান থেকে আট মাইল দূরের এক মাঠের ওপর রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত হাত-পা ছড়িয়ে শুয়েছিলাম, এগারোটায় বাড়ি ফিরেছি।

গার্গীর ঠাণ্ডা দু'চোখ আবার তার মুখের ওপর থমকালো একপ্রস্থ। সঙ্গে সঙ্গে কি মনে পড়তে গম্ভীর বিদ্রূপের সুরে বলল, বাবার কাছে ইকনমিকসে এম এ. পাস বলেছেন, পালানোটা সেই ভয়েই দরকার হয়নি তো ?

সুশান্তর মুখে সত্যিকারের বিস্ময় একটু। তারপর প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝে হাসিমুখে জবাব দিল, তাহলে সোসিওলজিতে এম. এ বলতাম। আপনাকে খুশি করবার জন্যে এক্ষুনি গাড়ি হাঁকিয়ে কলকাতা থেকে ডিগ্রী-সার্টিফিকেটগুলো এনে দেখাতে ইচ্ছে করছে।

যা হয় না সচরাচর তাই হচ্ছে, নিজের ওপর দখল হারিয়ে গার্গী দত্ত রেগেই উঠছে।—তাহলে বুঝতে হবে বাবাকে ইচ্ছে করে অপমান করতেও আপনার ভদ্রতায় বাধেনি ?

নিরুপায় মুখ করে সুশান্ত বলল, ভদ্রতাজ্ঞান আমার কেমন সে তো আপনি জানেন ··আর অপমান যে সত্যিই আপনার বাবাকে করিনি সেও আপনার থেকে ভাল আর কেউ জানে না। আমি

যাইনি আপনি চান না বলে।

নিজের অগোচরে গার্গী আরো অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।—আমি চাই না আপনি বরাবরই জানেন, জেনেও গেছেন।

—গেছি তো। কিন্তু কালকে বাজারের রাস্তায় অমন গালে চড় আর কখনো পড়েনি।

গার্গী চেয়ে রইল। স্বভাবসুলভ সহিষ্ণুতার মধ্যে ফিরে এলো একটু একটু করে।··পাহাড়ে একলা পেয়ে যে-লোক অমন দুঃসাহসের আর নিম্নস্তরের কাণ্ড করতে পারে, বিশ্রী লোভে দু' চোখ জ্বলে জ্বলে ওঠে, টাকার জোরে অম্লান বদনে মেয়ে-ভক্ত জোটার কথা শোনায়,—সেই লোকের হাতেই সেতারের ওইরকম সুর ঝরে, ডাকাত পড়লে সেই লোক বন্দুক হাতে একলা বেরিয়ে পড়ে—আবার বেকায়দায় পড়লে সে-ই এ ভাবে আত্মসমর্পণ করে কথা বলে।···না, এরকম উল্টো-পাল্টা মানুষ গার্গী দত্ত আগে দেখেনি। এমন কি চড়ের কথাটা শুনে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই প্রথম ঠোঁটে হাসি আসার উপক্রম তার।

সেটা টের পাওয়া মাত্র সুশান্ত সরকার দ্বিগুণ উৎফুল্ল। এবারে প্রায় আবেদনের মতই শোনাল তার কথা, বলল, আপনি এসেছেন সত্যি বড় ভাল লাগছে, আজ একটু চা দিতে বলি ?

গার্গী মাথা নাড়ল।—না, দেরি দেখে বাবা ভাবছেন। যা বলার বাবাকে নিজেই এসে বলুন, চা-ও সেখানেই পাবেন।

ছেলেমানুষের মতই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সুশান্ত। এই আনন্দ-টুকু অকৃত্রিম। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, জয় ডাকাত বাবারা—

তারপরেই অপ্রস্তুত।

গার্গীর হাল-ছাড়া মুখ, ঠোঁট ছেড়ে চোখেও হাসি ফুটল। চেয়েই আছে। সে তার আঁকার মত এক বিচিত্র সাবজেক্টই দেখছে কিনা জানে না।

এগারো

রাত্রি তখন গভীর।

চোখে ঘুম নিয়েই আস্তে বিছানায় উঠে বসেছে গার্গী দত্ত।

না, ইচ্ছে করে উঠে বসেনি। কেউ যেন ঘুমন্ত কানে সুর ঢেলে ঢেলে টেনে তুলেছে তাকে।

···গত কালও গভীর রাতের ওই সুরের আঘাত তার ভেতরটাকে দুমড়ে মুচড়ে একাকার করে দিতে চেয়েছিল।

···আজ আবার।

তার আগে, মাত্র পনেরটা দিনের মধ্যে গার্গীর জীবনে প্রায়-অতর্কিতে প্রচণ্ড একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে। তার আলোড়ন আর বিপুল প্রতিক্রিয়ায় এখনো স্তব্ধ সে।

—তারপর রাতের গভীরে ওই সুরের অস্ত্র নিয়ে বসেছে লোকটা।

কালও বসেছিল।

আজও।

কিন্তু তার আগে ওই পনেরটা দিনের ইতিবৃত্তও বৈচিত্র্যশূন্য নয়। গার্গীর সত্তার গভীরে তার ছাপ পড়ছিল। যেদিন সুশান্ত সরকার ওদের পিছনের ওই ছোট দোতলা বাড়িতে উঠে এসেছে - সেদিন থেকেই।

নিজের ইচ্ছেয় এসেছে সেটা এক গার্গী ছাড়া আর কেউ অনুভব করবে না বোধহয়। কারণ, সকলে জানে, তার বাবার জুলুমে ওই বাড়িতে চলে আসতে হয়েছে তাকে। জুলুমটা মিথ্যে নয়। নন্দন টিলার ওদিকে ডাকাত পড়ার পরদিনই কোন আপত্তি না শুনে বাবা এই ব্যবস্থা করেছে। বলেছে চেনা লোকের বাড়ি, যতদিন আছ ওখানেই থাকতে হবে।

বাবার অনুরোধে তক্ষুনি রাজী হয়নি লোকটা। নির্বোধ নয় বলেই হয়নি। কিন্তু এক ফাঁকে তাকে জিজ্ঞাসা করেছে, কি বলেন, আসব?

অনুমতি ভিক্ষার মত শুনিয়েছে। চাউনিতেও আসার অভিলাষ

গোপন থাকেনি। মনে মনে বিরক্ত হতে চেষ্টা করেছে গার্গী। জবাব দিয়েছে, ওখানে নিরাপদ বোধ না করলে আসবেন, তাতে আমার বলার কি আছে।

মহিল্যাটির মুখ থেকে এমন স্পষ্ট উক্তি এযাবৎ কম শোনেনি সুশান্ত। তবু আগের মত লাগছে না। তাই অম্লান বদনে বলতে পেরেছে, ঘরে বন্দুক আছে, তাছাড়া ভয়-টয়ের ব্যাপার নিয়ে আমি খুব একটা মাথা ঘামাই না।—তবু আসতে ইচ্ছে করছে।

বাবা ঘরে ঢুকে পড়েছিল। নইলে গার্গী কি জবাব দিত জানে না।

...মাত্র পনেরো দিন এখানে এসেছে, কিন্তু এরই মধ্যে একটা অদৃশ্য দখলের হাত যেন চারদিক বেষ্টন করে তার দিকে এগিয়ে আসছে। গার্গী ততো বেশি ব্যবধান রচনা করে চলেছে। কিন্তু সে ব্যবধান যে টিকছে না তাও অনুভব না করে উপায় নেই যেন।

....সকালে এসে এখানেই চা খায়। চায়ের পরে বাবা তার লেখা আর লেখার আলোচনা নিয়ে বসে। পাশাপাশি ঘর, কথাবার্তা কানে আসেই। লোকটা যে এম. এ. পাসের ব্যাপারে বাবার কাছে মিথ্যে বলেনি তাও স্বীকার না করে উপায় নেই।

প্রথম ক'টা দিন দুপুর থেকে আকাশ মেঘলা ছিল। বিকেল সাড়ে তিনটে না বাজতে বাড়ির দরজায় গাড়ি নিয়ে হাজির হয়েছে। বাবাকে টেনে বার করতে ওই লোকের পক্ষে একটুও বেগ পেতে হয়নি। আর বাবাই সানন্দে ওকেও টেনেছে।—ঘরে বসে থাকবি কি রে! চল্ চল্, আরাম করে বেড়িয়ে আসি।

বাবার আনন্দে সংশয় ঘটাতে চায়নি। সঙ্গে গেছে। খোলা রাস্তায় পড়ে গাড়ির বেগ দ্রুততর হয়েছে। শেষে বাবা বাধা দিয়েছে, তোমার হাতে পড়ে বুড়ো বয়সে প্রাণটা না যায়। অত জোরে চালাবার দরকার কি, আস্তে চালাও।

লজ্জা পেয়ে গতি কমিয়েছে। গার্গীর মনে হয়েছে, দরকার বলে নয়, ওই বেগে চলাটা যেন মানুষটার ভিতরের কিছু একটা অশান্ত দিকের সঙ্গে মিশে আছে। কথা বলতে বলতে নিজের অগোচরে আবার কখন সেই বেগেই গাড়ি ছুটিয়েছে। আস্তে চালাবার জন্যে

আবার সতর্ক করতে হয়েছে।

গত দুদিন বাবার গাঁটে গাঁটে একটু ব্যথা হওয়াতে বেরুনো হয়নি। বাবার অসুস্থতা কাম্য নয়, তবু গার্গী হাঁফ ফেলে বেঁচেছে। …নির্লজ্জ মানুষটা তবু এসেছিল তার কাছে। জিজ্ঞাসা করেছে, উনি তো বেরুবেন না, আপনি?

গার্গী রেগেই গেছল। তার এতকালের অভ্যস্ত ব্যক্তিত্বের ওপর কেউ যেন হামলা করে চলেছে। জবাব দিতে গিয়েও মুখের দিকে চেয়ে কিছু বলতে পারেনি। এই স্পষ্টতাকে কথার আঘাতে প্রতিহত করবে কি করে ভেবে পায়নি।

…সেই বিকেলেই গল্পচ্ছলে বাবার কিছু কথা কানে আসতে পাশের ঘরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছল গার্গী। একটু একটু করে সমস্ত মুখ লাল হয়েছিল তার।

…মেয়ের প্রসঙ্গেই গল্প করছে তার বাবা। আর দাদাদের প্রসঙ্গে। দাদাদের ওপর রাগ করে কেন পাগল মেয়ে আজও বিয়ে করেনি সাদাসিধে ভাবেই বাবা সেই গল্প করছে।

না, গার্গীর এই বয়েস পর্যন্ত বিয়ে না করাটা হৃদয়বিদারক ঘটনা কিছু নয়। তার দুই দাদাই অতি-আধুনিক বড় ঘরে বিয়ে করার ফলে দাদারা তাদের বউদের কেনা গোলাম হয়ে পড়েছিল যেন। তাদের মা ছিলেন ভয়ানক প্রাচীনপন্থিনী রাশভারী মহিলা। জপ-তপ পুজো-আর্চা নিয়ে থাকতেন। বড় বউ নিয়ে খুশি ছিলেন না মা, আরো বেশি আঘাত পেয়েছিলেন ছোড়দার বিয়েতে। ছোড়দা যেন মায়ের সঙ্গে রেষারেষি করেই এক বামুনের মেয়ে ঘরে এনেছে। মায়ের গোঁড়ামি গার্গীও খুব একটা উদার চোখে দেখত না। কিন্তু মায়ের প্রতি দুই শিক্ষিতা বউয়েরই ঘোর অবজ্ঞা দেখে, আর তাতে দাদাদেরও পরোক্ষ প্রশ্রয় দেখে তার রাগ হত। মায়ের গোঁড়ামির ব্যাপারে বউদের হাসি ঠাট্টা উপহাস ক্রমে অপমানের দিকে গড়াচ্ছিল।…মা শেষ পর্যন্ত খুব একটা বড় দুঃখ বুকে চেপেই চোখ বুজেছেন।

এই বেদনা বাবার বুকেও কতখানি বেজেছিল সেটা গার্গী পরে টের পেয়েছিল। ছেলে-মেয়ের প্রতি একটা নীরব অভিমান

নিয়ে তিনি সরেই থাকতে চেয়েছিলেন। সেটা বুঝেই গার্গী চাকরি ছেড়ে বাবার কাছে চলে এসেছে। এরপর দাদারা তার বিয়ের কথা তুলতে মুখের ওপর সে স্পষ্ট করেই জবাব দিয়েছে, বিয়ে করে তোমরা কত ওপরে উঠেছ সে তো দেখতেই পাচ্ছি। আমার বিয়ের জন্যে আর তোমাদের ভেবে কাজ নেই।

দাদারা অপমানিত বোধ করেছে। আর উচ্চবাচ্য করেনি।

কিন্তু বাবা তার জন্যে চিন্তা না করে পারেনি। তাই গার্গী তাকেও খুব স্পষ্ট করেই বলেছিল, বিয়ে করার ব্যাপারে আমার সত্যিই একটুও রুচি নেই বাবা, আমি তোমার কাছেই থাকতে চাই—কিন্তু এ নিয়ে তুমি যদি আবার চিন্তা-ভাবনা শুরু করো, তাহলে আবার চাকরি যোগাড় করে পালাতে হবে আমাকে।···আর বিয়ে যদি কখনো করতেই হয়, সেও আমি নিজেই তোমাকে বলতে পারব।

তারপর থেকে এযাবৎ বাবা চুপ করেই আছে। কিন্তু ভিতরে তার দুশ্চিন্তা আছেই বোধহয়। নইলে যত অন্তরঙ্গই হোক, বাইরের একটা লোকের কাছে এসব গল্প করা কেন? তাছাড়া এই গাড়ি-অলা বাড়ি-অলা এম. এ. পাশ এক শিল্পীকে পেয়ে মনে মনে কিছু আশা করছে না তো?

মনে হতেই গার্গীর দু'কান গরম হয়ে উঠেছিল। আর, সেই থেকে ওর আচরণও বদলেছে। কারণ তার খানিকক্ষণের মধ্যেই লোকটার স্পর্ধা ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন করেছে মনে হয়েছে। বাবার কাছ থেকে এক ফাঁকে উঠে সোজা তার আঁকার ঘরে দাঁড়িয়েছিল। গভীর দৃষ্টি মেলে ছবিগুলো একবার দেখেছিল। তারপর খুব সাদাসিধে ভাবে বলেছিল কথাগুলো। বলেছিল, আপনার ছেলেদের ওপর রাগ, আমার মেয়েদের ওপর—কাটাকুটি হয় না?

ঠাণ্ডা সহিষ্ণু মেজাজের মেয়ে গার্গী দত্তকে এই মানুষই তাতিয়ে দিতে পেরেছিল। পাহাড়ে এবং তার পরেও যে মানুষের এই আচরণ, মেয়েদের প্রতি তার রাগের কথা শুনলে বিশ্বাসের বদলে বিতৃষ্ণাই বেশি হবার কথা।

নিজেকে সংযত করেই অনুচ্চ কঠিন সুরে বলেছে, আপনি

সরাসরি এ ঘরে আসেন কেন ?

জবাবে হাসিমাখা নির্লিপ্ত মুখ।—না এসে পারি না।···আসব না বলছেন ?

আরো ঠাণ্ডা মুখে গার্গী বলে ফেলেছিল, না। বাবার সঙ্গে খাতির করছেন করুন, কিন্তু তার বেশি না এগোলে খুশি হব।

এ ঘটনা গোড়ার দিন-কয়েকের মধ্যেই। এত বড় অপমানও বিঁধেছে বলে মনে হয়নি, নির্লজ্জের মতই চলে গেছে। সন্ধ্যায় সেতার নিয়ে না আসাটা যে একটা চাল তাও বুঝেছে। দেরি দেখে বাবা চাকর পাঠিয়েছিল। সে তার মারফৎ জানিয়েছে, শরীর খারাপ, আসবে না।

শোনা মাত্র গার্গীর দ্বিগুণ বিতৃষ্ণা। যা ভেবেছিল বাবা তাই করেছে। তাকে ডেকে বাইরের তিন-চারজন লোকের সামনেই বলেছে, সুশান্তর শরীর খারাপ হয়েছে বলে পাঠাল, কি হয়েছে দেখে আয় তো, জ্বর-জ্বালা বাধিয়ে বসল কিনা আবার—আমি তো এই গাঁটের ব্যথা নিয়ে দোতলায় উঠতে পারব না—

গার্গী গেছে। লোকটাকে ভালরকম কিছু বুঝিয়ে দেবার জন্যেই গেছে। কিন্তু বোঝানোর বদলে কি নিয়ে ফিরে আসতে হবে জানত না। কোন্ অমোঘ অভাবিত ঘটনার দিকে এই পদক্ষেপ, জানলে যেত না।

ঘরের ইজিচেয়ারে সুশান্ত গা ছেড়ে বসেছিল। সানন্দে উঠে দাঁড়াল, আসুন, আসুন, বসুন—

বসতে আসিনি—

হেসেই বাধা দিল, কি জন্যে এসেছেন আমি জানি, অসুখ বলে পাঠানো সার্থক হয়েছে, আপনার বাবার কথায় না এসে পারেননি, তবু রাগ করে এসেই গেছেন যখন, বসুন একটু।

রাগ সত্ত্বেও সংযম হারায়নি গার্গী। নির্লজ্জতার এই রূপটাও দেখল চেয়ে চেয়ে। তার হাসির জাল থেকে নিজেকে যেন ছিঁড়ে নিল প্রথম, তারপর জবাব দিল, বাবার কথায় আমি আপনাকে দেখতেও আসিনি। শুধু জানাতে এসেছি, ভবিষ্যতে আমাকে এভাবে বিরক্ত হতে হলে আপনার সম্পর্কে বাবাকে কিছু বলতে হবে।

সুশান্ত সরকারের দু'চোখ তার মুখের ওপর যেন আরো একটু হেসে হেসে উঠেছিল। তারপর হালকা করেই জিজ্ঞাসা করেছিল, দুর্জনের মুখোশ খুলে দেওয়াই ভাল, তবু এতদিন দেননি কেন? এতদিন বলেন নি কেন?

শোনামাত্র ধৈর্য গেছে গার্গীর, সমস্ত মুখ আরক্ত।—কারো মুখোশ নিয়ে আমার মাথা ঘামানো দরকার হয়নি তাই বলিনি, কিন্তু এবারে বলতে হবে।

—বলুন। মুখের হাসি গেছে, কিন্তু গলার স্বর নির্লিপ্ত।—বলবেনই যখন, আরো কিছু জানিয়ে দিই আপনাকে। এত যত্ন আর স্নেহের পরেও আপনার বাবার কাছে অনেক কথা গোপন করেছি আমি। তিনি জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অন্য-রকম বলে এড়িয়ে গেছি।

গার্গী চেয়ে আছে। চেয়ে আছে সুশান্তও। সমস্ত লুকোচুরির অবসান ঘটানোর একটা দুর্বার ঝোঁক হঠাৎ যেন জ্বলতে জ্বলতে মাথার দিকে উঠে আসছে। তার প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে তাই দেখে নিচ্ছে। দু'এক পা সামনে এগিয়ে এসে বলল, আমি বিবাহিত, বউ নেই অবশ্য, পাগল ছিল, মরে গিয়ে আমাকে অব্যাহতি দিয়েছে। আমি গরীবের ছেলে ছিলাম, এই টাকা-পয়সা বাড়ি-গাড়ি সব ওই বউয়ের দৌলতে হয়েছে।···আপনাকে সুন্দর মুখের আড়ালে যে কুৎসিতের চেহারাটা আঁকার কথা বলেছিলাম একদিন, সেটা মিথ্যে নয়···মেয়েরা আমার অনেক ক্ষতি করেছে, তাই বাইরের মেয়ে ছেড়ে নিজের আত্মীয়াদের মান-মর্যাদা পর্যন্ত আমি তছনছ করে দিতে চেয়েছি—আপনার দিকেও যে খুব ভদ্রলোকের মত এগোইনি আমি, সেও তো জানেন—আমার এই স্বভাবই আমি ফিরে পেতে চেষ্টা করছি, বুঝলেন?

গার্গী দত্ত স্তব্ধ খানিকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে রক্ত উঠেছে মুখে।—আপনি গোড়ায় বলেছিলেন দিনকতকের জন্য বেড়াতে এসেছেন এখানে···কবে যাবেন?

– যেতে চাইছি, যেতে পারছি না। আরো এগিয়ে এলো, শুধু তোমার জন্যে যেতে পারছি না, বুঝলে? তোমার ছবি আঁকার ঘর

আর তুমি দুজনেই আমাকে ধরে রেখেছ। আমি আমার নিজের মধ্যে যে গরীব ভদ্রমানুষটাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছি—সে আবার ফিরে আসতে চায়, আমাকে ভাল হবার লোভ দেখায়, তোমার হাতের ছোঁয়ায় সত্যিকারের কুৎসিতও সুন্দর হতে পারে কিনা এই চিন্তার পাগলামি আমার মধ্যে উঁকিঝুঁকি দেয়। আরো শুনবে? আরো কিছু দেখবে?

বড় বড় পা ফেলে তাকের পাতলা পর্দাটা একটানে সরিয়ে ফেলল। সেখানে মদের বোতল, মদের গেলাস।—দেখলে? মন ভাল না থাকলে আমি মদে ডুবে থাকতে পারি, কিন্তু তোমার কাছে আসার পর ক'দিন ধরে তাও পারছি না, ভিতর থেকে কে নিষেধ করতে চায় —তুমি সব মেয়ের থেকে বেশি ক্ষতি করেছ আমার, সকলের থেকে বেশি—

উত্তেজনার মুখে থেমে গেল। তারপর ঠাণ্ডা সংযত স্বরে বলল, যান, এবারে গিয়ে বাবাকে বলুন।

গার্গী চলে এসেছে। বাবাকে দু'কথায় কি বলে এলো খেয়াল নেই। মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করেছে অনেকক্ষণ পর্যন্ত। নিজের মুখের খোলশ নিজেই লোকটা টেনে খুলেছে। মেয়েদের প্রতি এমন বিকৃত বিদ্বেষ গার্গী দত্ত আর বুঝি দেখেনি। শালীনতা ভুলে তাকেও 'তুমি' করে কথা বলেছে। যা বলেছে আর যা দেখিয়েছে, সে-সব যেন কানের ভেতর দিয়ে আর চোখের ভিতর দিয়ে আরো ভিতরের কোথায় বিচিত্র এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

রাতের শয্যায়ও সেটা থামেনি। বরং বেড়েছে। সেই অস্বস্তিকর আলোড়নের মধ্যেই আস্তে আস্তে চোখের সামনে পুরুষের বেদনার্ত ক্ষোভের একটা মূর্তি ভেসে উঠছে। সেই মুখ সুশান্ত সরকারের।

…আরো আশ্চর্য, এত সবের পরেও সেই মুখ কুৎসিত লাগছে না।

আর তার খানিক বাদেই দু'কান উৎকর্ণ। পাশের বাড়ির দোতলায় সেতার বাজছে। রাতের নিঃসীম নীরবতা সুরের রেশের মধ্যে ডুবে ডুবে যাচ্ছে।…

এককালে এই সব রাগ-রাগিণীর সঙ্গে মন্দ পরিচয় ছিল না

গার্গী দত্তর। সুরে সুরে দীপক রাগের রক্তিম মূর্তি ওই সুশান্ত সরকারের মুখখানার সঙ্গেই যেন এক হয়ে যাচ্ছে। দীপক, নবীন, অগ্নিবর্ণ, তার পরনে রক্তবাস, গলায় গজ-মুক্তার মালা। যে মত্ত-হস্তীতে চড়ে দীপক নিবিড় নিশাকালে গিরি-প্রান্তরে ভ্রমণরত, সে বুঝি এই সুরেরই মত্তহস্তী। এই সুর-প্রবাহে পর্বতের গাছ লতা পাতা সব জ্বলে উঠতে পারে।

অনেক রাতে বাজনা থেমেছে। গার্গীর খেয়াল হল সে শয্যায় শুয়ে নেই, বসে আছে। সম্ভব হলে সে এক্ষুনি ওই বাড়ির দোতলায় উঠে যেত—কি দেখতে বাকি এখনো, কি বুঝতে বাকি—তাই দেখে আসত, বুঝে আসত।

তারপর এই রাত।

সুরের গমকে আজও তাকে বিছানায় উঠে বসতে হয়েছে। সুরের বাহন আজ কানাড়া। তার বীর বেশ, তার লাজ-লজ্জার ভয় নেই, তার হাতে করবাল, কপূরচর্চিত মুখ, নবঘননন্দিত কেশদাম—বীর স্তাবকের মাঝে সে অমিয়কান্তি, সুবর্ণোজ্জ্বল।

আজও ওই বাড়ির দোতলায় উঠে যেতে ইচ্ছে করছে গার্গীর। গেলে কি দেখবে? সুরে সুরে যে মূর্তি এগিয়ে আসছে তার দিকে, তাকেই দেখবে?

পরদিন।

মাসে একদিন করে বাবার মন্দিরে যান অবিনাশ দত্ত। বাবার মন্দির বলতে বৈদ্যনাথের মন্দির। আগে স্ত্রী যেতেন, এখন স্ত্রী নেই, তাই তিনিই গিয়ে পুজো দিয়ে আসেন। সঙ্গে মেয়ে থাকে।

এবারের তারিখটা সুশান্তকে আগে বলে রেখেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, বাহন নিয়ে রেডি থেকো, তোমার গাড়ি থাকায় আমারই সব থেকে সুবিধে হয়েছে।

পায়ের ব্যথায় যাওয়া হবে না ভেবেছিলেন। ক'টা দিনের তোয়াজে ব্যথা কমের দিকে। তাই মেয়েকে বললেন, চল্, ঘুরেই আসি—

কিন্তু কি ভেবে সুশান্তকে আর খবর দিলেন না তিনি। রাতের

বাজনা তাঁর কানে আসেনি, রাতের খাওয়াটি সারা হলেই তাঁর ঘুম পায়। কিন্তু তবু মেয়ের দিকে চেয়ে কিছু একটা ব্যতিক্রম অনুভব করেছেন। আর এ দুদিনের মধ্যে সুশান্তও আসেনি। একটা খবরও পাঠায়নি। অথচ সকালে দুপুরে এক-একবার তাকে গাড়ি নিয়ে বেরুতে দেখেছে।

মেয়েকে নিয়ে সাইকেল-রিক্শয় ওঠার আগেই তার গাড়িটা সামনে এসে দাঁড়াল। অবিনাশবাবুর দিকে ঘার ফিরিয়ে সুশান্ত বলল, আমার তো নিয়ে যাবার কথা, আবার রিক্শ কেন?

বিব্রত মুখে অবিনাশবাবু বললেন, শরীর খারাপ নিয়ে তুমি আবার···

কি করবেন ভেবে না পেয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন। তারপর আরো অবাক।

মেয়ে যেন তন্ময় চোখে ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছে।

সুশান্ত বলল, আমার শরীর বেশ ভাল আছে, উঠুন—

অতএব রিক্শ বিদায় করে দিতে হল। মেয়ের মুখেও কোন-রকম আপত্তিব লক্ষণ না দেখে নিশ্চিন্ত বোধ করলেন তিনি।

এখানেই অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা।

বৃহৎ কিছু নয়, কিন্তু এই উপলক্ষেই গার্গীর ভিতরে ভিতরে একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে গেল।

পাণ্ডার মারফৎ পুজো দিয়ে সকলে সামনের প্রশস্ত চত্বরে এসে দাঁড়ানোর পরেই হঠাৎ এক বিপত্তি বাধিয়ে বসল সুশান্ত।

···দেবী মাতার মন্দিরের সামনে বলির যূপকাঠ একটা। তার সামনেই পা-গুলো ছটকাচ্ছে একটা মস্তকচ্যুত ছাগ-নন্দন। পর পর আরো দুজন পাঁঠার গলায় বাঁধা দড়ি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। এবারে তাদের বলি উৎসর্গ হবে।

সুশ্রীমত একজন পাণ্ডার কোলে বছর ছয়েকের একটা ফুটফুটে ছেলে এই দৃশ্য দেখে ভয়ে একেবারে নীল হয়ে গেছে—সে প্রাণপণে সেখান থেকে পালাতে চাইছে। তাই তাকে কোলে জাপটে আটকে রেখেছে সেই পাণ্ডা, আর ওই ছিন্ন-মস্তক বলির রক্ত আঙুলে করে তার কপালে লাগাতে চেষ্টা করছে। আর শিশুর অবুঝ ভয় দেখে

হাসছে দাঁত বার করে।

পরের পাঁঠাটাকে টেনে-হিঁচড়ে কাঠগড়ার দিকে আনতে ভয়ে-ত্রাসে পাগলের মত ওই শিশু লোকটার কোল থেকে পিছলে নেমে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু লোকটাও তাকে বলি না দেখিয়ে ছাড়বেই না। দু'হাতে তাকে জাপটে ধরে রেখে হাসছে আর কি বলছে।

শিশুর মুখের ওই দিশেহারা আর্তত্রাস দেখে মুহূর্তের মধ্যে সুশান্তর মাথায় রক্ত চড়ল। দ্বিতীয় বলি কাঠ-গড়ায় চড়ানোর আগেই সে সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটাকে ধমকের সুরে বলল, ওকে সরিয়ে নিয়ে যান এখান থেকে, ভয় পেয়ে কি রকম করছে দেখছেন না?

আচমকা উৎপাতে লোকটা একটু থতমত খেল প্রথম। তারপর গম্ভীর মুখে জবাব দিল, দেখেছি। আপনি সরে যান ওখান থেকে।

—কি আশ্চর্য! রুক্ষ গলায় সুশান্ত বলে উঠল, দু'বছর দশ বছর বিশ বছর বাদেও এই থেকে ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যেতে পাবে ওই ছেলেটাব—এত ভয় যখন পাচ্ছে আপনি জোর করে ওকে এ-সব দেখাচ্ছেন কেন?

রাগত মুখে লোকটা জবাব দিল, আমার খুশি, আপনি সরবেন ওখান থেকে?

কি? আরক্ত মুখ সুশান্তর।—আপনার খুশি? কাঠগড়াটা আরো ঘেঁষে দাঁড়াল সে। আঙুল দিয়ে নিজের মুখ দেখিয়ে বলল, আগে তাহলে এই মাথাটাই ধড় থেকে নামাতে বলুন, তারপর ওই বলি হবে।

কয়েক নিমেষের মধ্যেই এক উত্তেজিত পরিস্থিতি। লোক জমে গেছে। অন্য পাণ্ডারা জোট বেঁধে এগিয়ে এসেছে। হট্টগোল, চেঁচামেচি, ভদ্রলোকেরা কেউ কেউ সুশান্তকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। ওদিকে রাগের মাথায় খাঁড়া উঁচিয়েই তেড়ে এসেছে এক পাণ্ডা। পারলে শুধু অবিনাশ দত্ত কেন, গার্গীও সুশান্তকে হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে।

কিন্তু সুশান্ত অনড়। তার এক কথা, ওই শিশুকে ওখান থেকে

না সরালে বলি হবে না।

সংস্কারে আঘাত লাগার ফলে অনেকেই ক্ষিপ্ত। তারা ঠেলে সরাতে চায় সুশান্তকে। উত্তেজনা আরো কতদূর গড়াত বলা যায় না। গলায় মালা কপালে সিঁদুরের তিলক-কাটা একটি বৃদ্ধ এগিয়ে আসতে চেঁচামেচি থামল। মনে হয় তিনিই প্রধান এখানকার। ব্যাপারটা শুনে তিনি ছেলে-কোলে লোকটাকে বললেন সরে যেতে। আক্রোশ সত্ত্বেও লোকটাকে যেতেই হল। হাসিমুখে বৃদ্ধ এবার সুশান্তকে বললেন, এবারে আপনিও কাঠগড়া ছেড়ে দিন।

নীরবে গাড়ি চালাচ্ছে সুশান্ত সরকার। পিছন থেকে গার্গী দেখছে তাকে। লোকটার সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ তখনো। বাবা তার প্রশংসা করছে, কিন্তু পাগলামির কথাও বার বার বলছে।

...গার্গীর মনে পড়ল, অপরের বাড়িতে ডাকাত পড়েছে টের পেয়ে এই লোকই গভীর রাতে একলা বন্দুক হাতে বেরিয়ে ডাকাত তাড়িয়েছিল। না, আজ তার মধ্যে কদর্য কুৎসিত কিছু দেখতে পাচ্ছে না। বরং এই রক্তবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে এক খ্যাপা গোঁয়ার শিশুকেই যেন দেখছে সে। কুৎসিত যা দেখেছিল, সেটা বিকৃতি।...লোকটা সেদিন বলেছিল তাদেরই জন্যে এই বিকৃতি। আজ গার্গীর সেটা অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। আর আজই সে উপলব্ধি করছে, সেই বিকৃতির একটা যাতনা ওই মানুষও ভোগ করছে বলেই সেদিন অমন সব কথা বলেছিল।

রাত্রি সাড়ে ন'টাও তো নয় তখন।

ওই দোতলার ঘরে সেতার বাজছে। গত দু'রাত যেমন বেজেছিল তেমনি। বাজনা যত নিবিড় হচ্ছে, গার্গী দত্তর ভিতরটা ততো অস্থির। কেউ যেন সুরে সুরে ডাকছে তাকে। ডেকেই চলেছে। আগেও এই ডাক শুনেছে—সাড়া দেয়নি। কিন্তু এই দিনটা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

পায়ে পায়ে বাবার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল সে। খেয়ে-দেয়ে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বিছানায় গা ঠেকালেই তাঁর নাক ডাকে।

তাই ডাকছে।

ঘর ছেড়ে গার্গী আস্তে আস্তে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সেতারের গমকে গমকে কেউ বুঝি সমস্ত বাধা-বন্ধ অতিক্রম করে তার মধ্য থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার জন্য হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে। ওই রাগ-মূর্তি মালকোষ—ধ্যানরূপ যার শান্ত গম্ভীর মদন-মোহন—মধুপান-মত্ত, রমণীর সঙ্গে রস-ক্রীড়ায় রত, অথচ ওই ভোগরাগ বীর-রসে লীলায়িত। প্রয়োজনে সে রক্তবর্ণ, তার সামনে শত্রু আনতমস্তক, বিজিত।

সুরে সুরে তন্ময়তার এক অতলস্পর্শ গভীরে বিচরণ করছে সুশান্ত সরকার। সেখান থেকেই মুখ তুলে তাকালো। দোরগোড়ায় গার্গী দত্ত দাঁড়িয়ে। সুশান্ত দেখছে, কমনীয় মুখ। কিন্তু তার হাত থেমে নেই। সুরের ওপর দখল যদি কিছু থাকে তো ওই মেয়েকে ঘরের ভিতরে এসেও দাঁড়াতে হবে।

এলো।

রাগ মালকোষ ধীরে ধীরে এক পরম প্রাপ্তির গভীরে এসে নির্বাণ লাভ করল।

সেতার রেখে সুশান্ত উঠে এল। সামনে এসে দাঁড়াল। খুব কাছে। হাতে করে গার্গীর মুখখানা একবারে চোখের ওপর তুলে নিয়ে দেখল। দু'জোড়া চোখের অপলক বিনিময়। সুশান্ত বলল, আমি জানতুম আজ তুমি আসবে।

গার্গী কি দেখছে? জানে না কি দেখছে। বলল, এভাবে ডাকলে না এসে পারি কি করে?

সুশান্তর হাত দুটো গার্গীর দুই কাঁধের ওপর নেমে এল। এই প্রাপ্তির গভীরে দাঁড়িয়েও তার কি যেন ভয়, কি যেন শঙ্কা। ব্যগ্র মুখে জিজ্ঞাসা করল, আজ কুৎসিত দেখছ না?

তার চোখে চোখ রেখে গার্গী মাথা নাড়ল। দেখছে না।

—কিন্তু পরেও যদি দেখো কখনো, তার দখল থেকে আমাকে তুমি ছাড়িয়ে আনতে পারবে না? টেনে তুলতে পারবে না? আশ্রয় দিতে পারবে না?

—সে-রকম দেখব কেন ?

—আমি জানি না, আমি জানি না। যে কুৎসিতকে তুমি দেখেছিলে সে অনেক—অনেকদিন আমাকে গ্রাস করে ছিল—একটা অভিশাপের মতই তাকে আমার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল—সেই আক্রোশে আমি পাগল হয়ে গেছলাম।

—গেছলে···এখন তো তা নও।

এবারে অস্বস্তি বোধ করেছে গার্গী। হাতের এই স্পর্শটাই অদ্ভুত লাগছিল। ওই গভীর দুটো চোখ, ওই মুখ, আরো সামনে নেমে আসছে। সেই সঙ্গে দু'হাতের আকর্ষণ নিবিড় হয়ে উঠছে। বাধা দেবার ক্ষমতা নেই গার্গীর। অধরের স্পর্শে সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল দুই একবার। এই বিনিময়ের জন্য মন একটুও প্রস্তুত ছিল না। তবু বাধা দেবার শক্তি নেই, অবকাশ নেই। সে শুধু নিঃশেষে হারিয়ে যেতে লাগল।

গার্গীর রাগ হয়, কিন্তু হাল ছেড়ে শেষ পর্যন্ত না এসেও পারে না। তাদের বাড়িতে সন্ধ্যার বাজনার আসর বন্ধই এক-রকম। বাবা ডাকলেও এটা-সেটা বলে সুশান্ত পাশ কাটায়। কিন্তু রাত্রিতে বাবা ঘুমোতে না ঘুমোতে তার ডাকাডাকি শুরু হবে। সেতারের ডাক, সুরের ডাক। যতক্ষণ না সে যাবে, বেহাগের আলাপে এক আত্মার বেদনা যেন কান্নার রূপ ধরে আছড়ে আছড়ে ভাঙতে থাকে। মীড়ের কাজগুলো যেন তার বুকের ভিতরে এসে মোচড় দিতে থাকে।

সেদিনও গার্গী না গিয়ে পারল না। গেল বাজনা প্রায় শেষ হবার মুখে।

হেসে সেতার রেখে সুশান্ত বলল, এসো, আজ দেরি দেখে আমার আশা বাড়ছিল, ভাবছিলাম বড়হংসিকা আসে কি মালবী আসে।

রাগ করা হল না। একদিনও হয় না। কাছে বসে গার্গী জিজ্ঞাসা করল, তারা কারা ?

মুখের দিকে চেয়ে সুশান্ত মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল। তারপর জবাব দিল, পণ্ডমাঙ্গনা বড়হংসিকা, তার মুখে হাসি, চোখে

চঞ্চল মাধুর্য, প্রিয়সন্নিধানে হৃষ্টচিত্ত রোমাঞ্চিত—সর্বত্র সমাদর বড়হংসিকার।

—আর মালবী ?

—মিলন-লগ্নের প্রত্যাশায় অধীরা তিনি, প্রিয়জনবিরহে আহার-নিদ্রা ছেড়েছেন।

গার্গী ভ্রূ-ভঙ্গি করল, খুব শখ যে! হাসল তারপর।—তা কে এলো দেখলে ?

তারই চোখের ভিতর দিয়ে ওই দৃষ্টিটা যেন এক দুর্লভ পরিতৃপ্তির আনন্দে ডুবে যেতে লাগল। সামনে ঝুঁকে গার্গীর হাত ধরল।—দুজনেই এল, একসঙ্গে মিলে-মিশে দুজনে।

সরে বসতে চেষ্টা করে গার্গী তেমনি হাসিমুখেই বলল, তাহলে আমি পালাই—

সুশান্ত ধরে রাখল। তেমনি চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ কি মনে পড়তে আরো ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল, বাবাকে বলেছ ?

—তেমন কিছু বলিনি, তবে তাঁর বুঝতে কিছু বাকি নেই।

অসহিষ্ণু তাগিদ সুশান্তর।—কিন্তু বলছ না কেন ?

—আর দিন-কতক যাক, শিগগীরই দাদারা আসবে, তখন বলব।

—দাদারা আসবে…এমনি ?

এই সময়ে প্রতিবারই দুই-একদিনের জন্য আসে। গার্গী হাসতে লাগল, ছেলেবেলায় ঘটা করে আমার জন্মদিন না করলে আমি খুব রেগে যেতাম। এখন বারণ করলে বাবা রেগে যায়—আর বাবাকে খুশি করার জন্য দাদাদের আসতে হয়।

উৎফুল্ল আগ্রহে সুশান্ত জিজ্ঞাসা করল, কবে, কবে সেই দিন ?

একটু ভেবে গার্গী বলল, ছ'দিন বাদে।

দেরির জন্য আর ক্ষেদ নেই যেন সুশান্তর। খুশিমুখে কিছু বলতে গিয়ে কি মনে হতেই থমকাল আবার।—কখন জন্ম তোমার, দিনে না রাত্রিতে বল তো ?

—রাত্রিতে। রাত এগারোটায়—কেন ?

—চমৎকার! ছেলেমানুষের মতই উৎফুল্ল আনন্দে তাকে আরো কাছে টানতে চাইল সুশান্ত।—সেদিন ঠিক রাত এগারোটায় আমি

তোমাকে কিছু উপহার দেব—তোমাকে এখানে এই ঘরে আসতে হবে তখন।

গার্গী অবাক।—সে আবার কি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—জানো, সত্যি আমার মধ্যে কল্পনার এক মহীয়সী মেয়ে আছে—আমার সব থেকে প্রিয় সে, কিন্তু আমার মধ্যে বিকৃতি ছিল বলেই তাকে আমি ডাকিনি কখনো—তোমার মধ্যে তাকে আমি হঠাৎ দেখতে পাচ্ছি, ভয়ানক দেখতে পাচ্ছি, সেদিন তুমি এলে সে-ও আসবে, আমার চোখের সামনে তোমরা দুজনে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যাবে।

ছেলেমানুষি দেখে গার্গী হাসবে কি কি করবে জানে না। কৌতূহলও কম নয়।—কে সে?

—রাগনট-প্রিয়া নাটিকা। নাটিকা চিরনবযৌবনা—কাঞ্চন-সীমন্তিনী, গলায় মুক্তোর মালা, হাতে শাঁখা আর সোনার কঙ্কন, বাহুতে বাজুবন্ধ, রণক্ষেত্রে অজেয় অধীরা—আঁধারনাশিনী নাটিকা চিরবিজয়িনী—

—কি সর্বনাশ, সে আর আমি এক!

—এক এক, একেবারে এক—তুমি আসবে কিনা বল?

—পাগল নাকি, আমি—

বলার অবকাশ পেল না। আচমকা আকর্ষণে ওই বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে হল। আর সেই সঙ্গে দুই ঠোঁটের নিষ্পেষণে মুখের কথাগুলো যেন কেড়ে নিতে লাগল।

—আসবে?

—কি মুশকিল, দাদারা থাকবে, আমি-

দস্যুর মতই অধর-নিপীড়নে আবার থামিয়ে দিল। দম-বন্ধ হবার দাখিল গার্গীর, মাথাটা ঝিমঝিম করছে।

—আসবে? বল আসবে!

কোন-প্রকারে তার নাগাল থেকে মুখ সরাল গার্গী। বলল, হ্যাঁ, আমি অত রাতে আসি, আর তুমি এই সব দুষ্টুমি শুরু করো।

—না, কক্ষনো না—দুষ্টুমি করব না—আসবে? আসবে?

চোখে-মুখে সমস্ত অস্তিত্বে এমন আকুতিও গার্গী আর বুঝি

দেখেনি। এই নিবিড় স্পর্শে তার সর্বাঙ্গ অবশ যেন। চেয়ে আছে মুখের দিকে, দেখছে।

মাথা নাড়ল। আসবে।

বারো

কোন এক বিদগ্ধ কবি যেন বলেছিলেন, পুরুষের প্রেম-প্রীতি জীবনের একটা অংশ, কিন্তু মেয়েদের সর্বস্ব। দুনিয়ায় একমাত্র সুশান্ত সরকারের বেলায় বুঝি এ বচন একেবারে উল্টে দেওয়া যেতে পারে। এটুকু হারিয়ে সে জীবনের সর্বস্ব খুইয়েছিল, আর এটুকু পেয়ে জীবনের সর্বস্ব যেন দ্বিগুণ করে তার কাছে ফিরে এসেছে।

এসেছে বাঁধ-ভাঙা বন্যার মত। এসেছে মরু-পথে হারানো শুকনো নদীর বুকে দু'কুল-ভাসানো প্লাবনের মত।

নিজের মধ্যে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছে না সুশান্ত সরকার। কাল রাতে মনে হয়েছিল ছ'টা দিন ছ'টা মিনিটের মতই কেটে যাবে। অথচ সকাল হতে না হতে ভেতরটা অস্থির। এ অস্থিরতার যাতনা নেই অবশ্য, তবু অধীর অবুঝ আবেগের মত এক সকালের মধ্যেই কতবার যে তাকে কোণের ওই বারান্দার দিকে ঠেলে নিয়ে গেল, ঠিক নেই। ওখান থেকে ও-বাড়ির অনেকটাই দেখা যায়। ...যদি একবারটি দেখা মেলে। দেখা একবার ছেড়ে অনেকবার মিলেছে। গার্গী না দেখুক সুশান্ত দেখেছে। ব্যস্ততার মধ্যে দেখেছে, অলস-মন্থর চলার ছাঁদের মধ্যে দেখেছে। একটা অদ্ভুত পরিতৃপ্তি নিয়ে ফিরে এসেছে। মনে হয়েছে, আর দরকার নেই, শুধু ওটুকুই দেখতে চেয়েছিল, শুধু ও-রকমই দেখতে চেয়েছিল।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হেসেছে। ওই দুটো চোখ আগেও মেয়েদের দেখলে সচকিত হয়ে উঠত, শিরায় শিরায় তাপ ছড়াতো, সেই চোখে শুধু অপমানের বাসনা লেখা থাকত।

...কিন্তু এ-মেয়ে কি জাদু জানে?

জাদু জানে কিনা দেখার জন্যেই যেন আবার বারান্দার কোণে এসে দাঁড়িয়েছে।

সকালটা কাটল এক-রকম করে। দুপুরটার যেন আরো শম্বুক গতি। কাটে আর না। দেখা পাবে না জেনেও কতবার যে বারান্দার কোণে এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক নেই।

বিকেলের দিকে হঠাৎ মাথায় খেয়াল চাপল তিন-চারদিনের জন্য একবার কলকাতা থেকে ঘুরে আসবে। আজই যাবে। টাকা-পয়সা কিছু নিয়ে আসা দরকার, সেটা বড় কথা নয়। ব্যাঙ্কে একটা টেলিগ্রাম করে দিলেই টাকা এসে যাবে। আসলে প্রাপ্তির যে গভীরে ডুবে আছে তার স্বাদ নেবার জন্যেই কোথাও যেন যাওয়া দরকার।

বরাত প্রসন্ন। বারান্দার কোণে এসে দেখে অবিনাশবাবু একলা রিকশয় চেপে কোথায় যাচ্ছেন। বোধহয় আশ্রমের দিকে। গার্গী বাইরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। তাঁর রিকশ চোখের আড়াল হতে সে সোজা ঘুরে এ-বারান্দার দিকে চোখ তুলে তাকালো। গম্ভীর। দু'চোখে ছদ্ম ভ্রূকুটি।

হাতের ইশারায় সুশান্ত তার কাছে আসার অনুমতি প্রার্থনা করল। তেমনি হাতের ইশারায় গার্গী তার আর্জি নাকচ করে দিল। সুশান্ত রেলিং টপকে ঝাঁপ দেবার ভয় দেখালো। গার্গী ঘরে পালিয়ে গেল।

রেলিং টপকে না হোক, কয়েক লাফে সিঁড়ি টপকে সুশান্ত এ-বাড়িতে হাজির। গার্গী ঘরে বসে আছে। গম্ভীর মুখে হাসির উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। জানে, আসবে।

সামনে আসতেই তেমনি ভ্রূকুটি করে তাকালো। বলল, সকাল থেকে মিনিটে মিনিটে ওভাবে বারান্দায় এসে এ-বাড়ির দিকে তাকাচ্ছিলে কেন?

—সুশান্ত সত্যিকারের অবাক।—কি আশ্চর্য! তুমি দেখেছ?

—না তো কি গুণে বলছি?

গলা দিয়ে একটা চাপা আর্তনাদ বার করল সুশান্ত।—দেখেও একটা বার ফিরে তাকালে না!

হাসি চেপে গার্গী জবাব দিল, আমি কি তোমার মত ছেলে-

মানুষ ? পরক্ষণে আবার চোখ পাকাতে হল তাকে।—এই! বোসো চুপ করে—এখানে না, ওই সোফাটায় বোসো।

সুশান্ত হেসে ফেলল, তার মত ছেলেমানুষ কিনা দেখার জন্য আর এগোনো হল না। নির্দেশ মতই বসল। বলল, তথাস্তু, তারপর ?

—এক পেয়ালা চা করে দিই, খাও।

—একেবারে গদ্য ছন্দ। চা চাই না।

গার্গী হেসে ফেলল, আমি কি তোমার মত বাজাই যে ছন্দ জানব!

হাসছে সুশান্তও। চেয়ে আছে। পরিপূর্ণতার রূপ দেখছে একখানা। বলতে ইচ্ছে করছে, মানুষের জীবনে এইটুকুই দুর্লভ ছন্দ। বলল না। বড় বেশি বোকা-বোকা শোনাবে।

—আজ রাতের গাড়িতেই কলকাতা যাব ঠিক করলাম—

গার্গীর চোখে বিস্ময়ের আভাস একটু।—সে আবার কি!

—হ্যাঁ, দু'চারদিনের জন্য যাব, একটু কাজ-কর্ম সেরে আসি।

গার্গী তবু অপেক্ষা করল একটু, তারপরে বলল, তুমি তো পাকা-পোক্ত বেকার, তোমার আবার কাজ-কর্ম কি ?

ঠাট্টা করেই বলেছে, তবু কি-রকম যেন হঠাৎ একটু অস্বস্তি বোধ করল সুশান্ত।...কেন, নিজেও জানে না। সেটা ঠেলে সরিয়ে বলল, এখানেই বা ছ'ছটা দিন আমি কাটাই কি করে, একদিনেই তো কাহিল অবস্থা। এই ছ'দিনের মধ্যে তো আর বাজাতেও পারব না।

গার্গী অবাক।—কেন ?

—না। ছ'দিন বাদে চির-বিজয়িনী নাটিকা আসবে আমার ঘরে, এর জন্য আত্মশুদ্ধি দরকার।

গত রাতের আকুতি আর আবেদন মনে পড়ল গার্গীর। ছ'দিন বাদে, তার জন্মদিনে আর জন্মলগ্নে, অর্থাৎ রাত এগারোটায় সে তার ঘরে যাবে কথা আদায় করে ছেড়েছে। একই সঙ্গে তার আর রাগ-সম্রাজ্ঞীর আবাহন ঘটবে। আবারও হেসেই উঠল গার্গী।—তুমি আচ্ছা পাগল।...তা এখানকার ব্যাপার যখন, আত্মশুদ্ধিও এখানে বসেই করা যেতে পারে।

দু'কান ভরে শোনার মতই বটে। সুশান্ত উৎফুল্ল মুখে বলে

উঠল, না, একদিনেই যা হাল আমার, একেবারে উল্টো ব্যাপারও কিছু ঘটে যেতে পারে—আমার চরিত্রখানা কি সে-তো তোমার ওই ত্রিকূট পাহাড়েই জানা হয়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে মুখ লাল গার্গীর। সভয়ে বলে উঠল, থাক বাপু তুমি কলকাতাতেই যাও।

এবারে আর বাধা দেওয়ার ফুরসত মিলল না। নিজের সোফা ছেড়ে উঠে এসে সুশান্ত তার গা ঘেঁষে বসে পড়ল।—ক'টা দিন দেখতে পাব না, এবারে আমার এখানে বসার রাইট অস্বীকার করতে পারবে না। হাসতে লাগল।—তিন-চারদিনের মধ্যেই চলে আসব, যাই···কেমন ?

ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস, চোখে চোখ রেখে গার্গী মাথা নাড়ল। অর্থাৎ অনুমতি দিল। তারপর বলল, বাবা এখানে থাকলে বলত, যাওয়া নেই, ঘুরে এসো।

রাতে এমনিই ঘুম কম, তার ওপর ঢিমেগতির ট্রেনে চলেছে, দু'চোখের ধারেকাছে ঘুম নেই সুশান্তর। চেষ্টাও নেই। তার সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে অননুভূত একটা তৃপ্তি ছড়িয়ে আছে যেন ? এমনি চুপচাপ বসে লালন করার মত সেটুকু।

···সে রওনা হবার আগেও অবিনাশবাবু ফেরেননি। গার্গী বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। বারান্দার আলোটা জ্বলছিল। হাসি-মাখা মুখখানা দেখে সুশান্ত রিক্‌শ থেকে না নেমে পারেনি। ড্রাইভার থাকলে গাড়ি নিয়ে বেরুতো, গার্গীকেও স্টেশন পর্যন্ত ধরে নিয়ে যেত। আর, গার্গী যদি তখনো একবার বলত, যেতে হবে না, সুশান্ত সানন্দে যাওয়া বাতিল করে বাঁচত।···ব্যস্ত-সমস্ত মুখ করে সুশান্ত বারান্দায় উঠে এসেছিল, বলেছিল, একটা দরকারী ব্যাপারই ভুলে বসে আছি। শোনো···

এক হাত তার কাঁধে রেখে অন্য হাত নিজের পকেটে চালান করে দিতে দিতে তাকে ঘরে নিয়ে এলো। যেন দরকারী ব্যাপারটা পকেট থেকেই বেরুবে।···ঘরে পা দিয়েই চোখের পলকে দস্যুর মত আচমকা যা করে বসল, গার্গী হতচকিত। সুশান্ত খানিকক্ষণ পর্যন্ত

নিঃশ্বাস নেবার বা ফেলার অবকাশও দেয়নি ওকে। তারপর অবশ্য একরকম ঠেলেই সরিয়েছে ওকে, কিন্তু ততক্ষণে সুশান্তর দরকারী ব্যাপারটা অনেকখানি সুসম্পন্ন।

...অধরের সেই উষ্ণ ঘন স্পর্শ দুই ঠোঁটের ভিতর দিয়ে যেন সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে সুশান্তর।

কি মনে পড়তে ভিতরটা সচকিত একটু।...বিকেলে গার্গী ঠাট্টা করেই বলেছিল, তোমার আর কাজ কি, তুমি তো পাকা-পোক্ত বেকার। কথাটা তখনো কানে লেগেছিল।...এখন আবার মনে পড়ল। অস্বস্তি বোধ করছে কেমন। অদূর ভবিষ্যতের জীবনযাত্রায় ওই সত্যটা যেন নিছক ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দেবার মত নয়।...টাকা অনেক আছে বটে। দুজনের সংসারযাত্রার অনুপাতে অঢেল। কিন্তু তার প্রতিটি কপর্দক আর এক মেয়ের মৃত্যুর ফসল। আগে কখনো মনে হয়নি, কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে তার সমস্ত বিত্তের কণায় কণায় ওই এক মৃত্যুর দাগ লেগে আছে। ওই দাগ-লাগা বিত্তের নির্ভরে জীবনের এই দ্বিতীয় দোসরের অভ্যর্থনা ভয়ানক বেমানান লাগছে তার। এই দোসর গার্গী বলে আরো বেশি বেমানান লাগছে। মনে হচ্ছে, ওই দাগ-লাগা বিত্তের জৌলুস গার্গী অন্তত সম্ভ্রমের চোখে দেখবে না। মুখে যদি এ নিয়ে কিছু না-ও বলে, ভিতরে ভিতরে এই সত্যটা যে অদূর ভবিষ্যতে পীড়াদায়ক হবে, সুশান্তর তাতে কিছুমাত্র সংশয় নেই।

কিন্তু সুশান্ত কি করতে পারে? কি জানে সে? লেখা-পড়া ছে। শিখেছিল এ ক'বছরে তার সবটাই সাদা হয়ে গেছে প্রায়। চলেছে চাকরি করা তার ধাতে পোষাবে না, আর চাকরি দিচ্ছেই চেষ্টা করলে গান-বাজনার প্রতিষ্ঠান খুলে বসতে র ওখানে আর মনে হতে উৎসাহ বোধ করল। তাই করবে। কা গেছেন।...কোথায় করেই গড়ে তুলবে সেটা। গার্গী পাশে থ পারবে।...তবে তাতেও গোড়ায় অন্তত ও ওপরেই নির্ভর করতে হবে। কিন্তু তাতে বি সে ঋণ বলেই ধরে নেবে। প্রতিষ্ঠান দি ছে। মুখখানা আগের ঋণের এক-কপর্দক পর্যন্ত শোধ করে দে

সদয়-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, অম্বরের খবর কি ?

—ভাল।·· কাগজে দেখেননি ?

সুশান্ত অবাক একটু। এতদিনের মধ্যে খবরের কাগজের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না বটে।—না। কি হয়েছে ?

নন্দিতা জবাব দিল, ওই ব্যাপারের তিন-চারদিনের মধ্যে সমস্ত দলটাই ধরা পড়েছে। পুলিস তাদের কলকাতায় নিয়ে এসেছে। এখন বিচার চলছে।

সুশান্ত অবাক একটু। ধরা পড়েছে সেই আনন্দে কি নন্দিতার মুখখানা এই খবর দেবার সময়েও এমন খুশি-খুশি দেখাচ্ছে। এক-ভাবে না একভাবে তার শাস্তি হবে এই আনন্দে ? কিন্তু সে-রকমও মনে হল না। কপালে আর সিঁথিতে ওই জ্বলজ্বলে সিঁদুর দেখেই মনে হল না।

একটু চুপ করে থেকে নন্দিতা নিজে থেকেই বলল, জেল তো হবেই···এখন কম হলেই বাঁচি।

সুশান্তর বিস্ময় বাড়ছেই। সেই সঙ্গে কি এক অজ্ঞাত কৌতূহলও। জিজ্ঞেস করল, ধরা-পড়ার পর তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে ?

—কতবারই তো হয়েছে। আরো কি বলার মুখে থমকালো একটু। চোখেমুখে আশার আলো লাগল যেন একপ্রস্থ। বলল, এবারে আর আমাকে সে ভাল হবে কথা দেয়নি, কিন্তু আমি জানি তার সমস্ত নোংরামি পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে এখন, আরো যাবে। জেল থেকে ফিরে আসার পর দেখলে আপনিও আর তাকে ঘৃণা করতে পারবেন না।···ওই মানুষের চোখে এর আগে জল দেখিনি কখনো। সামনে গেলে আমার দিকে চেয়ে থাকে, আর শুধু বলে, আমার যা হয় হোক, কিন্তু তোমার কি করে গেলাম। আপনি বিশ্বাস করুন, কোন্‌টা মুখের কথা আর কোন্‌টা মনের কথা আমি ঠিক বুঝতে পারি।

সে অবিশ্বাস করলেও যেন ক্ষতি। বুকের ভিতরটা কেমন ধড়ফড় করে উঠল সুশান্তর।···মাত্র কটা দিনের মধ্যে তার চোখের সামনে সমস্ত দুনিয়াটাই কি বদলে গেল ? তার সব কালো ঘুচে গেল ?

তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আমি বিশ্বাস করছি, মনে-প্রাণে বিশ্বাস করছি—তোমার মত মেয়ে আর কত দুঃখ পাবে?···বিচার যে চলছে, তুমি চেষ্টা-চরিত্র করছ কিছু?

তেমনি খুশিমুখে নন্দিতা বলল, যতটা সম্ভব করছি। আপনার বোন কাজল সরকারের সঙ্গে এখন কিন্তু খুব ভাব হয়ে গেছে আমার।···

কার কার সঙ্গে বেশি খাতির ছিল পুলিশ ঠিক টেনে বার করেছে। কাজল সরকারের নাম করে আমাকে জেরা করতে আমি বললাম, কি-চ্ছু জানি না। তারপরেই ছুটলাম ওর কাছে, আগে ভাগে গিয়ে না পড়লে মুশকিল হত, ওরা তাকে সাক্ষী হিসেবে পাবার তালে ছিল।···আমার পরিচয় জেনে কাজল প্রথমে রেগেই গেছল, ভাল করে কথাও বলতে চায়নি। সব খুলে বলতে আর সেই সঙ্গে আপনার নাম করতে একেবারে অন্য মেয়ে। সত্যি, এত ভাল মেয়ে আমি ভাবতেও পারিনি।···এখন তো কলকাতায় এলেই আমার সঙ্গে দেখা না করে যায় না।

সুশান্ত কান পেতে শুনছিল। শেষের কথা শুনে অবাক।—কলকাতায় এলে মনে···এখানে থাকে না?

—ও মা, আপনি দেখি কিছুই খবর রাখেন না। সে তো উলুবেড়ের কাছে কোন এক আশ্রমের স্কুলে মাস্টারী করছে। মাইনে যা পায় তাতে একজনেরই ভাল করে চলে না। আমি এখানেই একটা কাজ দেখে নিতে বলেছিলাম। ও বলে, না দিদি ওখানেই খুব ভাল আছি। শনি-রবিবার আর ছুটিছাটায় মায়ের কাছে আসে।

সুশান্ত নির্বাক।

সেই রাতেই আবার দেওঘরের গাড়িতে চেপে বসেছে। নন্দিতার ওখান থেকে বেরিয়ে আর এক মুহূর্ত ভাল লাগেনি। থেকে থেকে যেন বাতাসের অভাব বোধ করেছে। আর কেবলই তার আশ্রয়ে ফিরে যাবার জন্য ভেতরটা লালায়িত হয়ে উঠেছে। নিশ্চিত, নিরাপদ আশ্রয় বুঝি ওই এক জায়গায় ছাড়া আর কোথাও নেই, সেখানকার

একজন ভিন্ন আর কেউ নেই।

···সেই আশ্রয়ে ফিরে গিয়ে তবে সুস্থ মাথায় চিন্তা করতে পারবে। কিছু তার করার আছে কিনা তারপর ভাববে। আর ভাবতে যদি নাই পারে, আশ্রয় যে দিয়েছে, সে-দায় তারই ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে।

তেরো

কিন্তু বিপর্যয় আরো কত দ্রুততালে এগিয়ে এসে তার প্রতীক্ষায় মুখব্যাদান করে বসে আছে, জানত না।

সাইকেল-রিক্শ অবিনাশবাবুর বাড়ি পেরিয়ে তার দরজায় দাঁড়াল যখন, ভোরের আলো তখনো খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। দোতলায় উঠে সেই ছোট বারান্দায় এসে সতৃষ্ণ চোখে সুশান্ত এ-বাড়ির অন্দরমহলের দিকে তাকালো। গার্গী খুব ভোরে ওঠে। যদি উঠে থাকে, যদি দেখা হয়।

দেখা হল না।···ও-যে এরই মধ্যে ফিরে আসবে, কি করে জানবে। ভিতরটা খুশিতে ভরপুর সুশান্তর। দেখে অবাক হবার ভান করবে বটে, কিন্তু কেন এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলো সেটা ওই মেয়ে ঠিক বুঝবে।

রাতে ঘুম হয়নি। একটু গড়িয়ে নিতে গিয়ে ঘুমিয়েই পড়ল। উঠল যখন, বেশ বেলা। সুশান্ত তাড়াতাড়ি বারান্দায় এসে দাঁড়াল।—ও ফিরেছে সেটা এতক্ষণে টের পেয়ে গেছে নিশ্চয়। কিন্তু প্রায় আধঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও চোখের তৃষ্ণা মিটল না।

তার বদলে দুটি নতুন মুখ চোখে পড়ল। আর তার ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই একটা ব্যতিক্রমের আভাস যেন বাতাস ধরেই ভেসে আসতে লাগল ওদিক থেকে।

প্রথম দেখেই সুশান্ত অনুমান করেছে তারা গার্গীর দুই দাদা। নিজেই গিয়ে আলাপ করে আসবে ভাবছিল। তার আগেই ব্যতিক্রমের চাবুকটা যেন শপাং করে মুখে এসে পড়ল।

…ওদিকের ভিতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দুই ভাই এই বাড়ির দিকেই চেয়ে আছে। তাদের পিছনে পাংশু বিমূঢ়মূর্তি অবিনাশ দত্ত। সুশান্তর সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া মাত্র ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে গেলেন।

তাঁর দুই ছেলে নড়ল না। সেখানেই দাঁড়িয়ে দুই জোড়া চোখ দিয়ে যেন আগুন ছড়াতে লাগল তার দিকে চেয়ে চেয়ে। পাশাপাশি কঠিন দুটি মুখ। সুশান্তর কেন যেন তক্ষুনি মনে পড়ল, এদের একজন বড় পুলিস অফিসার।…ওই বড়জনই হবে।

না সুশান্ত ভুল আঁচ করেনি। ব্যতিক্রমটা নির্মম সত্য।

…মেয়ের জন্মদিনে আসার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ছেলেদের চিঠি লিখেছিলেন অবিনাশবাবু। আর সেই সঙ্গে একটা সুখবরের আভাসও দিয়েছিলেন। না, কোন সংশয় বা কোন প্রতিকূল সম্ভাবনার চিন্তা তাঁর মাথায় আসেনি। তবু বাপ-মায়েরই সাধারণ কর্তব্য-বোধটুকু ভোলেননি। সুশান্ত সরকারের নাম, বাড়ির ঠিকানা ইত্যাদি পুলিস অফিসার ছেলেকে জানিয়ে তার সম্পর্কে একটু-খোঁজখবর নিয়ে আসতে লিখেছিলেন।

তার ফলে এমন এক মর্মান্তিক সংবাদ উদ্ঘাটিত হবে, কল্পনাও করেননি। এবারে বোনের জন্মদিনের দিন-কয়েক আগেই এসে গেছে তারা। যে খবর জেনেছে, আগে আসাটা কর্তব্য ভেবেছে।

গার্গীর সামনেই দুই দাদা বাবাকে যা বলার বলেছে।…হ্যাঁ, বাড়ি গাড়ি টাকা সুশান্ত সরকারের সবই আছে সত্যি কথা। এম. এ. পাসও বটে। কিন্তু ভদ্রলোকের বেশে এমন শয়তানও আর বুঝি হয় না। পাগল বউকে খুন করার দায়ে অনেক দিন হাজতে আটকে রাখা হয়েছিল তাকে। বিচারে সংশয়ের অবকাশে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু তার কাকিমা বিমলা সরকারের স্থির বিশ্বাস, টাকা আর সম্পত্তির লোভে পাগল বউকে ওষুধ গিলিয়ে সে-ই মেরেছে। আর মারবার আগেও কত যে অত্যাচার করেছে ঠিক নেই। মহিলা নিজের মুখে বলেছে তার মেয়েটার ওপর পর্যন্ত কু-দৃষ্টি ছিল, এত বড় পাজী ও। পাড়ার লোকের পর্যন্ত ওর স্বভাব-চরিত্র জানতে

বাকি নেই। খালাস পেয়েই সুশান্ত সরকার সম্পত্তি দখল করেছে —বিধবা কাকিমাকে বিপদে ফেলে পৈতৃক বাড়ির নিজের অংশ অ্যাটর্নির কাছে বেচে দিয়েছে।

গার্গীর পুলিস অফিসার দাদার ওই লোকের সম্পর্কে আরো অনেক খবর সংগ্রহ করতে বেগ পেতে হয়নি। যে এ্যাটর্নি তাকে সব থেকে বেশি সাহায্য করেছে, সে-ই ওকে এক-নম্বরের স্কাউণ্ড্রেল বলেছে, তার মেয়েটাকে পর্যন্ত বিপাকে ফেলার চেষ্টায় ছিল। এ ছাড়াও একদঙ্গল মেয়ের সঙ্গে মেলা-মেশা করত লোকটা, তাদেরও নাম-ধাম জানা গেছে। এই মেলা-মেশা একটুও স্বাভাবিক ছিল না। কলকাতায় যে ফ্ল্যাটে থাকে, তার সামনের ফ্ল্যাটের এক মহিলা— মিসেস জোন্‌স—সে পর্যন্ত এই লোকের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করেছে।

গার্গী পাথর একেবারে। তক্ষুনি একটি মেয়ের মুখ মনে পড়েছে তার। মঞ্জরী বিশ্বাসের। যার কোন আচরণ সংশয়ের ঊর্ধ্বে মনে হয়নি। হতাশায় মুখ কালো করে সে আরো অনেক ভক্তের কথা শুনিয়ে গেছে।...সুশান্ত সরকারকে নয়, আসলে শুনিয়ে গেছে হয়ত তাকেই।

স্তব্ধ, নির্বাক অবিনাশ দত্তও। সময়ে জানা গেছে বলে, তাঁর মেয়ে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু এতকাল বাদে এই মেয়ের দিকে চেয়ে তিনি যে আনন্দ আর আশায় উন্মুখ হয়েছিলেন, এত বড় আঘাতে সেটা খানখান হয়ে গেল। মেয়ের মুখের দিকে একপলক চেয়েই বুঝেছেন, নিজের ঘর আর তার এ জীবনে হবে না।

ঘণ্টা দুই বাদে দুই দাদাই সোজা পাশের বাড়ির দোতলায় উঠে এলো।

এই প্রতীক্ষাতেই ছিল তারা। শয়তানকে ভাল-রকম শাসিয়ে না আসা পর্যন্ত তারা ঠাণ্ডা হতে পারছিল না।

দোতলার বারান্দাতেই দেখা। সুশান্ত দু-হাত তুলে নমস্কার জানাল।

এই বিনয়ে তারা ভ্রূক্ষেপ করল না। বিশেষ করে পুলিস অফিসারটি এযাবৎ ভদ্রতার মুখোশ-পরা এমন অনেক শয়তান

দেখেছে। সটান সামনে এসে সে-কথাই বলল। আগে নিজের পরিচয় জানাল, তারপর বলল, আপনার সম্পর্কে আমাদের কিছু জানতে বাকি নেই। আপনার মত লোককে কি করে ঢিট করতে হয় তাও আমার জানা আছে। দু'তিনদিন আমরা এখানে আছি, তার মধ্যে এ বাড়ি খালি দেখতে চাই—আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ?

সুশান্ত চেয়ে রইল খানিক, তার চোখের সামনে মস্ত একটা ইমারৎ ভেঙে পড়ছে। এই প্রথম অনুভব করছে ওটা কল্পনার ইমারৎ। আলতো করে জবাব দিল, বাড়ি খালি করে কোথায় যাব, আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে সমস্ত দুনিয়াটাই আপনার কেনা।

—শাট্ আপ !

সুশান্তর চোখে-মুখে একটা খরখরে যাতনার ছাপ। কিন্তু সেটা নজরে পড়ল না কারো। ঠোঁটের কোণে হাসির আভাসটুকুই দেখল তারা দুজন। সুশান্ত বলল, আপনারা গার্গীর দাদা, নইলে লোকটা আমি আপনাদের থেকে খুব বেশি ভদ্র নই, আর আমারও সহিষ্ণুতার সুনাম নেই তেমন। আপনাদের বক্তব্য আমি বুঝেছি, এখন আসুন আপনারা।

বাংলাদেশের প্রবলপ্রতাপ পুলিস অফিসার। ঢিট যাদের করেছে তাদের কারো মুখে এমন কথা আর এই অভিব্যক্তি শুনেছে বা দেখেছে বলে মনে হয় না।

দুই ভাই রাগে জ্বলতে জ্বলতে নেমে এলো। কথাবার্তা কি হয়েছে অবিনাশ দত্ত শুনলেন, গার্গী শুনল। বড় ভাই বলল, কলকাতায় আসুক একবার, তারপর কত ধানে কত চাল সেটা জন্মের মত বুঝিয়ে ছেড়ে দেব।

গার্গী বাইরে নির্বাক, স্তব্ধ। কিন্তু ভেতরটা তার একটুও স্থির হয়ে বসে নেই। দাদাদের যে কথা বলে দিয়েছে ওই মানুষ, সেটা তার পক্ষেই সম্ভব। যে লোক রাতদুপুরে বন্দুক হাতে একা ডাকাত তাড়াতে বেরোয়, যে লোক খাঁড়ার মুখে একলা সংস্কারান্ধ বিশ-পঁচিশজনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়—দাদাদের বেলায়ও এই পুরুষকার তারই সাজে। এটুকুই স্বাভাবিক।

…কিন্তু তারই মধ্যে অমন এক মারাত্মক পশু লুকিয়ে থাকে

কি করে ? থাকলে সে অমন জোরের ওপর দাঁড়ায় কি করে ? তারই কলুষিত হাতের ছোঁয়ায় রাগ-রাগিণীরা অমন জীবন্ত হয়ে ধরা দেয় কেমন করে ?

দাদারা পাশের ঘরে যেতে অবিনাশ দত্ত উঠে এসে তার মাথায় একখানা হাত রাখলেন।—ভেবে আর কি করবি বল্, সবই বরাত। তবু তো সময়ে জানা গেছে···

গার্গী কি ভেবে হঠাৎ বাবার দিকে তাকাল। দু'চোখ চকচক করছে।—আচ্ছা বাবা, তোমার খুব অবাক লাগছে না ? ভয়ানক অবাক লাগছে না ?

—তা তো লাগছেই, অমন সুন্দর চেহারা, এমন মিষ্টি মেলা-মেশা···তার মধ্যে যে এ-রকম—

—আরো ভাল করে ভাবো, আরো ভেবে বলো বাবা—অজানা অচেনা লোকের দরদে যে মানুষ একলা রাতদুপুরে ডাকাত তাড়াতে বেরোয়, যে-মানুষ একটা শিশুর মায়ায় খাঁড়া দেখেও বলি আগলায় —যে মানুষটা অত বড় শিল্পী—সে তার নিজের বউকে বিষ খাইয়ে মেরেছে—তোমার ভয়ানক অবাক লাগছে না বাবা ?

মেয়ের চোখে-মুখে এই আকৃতি দেখে অবিনাশ দত্ত ঘাবড়েই গেলেন। পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, সেটাই তো আশ্চর্য ···কিন্তু লোক যে ভাল নয় তাতে তো আর ভুল নেই। বিয়ে করেছে, বউ ছিল, তা পর্যন্ত গোপন করেছে।

অন্যমনস্কের মত গার্গী জবাব দিল, না, তা করেনি। বউ ছিল বলেছে···পাগল ছিল তাও বলেছে।

শুনে অবিনাশ দত্ত অবাক। একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, পাগল বউ কি করে মারা গেল বলেছিল ?

—না।

বাবার সামনে থেকে উঠে চলে গেল গার্গী। বাইরে থেকে কেউ বুঝবে না ভিতরে কত বড় আগুন জ্বলছে তার।···সেদিনও লোকটা বলেছিল, তার মধ্যে কদর্য কুৎসিত যদি কখনো দেখে তাহলে কি হবে ? সে কিন্তু এই জন্যেই বলেছিল ? কি মন তা মেনে নিতে পারছে না কেন ? এত সব ঘৃণ্য পরিচয় পেয়েও ও-মুখে কুৎসিতের

ছায়াটাই বড় হয়ে উঠছে না কেন ? এত বড় ভুল গাগীর কি করে হতে পারে, কেমন করে হতে পারে ? ভগবান আমি সব সহ্য করব, ওই মানুষটার কোন্ দিকটা সত্য আমাকে দেখিয়ে দাও।

সকাল গেল। দুপুর পেরিয়ে বিকেলের ছায়াও ঘন হতে লাগল। বাইরে গাগী তেমনি নিস্পন্দ, তেমনি স্থির।

সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে হঠাৎই একটা সংকল্প নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বাবার কাছে এসে বলল, আজই রাতের গাড়িতে কলকাতা যাব।

অবিনাশবাবু আকাশ থেকে পড়লেন। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বিস্ময়ের থেকেও দুশ্চিন্তায় বেশি কাতর তিনি।—কলকাতা যাবি! কেন··· ?

—হ্যাঁ বাবা, খুব দরকার।

—কিন্তু···

—তুমি কিছু ভেবো না বাবা, আমি যাব আর আসব।

মনের এই অবস্থায় তাকে ছেড়ে দিতে ভয়ানক আপত্তি। তাছাড়া কেন যেতে চায় বুঝতে না পারার ফলে আরো উতলা। কিন্তু এও বুঝছেন, বাধা দিয়ে ফল হবে না। বললেন, তাহলে সকলে মিলেই যাই চল্, দিন-কয়েক তোর দাদাদের ওখানেই কাটিয়ে আসি।

—না বাবা না, তুমি দাদাদের সঙ্গে এখানে থাকো। প্রত্যেকবার এখানে তুমি আমার জন্মদিন করো, এবারেও এখানেই হবে। এবার অন্তত এখানে ছাড়া আর কোথাও হতে পারে না— আমি কাল সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসছি।

মেয়ের চোখে-মুখে এমন একটা আকূতি ফুটে উঠল যে অবিনাশ-বাবু আর দ্বিতীয়বার বাধা দিতে পারলেন না। নিরুপায় হয়ে ছেলেদের শরণাপন্ন হলেন তিনি।

শুনে দুই দাদাই হতভম্ব। তারাও ভেবে পেল না কলকাতায় কেন যেতে চায়। তাড়াতাড়ি বোনের খোঁজে উঠে এলো তারা। পিছনে চিন্তাচ্ছন্ন মুখে অবিনাশবাবুও।

নিজের ঘরে গাগী ছোট একটা ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছিল। বড়দা বলল, কি রে, আমরা তোর জন্যেই এলাম, আর তুই হঠাৎ কলকাতা চললি শুনলাম ?

—হ্যাঁ বড়দা, তোমরা আছ বলেই চট করে একটু ঘুরে আসতে পারছি, বাবার দিকে খেয়াল রেখো।

—কিন্তু তোর হঠাৎ কলকাতা ছোটার দরকার হল কেন ?··· আমাদের কথা বিশ্বাস হল না, নিজে খোঁজ নিতে যাবি ?

গার্গী এবারে তার দিকে ফিরল। স্থির ঠাণ্ডা মুখ।—বিশ্বাস হয়েছে···তবু ভয়ানক অবাক লাগছে আমার, কত যে অবাক লাগছে তোমরা ভাবতেও পারবে না বড়দা। নিজে একবার ঘুরে এলে আর হয়ত অত অবাক লাগবে না···তখন লোকটার চরিত্র সময়ে ধরা পড়েছে বলে আমিও নিশ্চিন্ত হতে পারব।

কিন্তু ট্রেনে বসে নিজেরই মনে হতে লাগল ঝোঁকের বশে বেরিয়ে পড়েছে। কলকাতায় গিয়ে সে নতুন করে আর কি জানতে পারবে। কি বুঝতে পারবে ?

কলকাতায় এসে কি করবে, কোথায় কিভাবে খোঁজ নেবে, কিছুই স্থির করেনি। প্রথমেই একবার বিমলা সরকারের সঙ্গে দেখা করবে ভেবেছিল। বড়দার কাছ থেকে শুধু তার ঠিকানাটাই চেয়ে এনেছিল। আর কাজল সরকারের নামটা মনে করে রেখেছিল।··· এর পর কি করণীয় ওখান থেকেই হদিস মিলতে পারে।

সেখানেই এলো।

নিচে কাজল সরকারের সঙ্গে দেখা। বরাতক্রমে সেটা ছুটির দিন বলেই যে দেখা পেল জানে না। এই বাড়ি, এই বাড়ির পরিবেশ বা এই বাড়ির কাউকে ভাল লাগবে, ভাবেনি। হয়ত বড়দার মুখে যেটুকু শুনেছিল তাইতেই ও-রকম ধারণা হয়েছিল। কিন্তু সামনে দেখল যাকে, তাকে খারাপ লাগল না। ঠাণ্ডা মুখ।

—বিমলা সরকার এ বাড়িতে থাকেন ?

কাজল মাথা নেড়ে সায় দিল। অচেনা মুখ দেখে বিস্মিত একটু।

···আপনার নাম কাজল ?

আবারও মাথা নাড়ল। জিজ্ঞাসু।

···আমার নাম গার্গী দত্ত, দেওঘর থেকে আসছি। আপনার মায়ের সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার।···দেখা হবে ?

গার্গী জবাব দিল, এখনো পাইনি। পাব আশা করছি। রোসো… ।

তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। গার্গী ততক্ষণে নিজের ঘরে চলে এসেছে।

তারপর এই দিন। গার্গীর জন্মদিন। বলা বাহুল্য, এবারে ঘটা কিছুই হল না। বাইরের একটি লোকও আমন্ত্রিত হয়ে এলো না। বাবা নীরবে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। বড়দা বলল, এত করে বললাম, কিছুই তো মুখ ফুটে চাইলি না এবারে তুই।

গার্গী জবাব দিল, আজ চাইছি। আশীর্বাদ করো যখন সত্য দেখতে পাই।

দাদাদের এমন কি বাবার কানেও দুর্বোধ্য ঠেকল।

রাত্রি।

স্থির ঠান্ডা দুটো চোখ অনেকবার ঘড়ির ওপর এসে থেমেছে গার্গীর।

ঘড়ির কাঁটা দুটো রাত এগারোটার কাছাকাছি আসতে আরো স্থির, কিন্তু আরো অনমনীয় কঠিন গার্গীর সমস্ত মুখ।

এগারোটা।

দু'কান উৎকর্ণ গার্গীর। হ্যাঁ, সেতারের রেশ কানে আসছে। বাতাস বদলাচ্ছে। সুর চড়ছে।… এ রকমও হবার কথা নয়। এত বড় অপরাধ ধরা পড়ার পর সেতার হাতে ওঠার কথা নয়।

কিন্তু যা আশা করেছিল তাই হয়েছে।…সেতার হাতে নিয়েছে। সুর এগিয়ে আসছে। ডাক এগিয়ে আসছে।

বাবা তাঁর ঘরে শুয়ে পড়েছেন। দাদারাও তাদের ঘরে বসে কথাবার্তা কইছিল। বাজনা কানে আসতে চুপ করেছে বোধহয়।

গার্গী উঠল।

সুশান্ত সরকার মুখ তুলে তাকালো। বাজনা থেমে গেল।

দরজার সামনে গার্গী দাঁড়িয়ে। নিষ্পলক দু'চোখ মেলে দেখছে

তাকে। ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। কিন্তু চোখের পলক পড়ল না। সংযত প্রায় কঠিন-সুরে বলল, আমার আসার কথা ছিল। এসেছি।

সুশান্ত নিঃশব্দে চেয়ে রইল তার দিকে।

তেমনি মৃদু কঠিন সুরে গার্গী আবার বলল, এই সঙ্গে তোমার সেতারে আর যার আসার কথা ছিল সে কি আসছে?

—না।

দু'চোখ আরো তীক্ষ্ন হয়ে উঠল গার্গীর।

—কেন? কেন আসছে না?

—তোমার মধ্যে সেই একজন আসেনি বলে।

দু'চোখের কালো তারা ওই মুখের থেকে একটুও নড়ল না।—সেই একজন কেন এলো না?

—আমার মুখের ওপর আবার কুৎসিতের ছায়া পড়েছে বলে।

নিঃসীম নীরব মুহূর্ত গোটাকতক। দু'জোড়া চোখের উপর দু'জোড়া চোখ স্থির হয়েই আছে।

—ওই ছায়ার কতটা সত্যি?

—যতটা তোমাকে বলেছি তার সবটুকুই সত্যি।

—হ্যাঁ, বলেছ মেয়েদের জন্যেই কদর্য ছায়া পড়েছে তোমার মুখে, আমি তা অবিশ্বাস করিনি, তা নিয়ে মাথাও ঘামাইনি।··· কিন্তু যা বলনি তার কতটা সত্যি?

—যা বলিনি তার একবর্ণও সত্যি নয়।

ঠিক সেই মুহূর্তেই অন্তস্তলে বিচরণের মতই তীব্র তীক্ষ্ন হয়ে উঠল গার্গীর দুই চোখ আর সমগ্র সত্তা। তেমনি হঠাৎ আবার সেই মুখ বদলালো। নিবিড় আগ্রহে কাছে সরে এলো।—সত্যি নয়? বউকে তুমি বিষ খাইয়েছ, এ কথা সত্যি নয়? আর একবার বলো, বলো—

তেমনি ধীর শান্ত মুখে সুশান্ত বলল, সত্যি নয়। তোমাকে যা বলেছি তার বাইরে কিছুই সত্যি নয়।···সত্যি নয় যে তুমিও জান, নইলে দাদাদের মুখে এই সব শোনার পরেও তুমি আসতে পারতে না। নিজে কলকাতা থেকে ঘুরে আসার পরেও তুমি এখানে আসতে না। তোমার ভিতরের কেউ বিশ্বাস করেনি, বিশ্বাস

করতে চায়নি, তাই এসেছ।

এই প্রথম দু'চোখ বুজে ফেলে কথাগুলোর যেন সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে স্বাদ নিল গার্গী। এই সহজ যুক্তিটা তার মনে পড়েনি বটে।

আস্তে আস্তে কাছে এলো। বসল।—আমাকে সব বলো। কথা দিচ্ছি, আমি তোমাকে অবিশ্বাস করব না—অবিশ্বাস করতে চেয়ে দু'দিন অজস্র শাস্তি পেয়েছি।

সুশান্ত সরকার বলল।

অল্প কথায় সমস্ত জীবনটাই যেন তুলে ধরল তার সামনে। বিয়ের আগের কথা বলল, কোন্ লোভে কাকিমা পাগল হয়ে পাগল বোনঝিকে ঘরে এনেছিল বলল, বউ কেন পাগল হয়েছিল তাও গোপন করল না। কয়েকটা বছরের সেই দুঃসহ যাতনার চিত্রটা তুলে ধরল তার সামনে। সবশেষে সেই রাতের কথাও বলল। ···শেষের ক'টা দিন বউ হঠাৎ গুম হয়ে গেছল। বাজনা শেষ করে মাঝরাতে দোতলায় উঠে দেখে অণিমার বিছানায় সব ক'টা ঘুমের ওষুধের খালি শিশি। পাগলের মত অণিমাকে সে বাঁচাতেই চেষ্টা করেছিল। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য খালি গায়ে উর্ধ্ব-শ্বাসে পথে নেমে এসেছিল। ট্যাক্সির খোঁজে কত পথ ছুটেছিল ঠিক নেই। অত রাতে ট্যাক্সি পেতে সময় লেগেছিল।

ফিরে এসে দেখে সব শেষ।

তারপর বিচার। বিচারে খালাস পাবার পরেও মেয়েদের ওপর আক্রোশ এক বিকৃতির মতই সমস্ত সত্তা দখল করে বসে ছিল তার। এখনো বসে আছে কিনা জানে না। সেই আক্রোশেই জেল থেকে মুক্তি পাবার পরেও সে চেয়েছে লোকে জানুক বউকে সে-ই বিষ খাইয়ে মেরেছে।

গার্গী স্তব্ধ নির্বাক খানিকক্ষণ। দু'চোখ ঠেলে জল আসতে চাইছে। চেয়ে আছে, দেখছে। সমস্ত মুখে প্রশান্তি ভরে গেছে গার্গীর। আরো কাছে এসে হাত বাড়িয়ে সুশান্তর সামনের উসকো-খুসকো চুলের গোছা গভীর মমতায় পিছনে সরিয়ে দিল। তারপর সেই হাতখানা তার মুখের ওপর বুলিয়ে নিয়ে যেন অনুভব করতে

চাইল কিছু। অস্ফুট স্বরে বলল, তোমার মত এত সুন্দর আমি আর কাউকে দেখিনি।··মেয়েরা যত অপমান তোমাকে করেছে আমি তার সবটুকু মুছে দেব···বুঝলে ?

চেয়ে আছে সুশান্তও। কতকালের কত যুগের একটা পুঞ্জীভূত ক্ষোভ যেন বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে সেতারটা টেনে নিল। ঘরের বাতাসে সুরের পদার্পণ অনুভব করছে। গার্গী তার আর একটু কাছ ঘেঁসে বসে কান পাতল।

পাঁচ মিনিট না যেতে বাজনায় ছেদ পড়ল। দরজার কাছে কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ। সচকিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে গার্গী দেখে, তার বাবা দাঁড়িয়ে, হতভম্ব বিমূঢ় মুখ, আর তার পাশে স্তব্ধমূর্তি দাদারা।

একটু থমকে দেখে নিয়ে গার্গী বলল, এত রাতে তুমি উঠে এলে বাবা ?

অস্ফুট বিস্ময়ে অবিনাশ দত্ত বললেন, তুই এখানে ?

গার্গী বলল, তুমি আর ভেবো না বাবা, আমি ঠিক জায়গাতেই আছি। তোমার মেয়ে এত বড় ভুল করতে পারে না এটুকু জেনে তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোওগে যাও—নইলে কাল আবার শরীর খারাপ হবে। বাবার মুখ থেকে দু'চোখ দাদাদের দিকে ঘুরল। তোমরাও যাও, আমার দেরি হবে একটু। বলেই সুশান্তর দিকে ফিরল সে।—তুমি থামলে কেন ?

দরজার কাছ থেকে তিনটি বিমূঢ় মুখই সরে গেছে। সেতারের তারে সুশান্তর আঙুল নড়ছে, দুই অপলক চোখ মেলে গার্গীর দিকে চেয়ে আছে।

—হাসি গোপন করতে গিয়ে গার্গী আরো বেশি হেসে ফেলল। ...বাজাবে না ? কি দেখছ ?

সেতার ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে সুশান্ত তার মুখখানা নিজের দিকে তুলে ধরল। ঠোঁটে হাসি, দৃষ্টি গভীর। জবাব দিল, বিজয়িনী নট-রাগিণী।